ত্রিপুরার প্রথম কবিতাপত্র

জোনাকি সমগ্র

সংকলন ও সম্পাদনা

গোবিন্দ ধর

ত্রিপুরার প্রথম কবিতাপত্র

'জোনাকি' সমগ্র

সম্পাদনা ও সংকলন ঃ গোবিন্দ ধর

স্রোত

স্রোত প্রকাশনা

উদ্দীপ্ত সংগ্রহশালা ঃ হালাইমুড়া ঃ কুমারঘাট-৭৯৯২৬৪ ঃ উত্তর ত্রিপুরা

Trpurar Pratham Kabitapatra
'Jonakee' Samagra

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১১
পরিবেশক : অসিত দাস, প্রযত্নে 'উবুদশ', ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২
ফোন : ০৯৪৩৩৮১৯১০৩
।। প্রাপ্তিস্থান।।
শিলচর : পীযূষ রাউত, জগৎ কুটীর কমপ্লেক্স, দ্বিতল, বি-ব্লক, প্রেমতলা টেরেস,
প্রেমতলা, শিলচর, কাছাড়, আসাম।
প্রচ্ছদ, বর্ণসংস্থাপন ও গ্রাফিকস্ : নির্মল দত্ত
মুদ্রণ : গ্রাফিপ্রিন্ট, হালাইমুড়া, কুমারঘাট, উত্তর ত্রিপুরা
চলমান : ৯৪৩৬১৬৭২৩১
প্রকাশক : সুমিতা পাল ধর
Visit us at : www.srot.co.in
Email : srot_gobinda@rediffmail.com
ISBN : 13-978-81-907097-4-3
মূল্য : ৩০০ টাকা

লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক ও পাঠকবর্গকে—

বি.ন্যা.স.ক্র.ম

জোনাকি প্রসঙ্গ

পঞ্চাশের শেষার্ধে চাতলা উপত্যকার ছোটজালেঙ্গায় পড়াশোনাসূত্রে আমি মাত্র এক বছর ছিলুম। চা-বাগান সন্নিহিত সেই গ্রামে প্রয়াত কবিবন্ধু সীতাংশু পালের সৌজন্যে সর্বপ্রথম লিটল ম্যাগাজিনের প্রতি তিল তিল করে গড়ে উঠল আমার আন্তরিক আসক্তি। তখনও কিন্তু কবিতা লেখার হাতেখড়ি দূরঅস্ত। তখনো আমার লেখালেখি ছিল ছোটগল্পকেন্দ্রিক।

সীতাংশুর সহপাঠী বন্ধু কবি করুণাসিন্ধু দে ও ত্রিদিব মালাকারের 'স্বপ্নিল' ছিল আমার দেখা প্রথম উল্লেখযোগ্য লিটল ম্যাগাজিন। আর ছিল সীতাংশু পাল সম্পাদিত ও অলঙ্কৃত হাতে লেখা সাহিত্যপত্র 'নবভারত'। সেই সময় পড়াশোনার জন্য বরাকের বসবাস ত্যাগ করে আমাকে চলে আসতে হয় ত্রিপুরার একটা অতি ক্ষুদ্র শহর কৈলাসহরে। সাহিত্য ও সাহিত্যের বাহন লিটল ম্যাগাজিনের কোনো পরিবেশ সেই সময় কিন্তু কৈলাসহরে ছিল না। সীতাংশুর সঙ্গে যোগাযোগ তখনও ছিল। সীতাংশুর সম্পাদনায় প্রকাশিত কবিতাপত্র 'কবিসংবাদ' সেইসময় আমাকে যথেষ্ট আলোড়িত করেছিল। ১৯৫৯-৬০ সালে, কৈলাসহরে, আমি প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করি। এবং কালক্রমে আমরা কয়েকজন সহমর্মী বন্ধু সহ স্থাপন করি 'কৈলাসহর সাহিত্য আলোচনাচক্র'। আমি ছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য স্থপতি ছিলেন সুধীরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী, মানিক চক্রবর্তী, বিমল দেব, অরবিন্দ ভট্টাচার্য এবং শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। শুরুতে আমরা প্রকাশ করি হাতেলেখা 'জোনাকি' সাহিত্যপত্র। একটা সংখ্যা তো আজও আমার সংগ্রহে রয়ে গেছে। আসলে নিজেদের রচনা প্রকাশের তীব্র তাড়না থেকেই এইসব কর্মোদ্যোগ। ইতোমধ্যে কেটে গেছে বছর তিনেক। গোটা পূর্বোত্তরে লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশ তখন ছিল হাতে গোনা। সুতরাং 'কৃত্তিবাস' সহ বেশ কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন কলকাতা থেকে ডাকযোগে সংগ্রহ করে আগ্রহী বন্ধুদের হাতে তুলে দিতাম। অবশেষে ১৯৬৩ সালের মে মাসে ত্রিপুরার প্রথম কবিতাপত্র 'জোনাকি'র মুদ্রিত প্রকাশ ঘটল। তবে প্রথম

সংখ্যা থেকেই বহু বছর 'সংকলন' নামে 'জোনাকি' অভিহিত হয়। আসলে ১৯৬১ সালে দারিদ্র্যকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে চাকরি (শিক্ষকতা) নিতে বাধ্য হই। শুভানুধ্যায়ী কেউ কেউ বললেন 'সংকলন' শব্দটি ব্যবহার না করলে চাকরিজীবন বিপন্ন হতে পারে। যদিও এই ভয় ছিল নিতান্তই অমূলক। আমার একার পক্ষে পত্রিকা প্রকাশ আক্ষরিক অর্থেই সেই সময় অসম্ভব ছিল। প্রথম সংখ্যায় আর্থিক সহায়তা করেছিলেন নগেন সাহা, কান্তিভূষণ রায় ও অনুজ দেবরায়। প্রথম সংখ্যা থেকেই প্রচ্ছদ পরিকল্পনা কবি চিত্রশিল্পী বিমল দেবের। ১৩৭০ সনের ২৫শে বৈশাখ, ৮ মে, ১৯৬৩ সালে 'জোনাকি' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হল। কৈলাসহর কলেজের (রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়) স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষ সচ্চিদানন্দ ধর সম্পাদকীয় লিখে দিয়েছিলেন। উত্তরকালে, বহু বছর পর, প্রথম সংখ্যার এই সম্পাদকীয় পড়ে মনে হয়েছিল, আমি নিজে লিখলেই ভালো হতো। সূচীপত্রে উল্লিখিত সকলেই কবিতার ভুবনে নবাগত। এমনকি আমি নিজেও। একমাত্র ধীরেন্দ্র চক্রবর্তী ছাড়া পরবর্তী সময়ে কেউই সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন নি। অবশ্য আংশিকভাবে ছিলেন শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, কান্তিভূষণ রায়, বিমল দেব এবং প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য। দুর্ভাগ্যবশত কবি অনুজ দেবরায়ের কবিতাটি ছিন্নপত্র হয়ে হারিয়ে গেছে। দ্বিতীয় সংখ্যা ছিল পুজোসংখ্যা। এই সংখ্যায় জোনাকির চরিত্র কবিতাপত্র ছিল না। স্থানীয় লেখকদের হাইলাইট করতে গিয়ে ছোটগল্প প্রবন্ধ এবং রম্যরচনাও প্রকাশিত হল। এবং তখনও কবি-লেখকরা পুরোপুরি কৈলাসহরকেন্দ্রিক।

তৃতীয় সংখ্যা থেকে জোনাকি তার চরিত্রকে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে স্থির করতে সচেষ্ট হল। এই সংখ্যা থেকেই জোনাকি আঞ্চলিকতার খোলস ত্যাগ করে বহুগামী হল। হয়ে উঠল ত্রিপুরা, বরাক, মেঘালয় ও কলকাতার কবিদের মুখপত্র। সূচীপত্র দেখুন। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যার মধ্যবর্তী সময় যথেষ্ট দীর্ঘ ছিল। অবশ্য চারিত্রিক পরিবর্তনের জন্য হয়তো এই দীর্ঘ সময়টা কাম্য ছিল। এই বিশেষ সংখ্যায় আমার সহকারী সম্পাদক রইলেন প্রয়াত লেখক মানিক চক্রবর্তী ও প্রদীপ বিকাশ রায়।

'জোনাকি-৮' বেরোল পশ্চিম ত্রিপুরার কল্যাণপুর থেকে। কেননা, মাত্র কয়েক মাস আগেই চাকরিসূত্রে আমি কল্যাণপুরে বদলি হয়ে এসেছি। ঠিকানাবদল ও অন্যান্য সমস্যার জন্য যোগাযোগ যথাযথ হয়নি বলে এবারও স্থানিক।

সম্ভবত, 'জোনাকি' নবম সংখ্যা এই অব্দি প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ সংখ্যা। এ কারণে যে, বরাক-ত্রিপুরার বেশ কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবির কবিতা সহ প্রশ্নোত্তর ভিত্তিক কবিতাভাবনা নিঃসন্দেহে একটা অন্যরকম মাত্রা যোগ করেছে। চল্লিশ বছরের ব্যবধানে আমার এই ধারণা, মনে হয়, ভুল হবার নয়। এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। শেষ সংখ্যা 'জোনাকি'তে প্রকাশিত হয় ত্রিপুরার চারজন কবির কবিতা লেখার গূঢ় ইতিহাস। একজন বাদে বাকী তিনজনের অবদান সম্পর্কে সন্দেহ থাকার কথা নয়।

১৯৬৯ সালে আমি বদলি হয়ে যাই পশ্চিম ত্রিপুরার কল্যাণপুরে। ফলত, 'জোনাকি'র প্রকাশস্থানও কল্যাণপুর। এই পর্যায়ে আমার স্ত্রী সান্ত্বনা রাউতের অবদানও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। হয়তো ভালোই হয়েছে। কেননা, আমার সতীর্থ বন্ধু সম্পাদক প্রয়াত মানিক চক্রবর্তী, বিমল দেব ও অরবিন্দ ভট্টাচার্য প্রকাশ করেন 'ত্রিভূজ' নামাঙ্কিত একটি উন্নত সাহিত্যপত্র। প্রদীপ বিকাশ রায়, এখন প্রয়াত, প্রকাশ করেন 'উত্তর' এবং 'কাল' নামের আরও একটি সাহিত্যপত্র। সত্তরের দশকে কৈলাসহরে তো লিটল ম্যাগাজিনের জোয়ার বইতে শুরু করেছে। এবং বিস্ময়ের ব্যাপার, গড়পড়তা প্রায় প্রত্যেকটি সাহিত্যপত্র একটা মান বজায় রেখে প্রকাশিত হয়। যা, আজ মনে হয়, অকল্পনীয়।

'জোনাকি' কিন্তু কখনোই সময়ের পরম্পরা মেনে চলতে পারেনি। ১৯৭৬ সালে আমি কৈলাসহর থেকে বদলি হয়ে ধর্মনগরে চলে আসি। যতদূর মনে হয়, অনেকানেক ভুল সিদ্ধান্তের মত এটাও ছিল আমার অন্যতম এক ভুল সিদ্ধান্ত, যার প্রভাব 'জোনাকি'তেও পড়েছিল। চার বছর পর যথেষ্ট উদ্দীপনা নিয়ে ভিন্ন অবয়বে ছোট আকারে 'জোনাকি' প্রকাশিত হল। অন্যতম সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী, প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণে অসীম চক্রবর্তী। দীপক-অনুজ এই তরুণ অসীম গুণের অধিকারী ছিল। কিন্তু অকালপ্রয়াণ তার সম্ভাবনাকে কেড়ে নিয়েছিল। পরের সংখ্যাই জোনাকির শেষ সংখ্যা। কাকতালীয় হলেও ব্যাপারটা অদ্ভুত যে, প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল কোনো এক পঁচিশে বৈশাখে, এবং শেষ সংখ্যাও তাই। সময়ের ব্যবধান ১৬ বছর। বস্তুত পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার কারণেই প্রকাশক ও সম্পাদক হিসেবে আমার আগ্রহ ফুরিয়ে যায়। ততোদিনে গোটা উত্তর ত্রিপুরায় লিটল ম্যাগাজিনের বাড়বাড়ন্ত। সুতরাং অন্যভাবে দেখতে গেলে 'জোনাকি'র প্রয়োজনও হয়তো খুব একটা ছিল না।

ভরসার কথা এটুকুই, 'জোনাকি' ত্রিপুরার কবিতাভুবনে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। যা আজ সর্বজনস্বীকৃত একটা ইতিহাস। বইয়ের আকারে 'জোনাকি'কে প্রকাশ করার অভিনব পরিকল্পনার পূর্ণ কৃতিত্ব 'স্রোত' কর্ণধার কবি গোবিন্দ ধরের। আমি এক্ষেত্রে নিছকই সহায়ক মাত্র।

শিলচর
জুন ৩, ২০১০।

(পীযূষ রাউত)

জোনাকির কবি-লেখক

ত্রিপুরা :

শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য, প্রবীর বর্মণ, দিবাকর চক্রবর্তী, প্রণব চৌধুরী, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, সুবোধ আচার্য, তপন ভট্টাচার্য, কান্তিভূষণ রায়, সুধীরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী, প্রসাদউদ্দিন চৌধুরী, প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য, নগেন সাহা, অমলেন্দু দেব। বিমান বিহারী মজুমদার, অনুজ দেবরায়, পরিমল মালাকার, বিমল দেব, শ্রীকান্ত সিংহ, বৈশালী মুখোপাধ্যায় (পীযূষ রাউত কৃত ছদ্মনাম), মেঘবর্ণ, মৃণাল চক্রবর্তী, ড. সচ্চিনানন্দ ধর, পূর্ণেন্দু বিকাশ চক্রবর্তী, কল্যাণব্রত চক্রবর্তী, স্বপন সেনগুপ্ত, প্রদীপ বিকাশ রায়, তাপস শীল, মানিক চক্রবর্তী, অনিলকুমার চক্রবর্তী, কাজল পুরকায়স্থ, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, জালাল উদ্দিন, অজিত কুমার ভৌমিক, দিলীপ কুমার বসু, জনেশ চাকমা, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, নিতাই আচার্য, পূরবী রাউত, কমল রায়চৌধুরী, আদিনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, হিমাদ্রি দেব, পান্নালাল রায়, বিজয়কুমার বর্মণ, কল্যাণ গুপ্ত, কার্তিক লাহিড়ী, অমিয় ভট্টাচার্য, সমরজিৎ সিংহ, সিরাজুদ্দিন আহমেদ, শংকর বসু, দীপক চক্রবর্তী, দুষ্মন্ত রায়, সেলিম মুস্তাফা (পীযূষ কান্তি দাশ বিশ্বাস)।

কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ :

শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। শিবশম্ভু পাল, সুবন্ধু ভট্টাচার্য, নচিকেতা ভরদ্বাজ, প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, শিশির সামন্ত, দীপংকর চক্রবর্তী, শংকর চক্রবর্তী, অপস গুপ্ত, দীপেন রায়, ধীরেন্দ্র কুমার হাজরা, রামেন্দ্র দেশমুখ, শুদ্ধসত্ব বসু, বিনোদ বেরা, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, মনোরমা সিংহরায়, শংকর দে, সমীর রক্ষিত, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, কালীপদ কোঙার, শংকর চট্টোপাধ্যায়, পরেশ মণ্ডল, রবীন সুর, অমরনাথ বসু, হরিশংকর প্রামাণিক, ভাস্কর চক্রবর্তী, কবিরুল ইসলাম, শামসুল হক, অজিত বাইরী, শম্ভু রাউত, প্রদীপ দাশশর্মা, মৃণাল বসু চৌধুরী, গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

বরাকসহ আসামের অন্যত্র :

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী, মণীন্দ্র রায় (অনুজ), সীতাংশু পাল, কাশীকুসুম চৌধুরী, পরেশ দত্ত, শান্তনু ঘোষ, অতীন দাশ, উদয়ন ঘোষ, উমা ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী, মন্মথ দাশগুপ্ত, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য, জিতেন নাগ, রণজিৎ দাশ, মনোতোষ চক্রবর্তী, তপোধীর ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, বিজয়কুমার ভট্টাচার্য, শংকরজ্যোতি দেব, দীপংকর নাথ, মানবেন্দ্র চক্রবর্তী, করুণাকান্তি দাশ।

অন্যান্য :

নৃপেন্দ্রলাল দাশ (বাংলাদেশ)।

জোনাকি
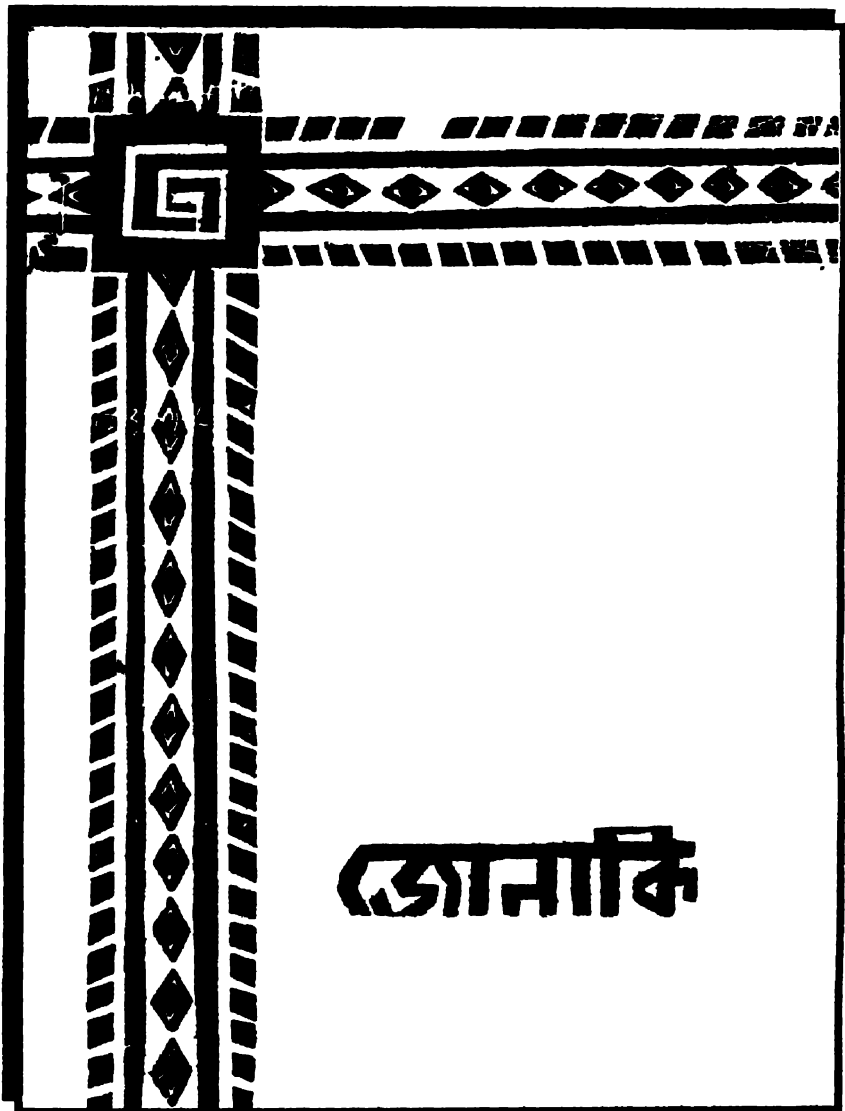
জোনাকি

(একমাত্র কৈলাসহরের কবিদের)

কবিতা সংকলন

।। সম্পাদক ।।

পীযূষ রাউত

।। সহায়ক ।।

বিমল দেব

নগেন সাহা

কান্তিভূষণ রায়

অনুজ দেবরায়

।। প্রচ্ছদ ।।

শিল্পী ঃ বিমল দেব

।। কার্য্যালয় ।।

কৈলাসহর সাহিত্য আলোচনা চক্র ।। কৈলাসহর, ত্রিপুরা

২৫শে বৈশাখ, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ

মূল্য ঃ ০.৫০ (পঞ্চাশ নয়া পয়সা)

শ্রী প্রেস, কৈলাসহর, ত্রিপুরা।

সূচীপত্র

জোনাকি প্রসঙ্গে

আধুনিক অখ্যাত এবং অল্পখ্যাত তরুণ কবিদের লেখা কবিতা আমি পড়ি—বেশ সহানুভূতি দিয়েই বুঝবার চেষ্টা করি। বলতে লজ্জা নেই—আমি সবটা বুঝি না। ছাত্রজীবন বরাবর এবং পরবর্তী কালেও আমি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। মুস্কিল হত কবিতা নির্বাচনের বেলা। এই দুঃসাধ্য কাজটি আমি বন্ধুবান্ধবদের দ্বারাই করিয়ে নিতাম। কবিতা পাঠ সম্পর্কে আর একটি কথা মনে পড়ে। পাথুরেঘাটা রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসে কবি জগন্নাথ চক্রবর্তী (অধুনা বিখ্যাত), প্রণব ঘোষ (অধুনা ক. বি. অধ্যাপক), নচিকেতা ভরদ্বাজ (অল্প খ্যাত?), সত্যনারায়ণ ঘোষ (অখ্যাত?)—এঁরা ছিলেন পর্যায়ক্রমে আমার কক্ষবাসী। প্রত্যেকেরই নিজস্ব কবিতার খাতা ছিল। কবিত্বের আবেগে এঁরা লিখে যেতেন। এক-একটি কবিতার আবির্ভাবের পরই যখন এঁরা 'শৃন্বন্তু বিশ্বে'—বলে যে উদ্বাত্ত ধ্বনি তুলতেন আমাকেই ধৈর্য্য ধরে শুনতে হতো। ধৈর্য্যশীল শ্রোতা হিসাবে আমার সুনাম ছিল এবং কমলাকান্তের প্রসন্নের মত আমিও কবিদের স্নেহধন্য। সত্যি বলতে কি সব কবিবন্ধুর সব কবিতা আমার বোধগম্য ছিল না। জগন্নাথ-দা'র 'নগরসন্ধ্যা'-র (কবির ভাষায় অধুনা দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ) পাণ্ডুলিপির অনেক ছত্র শুনতে শুনতে আমার মনস্থ হয়ে গেছল। ব্যঙ্গ করে ঐ সব চরণের আবৃত্তি করতাম। শংকরের 'চৌরঙ্গী'তে জগন্নাথ চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি পড়ে—নিজেকে ধিক্কার দিলাম—'হায় মূঢ়!'

শহর থেকে বহু দূরে আছি। মাসিক সাপ্তাহিকের পাতায় কবিতা পেলে চোখ বুলিয়ে নিই। ছন্দহীন ছন্নছাড়াদের না বুঝলেও অনেকটা সহানুভূতির চোখে দেখবার চেষ্টা করি। অপরে নিন্দা করলেও আমি করি না। মনে করি, যারা লিখে তারা তো আনন্দ পায়—তাদের সগোত্ররাও হয়তো পায়।

ত্রিপুরার প্রত্যন্ত এই গ্রাম্য শহরে কয়েকটি যুবক মিলে সাহিত্যের কচকচি আর কবিতার গুলতানি করে। অদ্ভুত এক নিষ্ঠা। শনিবারের বিকালে কয়জন মিলবেই। নিজেদের হাতে লিখা পত্রিকা 'জোনাকি'। সংখ্যার পর সংখ্যা লিখে যাচ্ছে। কখনও কখনও তাগিদ এড়াতে না পেরে দু'এক কলম লিখেও দিই। 'জোনাকি'র দলের সঙ্গে কেমন একটা অভিভাবকত্ব ভাব হয়ে গেছে। এবার এরা চাঁদা করে 'জোনাকি' কবিতাসংকলন বের করছে। জানি পয়সা দিয়ে কেউ কবিতা কিনবে না—বিনা পয়সায় বিলিয়ে দিলেও পড়বে না। তবু উৎসাহ না দিয়ে পারি না। মনে হয়—এঁদের মধ্যেও তো জগন্নাথদা, নচিকেতা থাকতে পারে।

এরা এসেছিল 'জোনাকি'র কবিতা সংকলনের নির্বাচনে সাহায্য করতে, ছন্দের উপর রাঁদা আর শিরিষ কাগজ ঘষে দিতে। আমি আমার ভূতপূর্ব (দীর্ঘ!) সম্পাদক-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছি। সুতরাং হে পাঠক! যদি সবগুলি কবিতা শেষ পর্যন্ত পড়েই ফেল—এ বুড়োকে গালি দিয়োনা।

—সচ্চিদানন্দ ধর।

শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য

।। জোনাকির জানালা ।।

সময়ের আরো কতদূরে শ্রান্তির বাসন্তী রাত্রি
অতন্দ্র জ্যোৎস্নার ভিতরে নীরবে নিঃশব্দে
করে আনাগোনা জানলার কিনাবে কিনারে।

আগের বিপ্লবের বাণী পাওয়ার গ্লানিতে যেন লীন;
জীবনের অবক্ষয় মননের স্বভাব রাজত্বে মাথা কূটে মবে
দুস্তর সীমানার পারে। আজ এই বহুকাল পর
মৃত্যুমগ্ন অতীতের মননের দ্বার নোতুন সুযোগ নিয়ে
দাঁড়ালো এই জোনাকির জানলার কাছে।

।। তুমি কি তার কথা ভাবো ।।

মনে কর কোনো এক নির্জন সন্ধ্যায়
স্টেশনের পাশে আছি একা।
তুমি আছ মস্কোর নিভৃত হোটেলে।
তোমার সতীর্থ অশোক কলেজ-ফেরা ক্লান্ত দেহ নিয়ে
বিছানায় বিশ্রামের অবসর খোঁজে।
তার মনের বেতার-কল্পনা তোমার আশেপাশে ঘোরে
ভাসমান গন্ধের মতো।
অথচ সে কত নিঃসঙ্গ, মূক আজ;
একদিন সেও তো তোমারই মতো হতে পারতো!
তুমি কি তার কথা ভাবো?

প্রবীর বর্মণ

।। বোধন।।

জীবনের বালুতটে জলছবি আঁকা হলো—
সফেন সমুদ্র হৃদয় আজ উদ্বেলিত।
গত সন্ধ্যায় হয়তো জেনেছ
ভবিষ্যতের যত উপকূল স্মৃতিময়—সন্ধিসূত্র গাঁথবে
সেখানে সোনা খুঁজে পৃথিবীর ঈগলাক্ষ
বিশ্বস্ত তোমরা।
আকাশের ছায়াপথ—
নিছক আজগুবি বলে ভেবো না।
তোমার পূর্বপুরুষের অসমাপ্ত কাজ তোমার জন্যে
নতুবা মিলনাঙ্গুরীয় আর খুঁজে পাবেনা
ধ্বংসের বালিয়াড়িতে... ... তোমার কঙ্কাল... ..
কে সাক্ষ্য দেবে?
পৃথিবীর বিরাটবৃত্তে এখনো উদ্বেগ।
সেখানে সমস্ত মানুষ দূষিত স্বপ্নের ক্রীতদাস—
অভিভূত বন্যতায় যখন তৃষ্ণার পিচ গলে এবং
ম্লানমুখে ক্লিষ্ট চোখে সংবর্তের ক্ষুব্ধ রোষ
ক্লান্তিহীন বৃত্তরেখা নিয়ে যায় জীবনের গভীর অতলে
স্বার্থের সংঘাতে ঢেউ উঠে—উত্তাল, উদ্বেল
ঝড়োবায়ু আনে চোখে লোনা জলধারা
প্রত্যহের পীড়িত আঘাতে।

দিবাকর চক্রবর্তী

।। আছে।।

নীল সমুদ্রের অব্যক্ত আকৃতির মত
কুয়াশা... ...
তার বুক চিরে চলে যায় সে
কেন কোথায় নেই ঠিকানা।
বাতাসের মন ফেরে
বনলতা হেলে পড়ে
পরাধীন বিগত বাসনা।
মনের উল্লাসের দূরবর্তী
কৌণিক বিকাশ।

নীলের ওপর নীলের দেশ
সেখানে আকাশের নিঃস্বতা। সেখানে
হতাশার বিরাগ ব্যঞ্জনা,
কিন্তু সাথে আছে
রামধনুর তির্যক হাসি—সেই
'সব কিছু নেই'-এর শয্যা থেকে
টেনে তোলে 'আছে'র আশ্বাস।
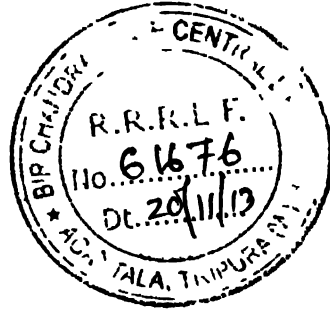
প্রণব চৌধুরী

।। তবু কেন মেনে নাও—নূতনের অভিষেক।।

এখনো ঘুমন্ত বাস্তবের প্রথম দুয়ার খোলে নি।
নিদ্রায় স্তব্ধসত্তার শেষ ছায়া পড়েনি লুটিয়ে।
ওগো ক্ষণচারী! এখনি ফিরায়ো না মুখ। স্নেহের
পুষ্পসার তবু ভ্রান্তির কৃষ্ণকুটিলে
ধীরে ধীরে নিবে যায় যৌবন বৎসর নিবু নিবু
দেউটির মত।
শেষরাত্রির ঘুম প্রায় ভেঙে এলো
এখনো সবুজ পাতায় ঘেরা ফুল—আমি জাগিনি।
ক্ষণচারী! এখনি ফিরায়ো না মুখ।
মেঘের সিঁড়ি বেয়ে দূরে অদৃষ্ট দূরে
কালের নীলাভ রাজ্যে সেই নবীন নিমগ্ন বিচিত্রে
হাতে নিয়ে স্বর্ণালী তুলি
আঁকছে ধীরে অরুণ আলোর নূতন প্রভাতছবি।
কিন্তু একই প্রভাত—সেই সন্ধ্যা একই
সাগর নীল তরঙ্গের জঙ্গম বুদ্‌বুদের মতো
প্রেম ঠিক একই ঘিরে আছে হৃদয়ের চিত্রালি অলিন্দে।
শেষ পাণ্ডুর দিনের অন্তিম পদচিহ্নের মতো
বিরহ উড়ে উড়ে মিলে যায় চিতার চঞ্চল রক্তিম
অভিশাপে শ্মশান বৈরাগ্যের রিক্ত অঙ্গারের মতো।
গত আগামী সবই একই নিয়তির ধূসর অথবা
স্নিগ্ধ চৈতালী আবেশ। তবু কেন মেনে নাও নূতনের
অভিষেক? একি! নিরুত্তর পৃথিবী।

জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য

।। আক্ষেপ ।।

আনমনে ভাবছি—শুধু ভাবছি
চঞ্চল মনের এলোমেলো ভাবনা
একের পর এক ভাবনা
মিলিয়ে যায় বুদ্‌বুদের মতো
অতল মনের পারাবারে।
ডুবুরির মতো খুঁজে খুঁজে মরি
ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্ন।
তবু পাইনা দেখা,
খুঁজে খুঁজে মনে হয় ক্লান্ত।
আবার নোতুন করে খুঁজি।
মনের ক্লান্তিতে খুঁজবার নেশা
নিস্তেজ হয়ে আসে,
আজও পেলাম না তার নিশানা
তাই রচনা করলাম সমাধি
মনের কফিনে।

সুবোধ আচার্য

।। মৌসুমী।।

হাওয়ার এতো প্রতিধ্বনি কিসের—কার প্রতিধ্বনি?
মৌসুমী ভাষায় শব্দে শ্যামল ছায়াবৃতা।
জনশূন্য রাস্তা, আলোর দন্ত, ট্রাম-বাসের একঘেয়ে
সভ্যতা দুরন্ত মৌসুমী শব্দে ভিজছে।
স্থাপত্যে অহঙ্কারী মিনার, সৌধ এবং অন্যান্য; তার
শূন্য বুকের নেপথ্য থেকে কুয়াশা,
অবরুদ্ধ এই আকুল কুয়াশা যেন এখন কি আজ
আমার ছায়াবৃত চেতনায় স্মৃতির স্বাক্ষর তুলতে চায়।
আর সেই অসংলগ্ন মুহূর্তে আমার সমগ্র সত্তা
ধমনীতে এক অনুস্মৃতি এলো—সেই অবুঝ সন্ধ্যা—
অস্পষ্ট, অব্যক্ত একটি যৌবন নির্যাস সবুজ শাড়িতে
ঢাকা চিত্রপট।
এই শোনো, শোনো, ফিসফিসিয়ে ডাকছে
হঠাৎ—!
একসঙ্গে বুকের পাঁজর ঠেলে অবরুদ্ধ ঝড় উঠে এলো
যেন লোনা রক্তে দু'চোখ ঝাপসা মৌসুমী।
দুরন্ত মৌসুমী উচ্ছ্বাসে পৃথিবী
এখন আকুল। শুধু প্রতিধ্বনি যেন কার প্রতিধ্বনি
শ্যামল ছায়াবৃতা হয়ে হাওয়ায় কাঁপছে।

তপন ভট্টাচার্য

।। হারিয়ে গেলে ।।

বাতাসে ফেলে দেওয়া নীড়েব
ফাঁকা ডালে বসে
হারিয়ে যাওয়া সুরে গান গাইতে থাকা
পাখি নীল আকাশের দিকে
তাকিয়ে থাকে এমনি করুণ চোখে
যেন সেখানেই তার নীড় হারিয়েছে।

আর
মনের হারিয়ে যাওয়া ছবি
গানের হারিয়ে যাওয়া সুর
অথবা বিরহের অশ্রুসিক্ত কাহিনী
যেন নীল সাজে নীল ডানা মেলে
লুকিয়ে থাকে আকাশের অসীম নীলে।

এমনি হারিয়ে যাওয়া লগ্নে
বিরহে অথবা বিদায়ের বিচ্ছেদে
বোধ হয় খানিক শান্তি মেলে
উদাস চোখে শূন্য নীলে তাকিয়ে।

কান্তিভূষণ রায়

।। প্রতীক্ষা ।।

এবং তৃষিত মনে রয়েছি জেগে
শরবিদ্ধ পাখির মতো
রাতজাগা হয়ে।
দূরের ঘড়িতে শুনি রাত যায় ভেঙে
তবুও প্রতীক্ষা করি প্রতীক্ষা লয়ে।
আমার এ' প্রতীক্ষা বুঝি কোনোদিন
আর কোনো কালে
প্রহর গোনার শেষ হবে না হবে না,
এ' জীবন ভরবে না পারিজাত ফুলে;
অথচ প্রতীক্ষায় আমি রয়েছি কেননা।

সুধীরেন্দ্র চক্রবর্তী

।। মনের সীমানা ।।

কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে যদি বা তুমি খোঁজ
আমার মনের ঠিকানা,—তবে মিথ্যে হবে
তোমার এ অভিমান। যেমন,
কখনো হিমালয়ের তুষারের মাঝে, কখনো বা
আধখানা চাঁদের কিংবা নক্ষত্রের দেশে।
যেহেতু;—
কখনো বা দুপুরের রোদের মতো গদ্যভরা পরিবেশে,
কখনো বা রোমিও জুলিয়েটের প্রেমের
হিংসায় জ্বলে আমি অরণ্যপ্রতিম।

এমাদউদ্দিন চৌধুরী

।। ব্যর্থ সঙ্গীত ।।

পথিক।

তুমি বড়ো ক্লান্ত;
তবু গেয়ে চলেছ আকাশের দূর সীমানা পেরিয়ে
কিছু পাবার সঙ্গীত।
যে সঙ্গীত আমিও গেয়েছি
ভাষাহীন ছন্দের নিজের অজ্ঞাতে।

পথিক।

তুমি ভুল করেছ, ভুলে গেছ তুমি ক্লান্ত;
ভুলে গেছ ধূসর মরুতে তুমি একা।
মরীচিকা যে তোমারই প্রেয়সী।
তবু ঝরা গোলাপে জল সিঞ্চন করছ;
এক পলক চেয়ে দেখ তার
প্রতিটি পাপড়ি শুকিয়ে গেছে।

প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য

।। অব্যক্ত ।।

বৈশাখের রোদে ইটের কলজে
ভাঙছে ছেলেটা।
'জান আমার কবি কে?'—বলে
বোবা দৃষ্টি মেলে আমি নীরব।
বিরামহীন কর্মে রত
হাতুড়ির প্রতিটি আঘাত—উত্তর দিলে... ...

নগেন সাহা

।। ভাবিনি তো।।

তোমার দাঁত ছিল সোনায় মোড়ানো।
সে যে বিষাক্ত তা' ভাবিনি তো!
অথচ সে দাঁতের হাসিতেই রেখেছো বন্ধুত্ব।
তোমার নখে ছিল রক্তের প্রলেপ;
অথচ নেলপালিশ বলে হাতে হাত রেখে চলেছো।
তখন ভাবিনি তো এ'হাতের স্পর্শে হত্যার চক্রান্ত!
তোমার সুঠাম ছোট্ট পা ছিল সোনায় মোড়ানো।
তাই আমার হাত ধরে চলেছো,
অথচ সে' পায়ের অতর্কিত পদক্ষেপে
আমিই আক্রান্ত হবো—তা' ভাবিনি তো!

।। একান্ত মনে।।

একান্ত মনের কোণে অস্থির চেতনা। শুধু একমাত্র
সান্ত্বনা তোমার অস্তিত্ব। তবুও তো বলেছিলে
অশান্ত উল্লাসে : বহুদিন হলো দেখা পাইনি তোমার।

আমি ছিলাম ঝঞ্ঝাময় একটুকরো মরুর উদ্যানে।
ছায়া খুঁজে বেদুইন জ্বলেছে বালির উত্তাপে; তারও দূরে
সেই দূর বালিপটের উজ্জ্বল আলোকে
একমন অস্থির কোলাহল। তোমার অস্তিত্ব খুঁজেছি
দস্যুর কামুক উল্লাসে—যেখানে পায়ের ছন্দ
মুছে গেছে বালির পাহাড়ে। তবুও আমি সেই
আত্মাহত তোমাকে পাওয়ার স্বপ্নে বৈদিক অস্তিত্ব।

অমলেন্দু দেব

।। প্রাণহীন প্রাণ।।

পাষাণেব বুক চিরে যদি আসে
এক ফোঁটা তাজা রক্ত
মৃত্যুও হবে তবে প্রাণদীপ্ত।

অস্থিকঙ্কালসার দেহে
শুধু হৃৎপিণ্ডের খেলা খেলে
নির্লিপ্ত দেহের জয়জয়াকারে
অতৃপ্ত দেহের মিটে পিপাসা।
আর বলে ঃ আমরা মরে গেছি।
পাষাণও আর্তনাদ করে বলে উঠে :
আমরা মরে গেছি। আর
নিষ্প্রাণ পৃথিবীর আমরাও প্রাণী।

।। আঁধারে।।

নির্জন সাগরসৈকতে এসে
থেমে গেছে আমার মন।
শর্বরীর এগিয়ে আসা নীড়ে
থেমে গেছে সুরম্য সঙ্গীত।
অদৃশ্য সাগর সুরে সুর খুঁজে
অপারগ—তবু দেখে যাওয়া
চিরদিন।

বিমান বিহারী মজুমদার

।। তোমারেই বারে বারে ।।

যদি বলি—তোমায় চিনিনা।
মনে কর—না-ই বা চিনলাম,
না সুনয়না ভয় পেয়ো না।
তোমার ঐ চাউনি আমায়
ঠিক চিনিয়ে দেবে ওতে আছে
এক আর্ত করুণ জীবন্ত চুম্বক।
ধরো তাতেও হলো না চেনা
তখন মরণের ঝরণার মতো
তোমার চুল আমায়
বৃন্দাবন আর মথুরা ঘুরিয়ে
বলিয়ে নেবে—হ্যাঁ, কালাচাঁদকে
এখানেই আমি দেখেছি।
সবশেষে পৃথিবীর মতো তোমার
বসবার ভঙ্গিটি আমাকে
চিনিয়ে দেবে বারে বারে
নিজে না বললেও—তুমি যে কে!

পরিমল মালাকার

।। মুহূর্তের বিদায়।।

ঘুমিয়ে আছে প্রাণ
আলস্যের ফেনিল জোয়ারে,
ধূসর স্বর্গের কুহেলিকা
আর মদিরতার ছলনায়।
কিন্তু মন ঃ
শক্ত মেঘের আকাশপটে
গতিমন্থর স্তব্ধ ডানা
চিলের মতো ছেঁড়া ছেঁড়া গতি নিয়ে
স্বপ্নসুখে বিভোর।
বাস্তবের প্রহসনের আসর ভেঙে
চলে এলো বেদনাবিমথিত
মুহূর্তের বিদায়
স্বপ্নের মতো।
কোনো ইন্দ্রজাল ঃ
ভদ্রতার মুখোশ পরে
আমাকে কিছু না বলে
সূর্যের চুম্বকার্ষণে তারে
নিয়ে গেল একটি বারের মতো।

বিমল দেব

।। পথিক।।

কোন পথিকের চোখে ছিল সমুদ্র-আকাঙ্ক্ষা ঃ
'আমি পৃথিবীর রঙে ছবি আঁকবো।'
কিন্তু আজ সে নিঃস্ব;
ফাল্গুনে ধানক্ষেতের মতো।
যন্ত্রণা প্রজাত ফসল তার অবচেতনের গোলাঘরে পচে।

হে পথিক,
ঝরা গোলাপের গন্ধে তোমার সন্দেহ।
কারণ, তোমার পৌরুষ
ঝড়ের মুখে বাবুই পাখির নীড়ের মতো অসহায়।
বন্ধু, পৃথিবীর শ্যামলিমায় বিশ্বাসী হও—
তুমি সহজভাবে বাঁচবে।

।। রাত্রি।।

রাত্রি, তুমি পৃথিবীর জীবনে আশীর্বাদ—সুখ।
আমাদের ইঙ্গিত কামনার তুমি সহায়ক,
তুমি কবির কলমে ইন্ধন,
অরণ্যের নিরালায় শিশুর মতো চঞ্চল মন;
সুতরাং পবিত্র।
রাত্রি, ফুটপাতের জীবনে তুমি অভিশাপ—ভয়।
যন্ত্রণার নিঃশ্বাসে বিষাক্ত,
কাজেই বিষাদময়।

।। বসন্তে ।।

আমরা তখন স্বপ্ন দেখছিলুম। স্বপ্ন দেখছিলুম
সুস্থ সুন্দর এক নাগরিক জীবনের।
উৎসের অন্ধকারে নদীর সমুদ্র-নীল-আকাঙ্ক্ষার মতো।
তাই আমরা তখন সময়ের প্রতীক্ষারত।
আবির্ভাব হলো আমাদের সূর্যমুখী স্বপ্নে
লালরঙ, প্রজাপতির। চমকে ওঠে সূর্যমুখী আগুনের ঘ্রাণে।
আমাদের বসন্তে আজ প্রজাপতির পাখা বিবর্ণ।
জীবনের মূল্যে সন্দিহান হলো শূন্যের প্রার্থনা-মগ্ন
চিরসবুজ বৃক্ষের ধূসর কঙ্কাল।

শ্রীকান্ত সিংহ

।। অপেক্ষা ।।

পরিবর্তনশীল জগতের নিত্য আলোড়ন,
স্ফীত সমুদ্রতরঙ্গের উদ্দামতা আর
ভীষণ ভূমিকম্পের তাণ্ডব ধ্বংসের প্রচেষ্টা।
পলে পলে মিনিটে মিনিটে আমার
ক্ষয়শীল আয়ু, বল, শৌর্য-বীর্য
সব যাক্ ধ্বংসের পথে। তবু আমি
স্থির অচল অটল বসে রবো মিলের অপেক্ষায়।

পীযূষ রাউত

।। আমরা সংশপ্তক অধুনা বিষণ্ণ দিনের

এক.

সারারাত পাখি আর নক্ষত্রের গান শুনে
ওরা একে একে ফিরে গেল—নৈঃশব্দেব মিনা
সেই সহস্র নিসর্গ মনে।

দুই.

আমাদের সবুজ মাঠে প্রতীক্ষায় নিরত
মানুষ। (সমস্ত দিগন্ত জুড়ে হলুদ রোদের বেখা। সংবিত
ফিরে পেয়ে পাখিরা উড়ে যায় শাল
আর মহুয়ার স্মৃতি নিয়ে সমুদ্র প্রণয়ে নিরবধিকাল)

তিন.

অথচ ধ্বংসের উত্তুরে হাওয়া—অসহায়
রজনীর সিঁড়ি বেয়ে প্রতারণায়
উদ্গীর্ণ করে প্রতীতির অপার বেদনা।

চার.

দয়িতার স্বপ্নে আকাশী চাঁদের মতো
প্রেমময় রাত। জতুগৃহ দাহ হলে সংঘবদ্ধ জনতার
অনিন্দ্য শপথ :
'আমরা সংশপ্তক অধুনা বিষণ্ণ দিনের।'

শারদীয়া
জোনাকি
১৩৭০

শারদীয়া ——

জোনাকি

—— ১৩৭০

।। জোনাকি-প্রসঙ্গ।।

।।সাহিত্য পত্র।।

সম্পাদক ।। পীযূষ রাউত ।।
পরিচালক ।। কান্তিভূষণ রায় ।।
।। নগেন সাহা ।।
প্রকাশক ।। পীযূষ রাউত ।।
সহায়ক ।। সুধীরেন্দ্র চক্রবর্তী ।।
প্রকাশস্থান ।। আশ্রমপল্লী ।।
।। কৈলাসহর ।।
।। ত্রিপুরা ।।

মুদ্রাকর : শ্রী গুরুগোবিন্দ ধর
।। শ্রীপ্রেস : কৈলাসহর : ত্রিপুরা ।।

মূল্য ।। ৫০ নয়া পয়সা ।।

।। সূচীপত্র ।।

।। আমাদের কথা ।।

ক্ষুদ্র শহর এই কৈলাসহর। এ যাবৎকাল এই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে শুধু অন্ধকারই জেগে রয়েছিল। একটু আলোর জন্য গুমরে উঠছিল তার সত্য, শিব ও সুন্দরের অন্তরাত্মা। আলোহীন প্রকোষ্ঠে হাঁপিয়ে উঠছিল সে। তার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা : 'একটু আলো, যত সামান্যই হোক, তুমি জ্বেলে দাও'। প্রায় দু'বছর আগে তার আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতি দেখা দিল। 'জোনাকি' আলো জ্বাললো এই শহরের অতন্দ্র আঁধারের অন্তহীন নির্জনতায়,

সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে 'জোনাকি সাহিত্য মাসিক' মাসের পর মাস হাতে লিখে বেরোতে লাগল। কিন্তু হাতে লেখা বলে আলো যে মাত্র একটি জোনাকিরই। নীলাভ, স্বপ্নাচ্ছন্ন কিন্তু বড় বেশী ক্ষুদ্র। সুতরাং 'জোনাকি' বললে, আমি আমার একক আলোককে বহুর মধ্যে ছড়িয়ে দেব। আমি তখন একা 'আমি' থাকব না। 'আমরা' হব। অতএব গেল পঁচিশে বোশেখ (১৩৭০ সনে) সে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিল। বেরোল 'জোনাকি কবিতা সংকলন'। হোক্ না আকারে ক্ষুদ্র। তবু তো তার আলো আরো ছড়াল। কিন্তু মন ভরলো কই?

মন না ভরার এই যে অমেয় অতৃপ্তি; সে প্রয়াসী হলো অপরিপূর্ণতার জ্বালাকে উপশমিত করে পূর্ণতার আলোকে উদ্ভাসিত হতে। ফলত সাহিত্যের অন্যান্য অনেক বিভাগ নিয়ে বেরোতে চললো 'শারদীয়া জোনাকি'। সাড়া পেল অকল্পনীয় রূপে। কৈলাসহর-বাসীদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সাহায্যে পুষ্ট হয়ে সে প্রকাশের দিন গুনতে লাগলো।

পুজোর গন্ধে, বর্ণে একদিন ভরে গেল সমগ্র চরাচর। শরতের অনির্বচনীয় রূপে আগমনীর সংগীত শিউলি ঝরার মতো ঝরে পড়তে লাগল। প্রকাশ পেল 'জোনাকি'। প্রকাশ পেলো সত্যি, কিন্তু সঙ্গে মিশে রইলো একটি স্থির বেদনা। সময়ের স্বল্পতার জন্য সন্নিকটস্থ অঞ্চলের কোনো রচনাই আমরা প্রকাশ করতে পারলাম না।

প্রকৃতির শারদ সমারোহে অন্যান্য বছরের মতো এবারও পুজো এলো। আমাদের বাঙ্গালী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুজো। আমাদের মহোৎসব। যে মহোৎসবে আমরা নিত্যকার ক্লেদ, গ্লানি ভুলে এক অপরিমেয় আনন্দস্রোতে ভেসে চলি। এই উৎসবের শুরুতে আজ আমরা, জোনাকি-গোষ্ঠীরা, তাই সকলের প্রতি স্বতঃ উৎসারিত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

।। একটি অনড় আমায় ।।

শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য

একদিন আমার কাছে এসেছিল রঙিন-ফুলের ক'টি'পাতা
হৃদয়ের পার্থক্যগুলি ভেঙেচুরে খান্ খান্ করে
ফুল যেন হাত তার বাড়িয়েছিল অকাতরে
সহজ বুকের 'পরে সবুজ স্নেহের প্রসন্নতা।

একদিন আমার কাছে প্রশ্নভরা দৃষ্টি নিয়ে এসেছিলে কেন?
জিজ্ঞাসার অতীত স্পর্শ, সান্ত্বনার শেষ অবসর,
তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিল দু'দণ্ড আমার এ গদ্য গদ্য সংকীর্ণ বাসর,
মিলায়নি সে সব প্রশ্ন, জিজ্ঞাসার সহজ দৃষ্টি আজও, এখনও।

মনে হয় মুছে গেছে এখন আমার
প্রতিষ্ঠিত সব সত্য, হৃদয়ের সব অঙ্গীকার।
যেহেতু আকাশে ওড়ে না পাখি, শীর্ণ কেন হয়ে গেছে পরিপূর্ণ নদী,
জমে গেছে জিজ্ঞাসার স্রোত, বাঁকে বাঁকে চেষ্টার সমাধি।

তবু যে সে আসে বারে বারে, হৃদয়ের সান্ত্বনার দ্বারে;
রাখে যে নিবিড় স্পর্শ বুকে রাখে চেতনার হাত
পদশব্দ শুনে অবিরাম আত্মমগ্ন নক্ষত্র কিংবা শিশিরের শব্দের রাত।

— x —

।। সূর্য প্রার্থনা ।।

চৈতালী মুখোপাধ্যায়

সূর্যের স্বপ্ন হতে এখনো নির্বাসিত আমি সত্তার নিবিড়,
গভীর বুকে। কবে যেন অনধীর
মুখের ছায়া জন্মক্ষণে বিষাদ বিমূঢ় মৃত্যুর গান
শুনেছিল।

অধুনা লোকালয় হতে সহস্র বৎসর দূরে সমাসীন প্রাণ।
নিসর্গের অদমিত আলো দগ্ধ করে গতিশীল
সকম্প্র সময়।

হে সূর্য, আমায় নিয়ে চল দীপ্র
লোকালয়ে। কেননা আকাঙ্ক্ষার উদ্বেল সমুদ্র
আজ অমৃত হৃদয়।

ফুল, গাছ, পাখি কল্লোলিত হয় সহস্র অযুতবর্ষ শতাব্দীর
শ্রেণীবদ্ধ বুকে।
আমি যাব সতীর্থের হতাশার পাশে। কেননা মৃত্যুর ছায়া ঘিরে সৃষ্টির
ক্ষুধা নিশিদিন ধ্বনিময় সংঘাত-শোকে।

— x —

।। মনস্তাপ নিয়ে বাঁচে ।।

মেঘবর্ণ

অত্যুচ্চ আশা নিয়ে নিমজ্জিত দেহের প্রবাল
স্নায়ুতে বিড়ম্বনা। রক্তে যেন মৃত্যু-স্বাদ স্থবির বসতি
মাটির কোমল বাঁধন ক্ষুধাগ্রস্ত শরীরে নিবিড়
পায়ে-পায়ে অশরীরী মৃত্যুমায়া লীন।

বিবর্ত দিনের মাঝে রুদ্রাক্ষর বাঁচার তাগিদ
মাটিতে দেহের টান—
আশায় আকাশ ভরা অতিক্রান্ত মেঘের শিবির।
আমার প্রলুব্ধ মন মনস্তাপ নিয়ে বাঁচে,
উচ্চবাচ পথে চলে আমার উচ্চাশা আজ নিঃশেষে বিলীন।

বেলোয়াড়ি মন নিয়ে অকর্মণ্য দেহের পরিখ
অতলান্ত দেহপীড়া।
আপাত বেদনা নিয়ে অশ্রেয় এই বাঁচার নীতি।
আমার নৈমিত্তিক কাজ বাক্যের সিঁড়ি চড়া,
অনাদৃত আমি তাই অনাশ্রিত দেহের কুটীরে।

— x —

।। অকারণ কারণ ।।

সুধীরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী

এই শহরের এক নির্জন কোণে
নিশীথ রাতে পাশবিক আনন্দের অট্টহাসি
আর বুদ্‌বুদের জীবনের মতো একটুখানি
বাস্তব ইতিহাসের অভিনয় চলে। এবং তখনই
তোমার দেহের প্রতিটি
রক্তের টানে চলে তীব্র ক্ষুধার জ্বালা।
হিংসার বিষবাষ্পভরা
রুদ্র অভিশাপের এক-একটি অগ্নিবাণ
আমার সুখের নীড়ে হানে মৃত্যুর
হাহাকার। কারণ—
তোমার কাছে তখন আমি ঐ
পাশবিক আনন্দের এক অভিনেতা।

— x —

।।জিজ্ঞাসা।।

পরিমল মালাকার

অজন্তা-গুহার লাস্যময়ী নারীকে দেখে
তোমার লজ্জা হলো। উচ্ছ্বাস দেহবিলাসে ব্যগ্র উর্বশীর
লালসাময় দুটো চোখে ঢল ঢল হাতছানি।
আধো ফোটা অধরে নিষ্ঠুর রঙীন ভালোবাসা। বুঝেছি
তোমার মনে ঢেলেছে প্রকাশ্যের কলঙ্কময় ভীরুতা।

তাই, প্রকৃতিকে কৃত্রিমতায় সাজিয়ে নিয়ে,
শিমুল-সুতোর কৌটো ছুঁয়ে,
রেশমী সুতোয় স্নিগ্ধ আভায় এবং
জরি জহরতের কারুশিল্পে লজ্জাকে করেছ
আচ্ছাদন। কে জানে মেয়ে তোমার সত্তার সৌন্দর্য কোথায়।

— x —

।।জন্মান্তর।।

শ্রীকান্ত সিংহ

একটি আবেশী হাতের আলো-আঁধারে ফুটে ওঠা চাঁদ
আলস্যে যেন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল
দিকচক্রবালে।
একটি ধূসরগন্ধ—অতৃপ্ত কামনার মনকে দলিয়ে দিয়ে
তোমার সুডৌল সুন্দর দেহ থেকে উত্থিত হয়ে মিলিয়ে গেল
অদৃশ্য অচেনা অজানা জন্মান্তরে।
যেন সে একটি প্রেম।
যেন সে জন্মান্তরে পূর্বের পরিপূরক হয়ে
বারংবার জেগে ওঠে সুপ্রচ্ছদরূপে।
যেন দূর হতে দূরান্তরে টেনে নিয়ে তার
অতৃপ্ত প্রেমের বাসনা, ধ্বংসহীন মনের চিরায়ত রেশ।
যেন ধ্বংসের বুক চিরে আবির্ভূত হয়ে থাকে পূর্বের স্মরণীয়
প্রেম।

— x —

।। কাহিনী ঃ পরিশেষ ।।

তপন ভট্টাচার্য

তখন এক খাপছাড়া বিশ্রি বিকাল।
আমি শ্রান্ত, কঠিন আলস্যে বসে আছি
এক জীর্ণ বৃক্ষ ছায়ায়। একতারা হাতে
এক গায়েন পাগলা আমার পাশে।

কাহিনী ঃ সে দিনের বসন্ত-বিলাস।
তার কথা 'তুমি আকাশ আর আমি?'
আমার গাঢ় স্বরে 'তুমি চাঁদ।'
তারপর?
তারপর এখন অদূরের ঐ শুষ্ক লালরঙ টিলা
আমার মনের বর্তমান রূপান্তর যেন।

পরিশেষ ঃ আমার মনের কাহিনী পাগলা গায়েনের একতারায়
আচমকা সুর পেল। আমি কেঁপে উঠলাম।
বিগত রাত ঃ মশাল হাতে দুর্গম পথের এক
পথিক। তার পিছু নিলাম।
কেননা আমার মনের অবাস্তব আশা,
একটুকরো তেমনি খেয়ালি কথা 'তুমি আকাশ,
আর আমি?'

— X —

।।আলো।।

মৃণাল চক্রবর্তী

কারখানার ঘণ্টাধ্বনি যেন
মাইকের প্রতপ্ত আর্তনাদ,
নগ্ন যুবতীর মতো ঝলসানো বিপণি
ও বোনাসের নিষ্ঠুর পরিহাসে
শরতের কুহেলিকা আর্ত, আচ্ছন্ন।
অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার—
জ্বলন্ত ইস্পাতে হাতুড়ির প্রচণ্ড রোষ,
বেলুন, পটকা, টেরিলিন, বেনারসী,
তাঁতের ঘর্ঘর শব্দ, গৃহীর বিনিদ্র রজনী
তা'ও বোধনযজ্ঞ।
চূড়ান্ত প্রগতি—
কেঁপে কেঁপে আকাশের মাথা ছুঁয়ে
অভ্রভেদী সুরম্য অট্টালিকা—স্বর্গের সিঁড়ি বেয়ে
মিছিলের বন্যা; উপবাসে উপাসনা
বুলেটের প্রশান্ত ক্ষুধা
জীবন-মৃত্যুর নদে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল
বাসুকির বিষাক্ত নিঃশ্বাস—জীবন-প্রভাত;
আলোর পবিত্র বর্তিকা শারদোৎসবে নক্ষত্রের মতো জ্বলবে।

— x —

।। লগ্ন, গোধূলি ।।

প্রণব চৌধুরী

সব ছায়া ছেয়ে গেলে আমি তখনও স্ব-নীড়ে ফিরে আসা অজস্র বিহঙ্গের
চলমান স্নেহ অথবা দূরাগত মেঘের সন্দেহী অতৃপ্ত বাসনার
চক্রান্তে জড়িত থাকি। কিন্তু তোমার হিরণ্য আশিসে ভয় করিনা।
কারণ এটা তোমার মতো রাঙা গোধূলির বিচার্য মায়া।
পৃথিবী! এক মলিন রোগশয্যায় তোমার মৃত্যুর মতো এই বিকেলে
আর কিছু নয়, শুধু তোমার ভূ-স্বর্গ ইতিহাস
আকাশ, অরণ্য, সাগর।
প্রেম, বিরহ, স্মৃতি।
সব মিলে কিছু ছেঁড়া পাতা দেখে নেয় হিরণ্ময়, রৌদ্রময় চোখ।
কিন্তু তখন লগ্ন গোধূলি। তখন নীলিমা সূর্যের পশ্চিম আগুনে সতীর
সহমরণ বিলাসী।
সত্য ও প্রেম। শাশ্বত দু'টি শ্বাস। দু'টি হাত। তারপর তাই সূর্যাস্ত নীলিমায়
প্রাগ্মরণ বিয়ে।
পৃথিবী! এক মলিন রোগশয্যায় তোমার মৃত্যুর মতো এই বিকেলে
মনে হয় এক উড়ন্ত মেঘের রঙিন ভূমিকা থেকে
জীবন দূরে, বহুদূরে বেসাতির সাম্রাজ্যে মিটি মিটি করে। তাই উপসংহারে
মূর্চ্ছা এবং পুনর্জাগরণ। তার সজ্ঞানে সন্ধ্যা ফিরে আসবে—যার নাম
স্মৃতির এক জন্মান্তর। স্বপ্নময় মোহ, নক্ষত্রপতনে বিয়োগ সকলেই একটি
লবন-পাহাড়ের মতো গলে যায়, আবার কাঠিন্যে মূর্ত হয়।
ঈশ্বর! শুধু পাহাড়ী জাড্যের মতো এই অসাড় আমিত্বে একটু
জ্যোৎস্নার সান্ত্বনা দাও।
একটি কাক, দু'টি কাক একে একে সকলেই চলে যায়। আর ভাড়াটে
চড়ুই-এর দল অজস্র হৈমহাসি নিয়ে আবার শৃঙ্খলে ফিরে আসে।
আর আমি?
আমি এক দুর্বল হৃদয়ের নগ্ন মহাজন মাত্র। তাই সকল সবুজ রক্ত
সন্ধ্যার কালশয্যায় ঘুমিয়ে পড়ে।

— x —

।। একুশে ফাল্গুন ।।

বিমল দেব

সুমিতা তখনো গোঙাচ্ছিল। আস্তে আস্তে বাঁশের জানলাটার কাছ পর্যন্ত এসে পড়ল দিগন্ত। চুপিচুপি—চোরের মতো। কেউ দেখে ফেলেনি তো! শিকারী চোখে চারদিক ভালো করে খুঁজে নিল—না, কেউ নেই কোথাও। না থাকবারই কথা। সম্পূর্ণ নিরাপদ। এর জন্যেই দিগন্ত শহর থেকে বহু দূরের এ' অখ্যাত জায়গাটি বেছে নিয়েছে। কিন্তু তবু কেন যেন বুকটা টিপ্‌টিপ্ করে। অপরাধীর মতো নিজেকে একা মনে হচ্ছে তার। হঠাৎ মনে পড়ল দিগন্তর, ওখানে যাওয়াটা কি তার উচিত হচ্ছে? কথাটা বিচার করে দেখবার ফুরসৎ পায়নি সে। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে শুধু বুঝেছে তাকে যেতে হবে। কেন? তা জানে না সে। বিবেক তাকে তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে। লজ্জার স্বাভাবিক কারণ থাকা সত্ত্বেও না এসে পারেনি দিগন্ত। দিগন্ত এসেছে। চোরের মতো এসেছে আবার চোরের মতোই ফিরে যাবে। কোনো সাড়া দেবে না, কিছু বলবে না—শুধু একচোখ দেখে যাবে। মাত্র একবার। বড্ড ইচ্ছে হচ্ছে তার।

জানলাটার কাছে এসে দাঁড়াল সে। একেবারে বুকের সাথে ছুঁয়ে। ভাঙা জানলার এ' ফাঁকটুকুই যথেষ্ট। ঘরের ভেতর মোটামুটি সব দেখা যায়। তক্তপোষের 'পর পা গোটানো মেয়েছেলেটিকে আধা-আলোতে স্পষ্টই চিনতে পারছে দিগন্ত। রামুর মা। দিগন্ত চেনে তাকে। কোনো একসময় তাদের বাড়িতে থাকত সে। দিগন্তকে সে চিরদিন ভালোবাসে। তাই প্রথমেই আজ তার কথা মনে পড়েছিল দিগন্তর। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে তিন মাইল দূর থেকে তাকে নিয়ে এসেছে অতীতের ভালোবাসার দাবী খাটিয়ে। রামুর মা বিনা প্রতিবাদে ছুটে এসেছে। তাই দিগন্তর নিজেকে আজ কৃতজ্ঞ মনে হচ্ছে। শুধু রামুর মা'র কাছেই নয়, তার পাশের ওই দরদী মেয়েছেলেটির কাছেও। রামুর মা'ই সাথে করে তাকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কী বিশ্রি চেহারা তার। যমের মতো অথবা ভূতের মতো। সমস্ত মুখের মধ্যে তার দু'চোখের সাদা

জমিগুলো খুব স্পষ্টই চোখে পড়ে । কেমন যেন ভয়-ভয় চেহারা। সুমিতা হঠাৎ দেখে আঁতকে উঠবে না তো! না-না, তা উঠবে কেন, রামুর মা'ই তো রয়েছে। দিগন্তর একজোড়া চোখ নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ ঘরের ভেতর দেখল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সুমিতার মুখটা দেখতে পেল না। শুধু শুয়ে থাকা একটা দেহে তার দৃষ্টি বার বার হোঁচট খেয়ে ফিরে এল। একসময় দিগন্ত জানলার ফাঁক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। মনটা এমন করছে কেন? কী যেন অস্বীকার করছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছে দিগন্ত, তার এই গোপন উপস্থিতিকে তার মন সহ্য করতে পারছে না। হঠাৎ প্রতিবাদ করে উঠছে ঃ এটা অনুচিত, অবাস্তব। এতে সভ্যতার অপমৃত্যু হয়। একটা অব্যক্ত লজ্জায় দিগন্তর মন কেমন যেন নুয়ে পড়ল। তার বিবেক মূর্চ্ছা গেল। জানলা কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে পড়ল সে।

একুশে ফাল্গুন। ক্যালেণ্ডারের পাতায় নীল রঙের এই তারিখটা খুব বেশী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যেন দিগন্তর দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে। পাথুরে দৃষ্টি তারিখটার। তাকিয়ে তাকিয়ে বলছে ঃ দিগন্ত, কাজটা তুমি মোটেই ভালো করোনি। এরপর যে কোনো ক্ষতির জন্যে দিগন্ত দত্তই কেবল দায়ী। তুমি সারা জীবনের জন্যে অপরাধী। মনে রেখো, আমি সাক্ষী।

চমকে উঠল দিগন্ত। জোর করে তারিখটার 'পর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

না-না, হতে পারে না। আমার কোনো দোষ নেই—কোনো দোষ নেই! দিগন্তর সমস্ত শরীর ঘেমে উঠল। অধীর পদক্ষেপে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল সে। এ'ভাবে অনেকক্ষণ। ঠিক কতোক্ষণ বলতে পারবে না। কারণ, হাতের এই ঘড়িটা কখন বন্ধ হয়ে গেছে খেয়াল নেই তার।

সেই থেকে এখনো তেমনি গোঙাচ্ছে সুমিতা। হয়ত বড্ড কষ্ট হচ্ছে। হবেই তো। এর জন্যে অবশ্য কাউকে দায়ী করা চলে না। কিন্তু আজ এই অসহায় সুমিতার সব কষ্টের জন্যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দায়ী দিগন্ত। এই দিগন্ত দত্ত। আর কেউ না জানলেও তার মন জানবে দিগন্ত দত্ত গিল্‌টি। কারণ, অতীতকে ইচ্ছে করলেই অতি সহজে ভুলে যেতে পারবে না দিগন্ত,

—সুমিতা?

—উঁ।

—ভীষণ ঝড় আসছে, না?

—হ্যাঁ, আসুক।

—তোমার ভয় হচ্ছে না?

—না।

—ঝড়ে যদি এই বাল্বটা ভেঙে ঘর অন্ধকার হয়ে যায়, তবু না?

—না।

—সত্যি বলছো?

—হ্যাঁ, সত্যি।

সুইচ বোর্ডটির 'পর দিগন্তর হাতটি স্পর্শ করল।

—এবার?

সুমিতা নিরুত্তর।

গোঙানির শব্দটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। দিগন্তর কাছে আর সহ্য হচ্ছে না। কী করবে সে? কিছুই না। কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ইস্, কী বিশ্রিভাবে তারিখটা এখনো তাকিয়ে রয়েছে!

ও-কথাই আবার বলছে : তুমি সারা জীবনের জন্যে অপরাধী।

চমকে উঠল দিগন্ত—না না, আমি নই—আমি নই ... ...!

দু'হাতে চুল আঁকড়ে ধরে একটা ছিন্ন লতার মতো থপ্ করে চেয়ারের 'পর বসে পড়ল সে।

তারিখটা স্পষ্টই বলছে সে অপরাধী। ভুল বলছে। কারণ, দিগন্ত এটা ভালো করেই জানে সুমিতার জীবনে এতোটুকু ক্ষতির জন্যে সে একা অপরাধী নয়, সুমিতা নিজেও। কিন্তু তবু মন কেন সব সময় সায় দিচ্ছে না?

কে! কে কাঁদে? ও-ঘরে নয়? হ্যাঁ, ও ঘরেই তো শুনল যেন। দিগন্ত স্পষ্ট শুনেছে একটা কচি কণ্ঠের চিৎকার। কে?

সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল দিগন্ত।

সুমিতা আর গোঙাচ্ছে না। একটা অজানিত আকর্ষণ পা'দুটোকে টানছে। দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। দিগন্ত আত্মসচেতন হল। একটু ভেবে বুঝল, আর এক পা-ও এগোনো তার পক্ষে সম্ভব নয়। দিগন্ত এলোমেলো পদক্ষেপে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। সমস্ত চেতনা তার প্রতিবাদ করে উঠল। না-না, এটা কোনোমতেই সম্ভব নয়, কোনোমতেই না।

মা-বা বন্ধু-বান্ধব কারো সামনে এই পরিচয় নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না সে। তারা সহ্য করবে না। কবলেও না। এটা অসম্ভব।

কি হল? আর কোনো শব্দ নেই কেন? শুধু একবার, একবার একটু কান্না। তারপর সব চুপ। দিগন্ত তো এটা চায়নি। সে যে আশা করছে ওই কান্নার শব্দ অনেকক্ষণ ধরে কানভরে শুনতে থাকবে। কিন্তু এ কী হল? কী করল রামুর মা? টেবিলের পর টাকার তোড়াটির দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠল দিগন্ত।

ক্যালেণ্ডারের তারিখটা ও'কথাই আবার বলছে : এরপর যে কোনো ক্ষতির জন্যে তুমিই কেবল দায়ী! তুমি সারা জীবনের জন্যে অপরাধী।

— x —

।। কবি বিবেকানন্দ ।।

ড. সচ্চিদানন্দ ধর

উপনিষদে 'কবি' আর 'ব্রহ্মবিদ' দু'টি সমার্থক। উভয়েই ক্রান্তদর্শী। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ও ভাবনা যেখানে পৌঁছায় না কবির দৃষ্টি সেখানেও ক্রিয়াশীল। সাধারণ দেহবদ্ধ জীবন যেখানে ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কোনো সত্তার ও অনুভূতির কল্পনা করতে পারে না—কবির অনুভূতি সেখানেও জাগ্রত। অতীন্দ্রিয় রসবস্তুর রসাস্বাদে কবি ধন্য। ব্রহ্মবিদ ঋষির ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিও অতীন্দ্রিয়। 'অবাঙ্মানসগোচর' ব্রহ্মকে আস্বাদন করে ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি অনাবিল আনন্দের অধিকারী হন। কবিও 'ব্রহ্ম স্বাদসহোদর'—কাব্যানন্দ সম্ভোগ করে ব্রহ্মোপলব্ধির আনন্দই পান। ব্রহ্মানন্দকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—'বোঝে প্রাণ বোঝে যার'। কবির কাব্যচেতনার অনুভূতিও এক 'অলৌকিক হৃদয়-সংবেদ্য ব্যাপার'। কবি আর ব্রহ্মজ্ঞের অনুভূতির শেষ কথা—'রসো বৈ সঃ।'

বিবেকানন্দ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। বৃহৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার তাগিদে তিনি গৃহের মায়ামোহকে ছিন্ন করেছিলেন। অসহায়া জননী আর নির্ভরশীল ভ্রাতা-ভগিনীগণের মায়াবন্ধন তাকে সংসারে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তিনি 'পিঞ্জরাদিব কেশরী'র ন্যায় বেরিয়ে পড়লেন সংসার-পিঞ্জর থেকে। বৈরাগ্যে কঠোর মনই যথার্থ করুণায় বিগলিত হয়। যথার্থ ত্যাগীই পারেন আপামর সবাইকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে। কবিতা বস্তুটাই হৃদয়ের বস্তু।

ব্রহ্মানন্দের রসে যাঁর হৃদয় সরস তিনিই যথার্থ কবি। এর প্রমাণ আমাদের মহাকাব্য। আদিকবি বাল্মীকি সন্ন্যাসী, ব্যাসদেব সন্ন্যাসী। কবিতার জন্ম বেদনাবোধে। এর বড় সাক্ষী আমাদের আদি কবি। সাধারণ ক্রৌঞ্চীর আর্তি ত্যাগী হৃদয়কে নিংড়ে যে রস নিঃসারিত করে তার অমৃতধারায় জগৎ ধন্য। জগতের মানুষের আর্তি নির্বাণাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধের মনে নিয়ে এল এক মহা করুণারসের নির্ঝর। বুদ্ধের করুণা নির্বাণের রসে রসিত হয়ে হয়ে জীবনে নিয়ে এল

এক অপূর্ব আস্বাদন। বুদ্ধের জীবন একদিকে যেমন ত্যাগের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল, অপরদিকে তেমনি করুণার রসে সরস। বৈরাগ্য আর মহাকরুণা একত্র সন্নিবেশিত হলে কী হয়—তার দৃষ্টান্ত বাল্মীকি, তার দৃষ্টান্ত বুদ্ধ, তার দৃষ্টান্ত বিবেকানন্দ।

কবিসত্তার দুইটা দিক। একটা কবির ভাবনাকে, জীবনের সসীমতার বন্ধন থেকে উদার উন্মুক্ত বৃহতের দিকে নিয়ে যেতে চায়। আর অপরটা চায় রূপে রসে শব্দে, স্পর্শে গন্ধে ভরা এই পৃথিবীর সঙ্গে নিবিড় হয়ে মিশে থাকতে। একটা সসীমতার বন্ধন থেকে যেতে চায় অসীমের পথে। অপরটি অসীমকে ধরতে চায় সসীমের মধ্যে। এই সীমা-অসীমার পথে যাতায়াতের যে আনন্দময় অনুভূতি, তারই প্রকাশ কাব্য।

বিবেকানন্দ অক্ষরার্থে ক্রান্তদর্শী কবি। তিনি নিজের সঙ্গে বিশ্বের একত্ব অনুভব করেছেন সৃষ্টির আদিকাল থেকে বর্তমানের কালপ্রবাহে।

'আমি বর্ত্তমান।
মহা অন্ধকার করে অন্ধকার-বুকে,
ত্রিশূন্য জগৎ শান্ত সর্বগুণ ভেদ,
একাকার সুক্ষ্মরূপ শুদ্ধ পরমাণুকার
আমি বর্ত্তমান।
আমি হই বিকাশ আবার।
মন শক্তি প্রথম বিকার,
আমি আদি বাণী প্রণব অঙ্কার
বাজে মহাশূন্য পথে ... ... '

* * *

আমি আদি কবি,
মন শক্তি বিকাশ রচনা
জড় জীব আদি যত
আমি করি খেলা শক্তিরূপা, মম মায়া সনে
একা আমি হই বহু দেখিতে আপনরূপ—'

(বিবেকানন্দ—'গাই গীত শুনাতে তোমায়'।)

কবি বিবেকানন্দ একদিকে সৃষ্টির আদি-কারণের সঙ্গে নিজের একত্ব অনুভব করে বিশ্বের প্রতি অনু-পরমাণুতে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন। আবার সেই বিবেকানন্দই অপার করুণার বেদনা অনুভব করে বলেছেন—

'শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার—
তরঙ্গ আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার—
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ নিয়মন, মতামত দর্শন-বিজ্ঞান,

ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম, 'প্রেম' 'প্রেম' এই মাত্র ধন।
জীব, ব্রহ্ম, মানব, ঈশ্বর, ভূত, প্রেত আদি দেবগণ,
পশু, পক্ষী, কীট, অণুকীট, এই প্রেম হৃদয়ে সবার।'

যে প্রেমের আবেগ সন্ন্যাসীকে ব্রহ্মমুখী করে—গৃহত্যাগী করে, সেই প্রেমই আবার তাঁকে নিয়ে আসে মর্ত্যের বুকে। চরম ত্যাগের পরম আনন্দ এই প্রেমেরই ফল। সুখ-দুঃখের উর্দ্ধে অনির্বচনীয় এই আনন্দ সত্তাই সাধকের কাম্য, কবির আশ্রয়।

'এরি লাগি ঝরে আঁখিজল
সারা বিশ্বে হাসি ছড়াবারে
এ যে শান্তি লক্ষ্য জীবনের
একমাত্র আশ্রয় নিশ্চয়। *(Peace—বিবেকানন্দ)*।

এই চরম 'আশ্রয়'কে লাভ করবার জন্য যখন মানুষ সংসার-বিমুখী হয় তখন বিবেকানন্দ বলেন

—'অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান।'

যে প্রেম মানুষের হৃদয়ে—সেই প্রেমই 'ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণুতে'। ব্রহ্মের সঙ্গে কীট পরমাণুর একত্ব অনুভব এবং ব্রহ্মানন্দ থেকে চিত্তকে বিরত করে কীট-পরমাণুতে সংস্থাপনই হল কবি বিবেকানন্দের, ব্রহ্মবাদী বিবেকানন্দের কাব্যের ও জীবনের মূল বক্তব্য। জীবনের সঙ্গে ঈশ্বরের একাত্মানুভব এবং জীবসেবাকেই ঈশ্বর সেবারূপে গ্রহণ করা কবি বিবেকানন্দের এক নূতন অবদান। ফলিতবেদান্তের এক নব ভাষ্য। কাব্য রসাস্বাদের এক অভিনব পন্থা। কাব্যে অনির্বচনীয়তাবাদের সঙ্গে মানবতাবাদ বা জীববাদের অপূর্ব সমন্বয়।

— X —

।।স্বপ্ন।।

কান্তিভূষণ রায়

'একি পিন্টু, আবার দুষ্টুমি হচ্ছে? দাঁড়াও, আজ তোমায় মজা দেখাচ্ছি'—বলে দুম্‌দাম্‌ করে দ্রুতপায়ে অনিমা পিন্টুর দিকে এগিয়ে গেল। পিন্টু ওর মা'কে সারা বাড়িতে কতক্ষণ ছুটোছুটি করিয়ে একসময় পেছন থেকে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে মার কাপড়ে আত্মগোপন করতে চেষ্টা করল। আর খুব কতক্ষণ ছেলেমানুষি হাসি হাসল। অনিমা পিন্টুকে একটু আদর করে গালটা টিপে দিয়ে বলল, 'ছিঃ পিন্টু, অমন দুষ্টুমি করে না। সেই কখন তোমাকে দুপুরের ভাত খাইয়ে দিয়েছি। এবার একটু লক্ষ্মী হয়ে ঘুমোও দিকিন্‌। ঘুমোলেই বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাব' বলে আর একটু আদর করে পিন্টুকে ঘরের দিকে নিয়ে গেল অনিমা। তারপর এক ফাঁকে দুপুরের কাজকর্ম সেরে অনিমাও এল পিন্টুর কাছে। পিন্টু তখনও সেই দুষ্টুমিই করে চলেছে 'একাই দেড়শো খোকা' হয়ে। অনিমা শুধু একবার বললে—'তোমাকে নিয়ে আর পারিনে বাপু। এমনি দুষ্টুমি করলে তোমাকে আর বেড়াতে নিয়ে যাব না। বুঝবে তখন মজাটা'—বলে ঘরদোর গুছিয়ে একসময় নিজেই এসে বিছানো বিছানায় শরীরটাকে এলিয়ে দিল। পিন্টু ওর মায়ের বুকে তার তিনবছরের শরীরটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিস্রস্ত করে তুলল। তারপর এক ফাঁকে কখন পিন্টু চৌকি থেকে নীচে নেমে এসেছে জানে না অনিমা। সারাদিনের কর্ম-ক্লান্তির পর অনিমারও বিছানায় এলিয়েই একটু তন্দ্রা এসেছিল।

পিন্টু দেখল যে ওর মা ওর সাথে আর কোনো কথা বলছে না, এমনকি খেলছেও না। পিন্টু ভাবল—'কি এমন দোষটা আমি করেছি? না হয় মাকে কতক্ষণ ছুটিয়ে মেরেছি—তাই বলে—তাই বলে আমার সাথে কথা কইবে না, খেলবে না? আচ্ছা, আমি একা-একাই খেলব'—ভেবেই চৌকির নীচে হাতের কাছেই একটা পাত্র দেখল পিন্টু। পিন্টু ভাবল—'এ পাত্রটা নিয়ে পুকুরে বেশ খেলা যাবে।' সেদিন পিন্টু ওর মাকে এই পাত্রটা নিয়ে পুকুরে ছেড়ে

দিতে দেখেছে আর সে সাথে দেখেছে পাত্রটা নৌকোর মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে পুকুরে। কী মজা! কী মজার খেলা!

অনিমার দু'চোখ ক্লান্তিতে বুজে গেছে। অসহ্য গরমের দুপুরে ঘুমোনো দায়! তবু একবার চোখ বুজে আসলেই একেবারে ঘুমে মাতাল। তখন দু'চোখ খোলা বড় দায়। অনিমাও এমনি ঘুম-মাতাল হয়ে আছে। একসময় স্বপ্নে দেখল—বিকেলে পিন্টুকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে অনিমা। পিন্টুকে একটা লাল বেলুন কিনে দিয়েছে। পিন্টু সেটা হাতে করে একবার মচ্‌মচ্‌ পচ্‌পচ্‌ শব্দ করছে আর খিলখিলিয়ে হেসে উঠছে মায়ের কোলেই। অনিমাও তার চল্লিশ টাকায় কেনা 'স্বর্ণালী সন্ধ্যা' শাড়িটা পরে বেরিয়েছে। চারপাশের লোক যেন তার দিকে আর শাড়িটার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। পছন্দসই আর মনমাতানো শাড়িটা পরে অনিমা বিভাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে—আর সে সাথে রিক্সায় না গিয়ে হেঁটেই যাচ্ছে অনিমা।

পিন্টুকে অনেকক্ষণ কোলে করে রাখাতে হাতটা টন্‌টনিয়ে উঠেছে। রাস্তাটাও যেন শেষ হচ্ছে না আজ। অথচ বিভাদের বাড়ির এত কাছে এসে গেছে যে এখন আর রিক্সায় ওঠার কোনো মানেই হয় না। কিন্তু পিন্টুকেও যেন আর হাতে ধরে রাখতে পারছে না। হাতটা ধরে গেছে। ভীষণ ধরে গেছে। একবার মনে হল ওর নিঃসাড় হাতের ফাঁক দিয়ে পিন্টুর শরীরটা গড়িয়ে পড়ছে নীচে। ঠিক পরক্ষণেই মনে হল বুকের ঠিক মাঝখানে প্রচণ্ড এক ব্যথা। সাংঘাতিক এক ব্যথা। অব্যক্ত এক ব্যথা যেন তার বুক ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। অথচ বেরোবার পথ পাচ্ছে না ... ...।

ঘুম থেকে হঠাৎ-ই জেগে উঠল অনিমা। কি এক দুঃস্বপ্নই না দেখেছে সে। ছিঃ ছিঃ, বেলা চারটে বেজে গেছে। এক্ষুণি তো উনি অফিস থেকে এসে পড়বেন। জলখাবার দিতে হবে। ঘরদোর গুছিয়ে ঠিকঠাক করে রাখতে হবে। তারপর বেড়াতে ... ...

বেড়ানোর কথা মনে হতেই অনিমা পিন্টুকে একটা ডাক দিয়ে বলল, 'পিন্টু, তুমি আবার দুষ্টুমি শুরু করেছ'—বলে এদিক-ওদিক এঘর-ওঘর একবার তাকিয়ে দেখল অনিমা। কিন্তু কোথাও কোনো সাড়া না-পেয়ে সারা বাড়ি 'পিন্টু-পিন্টু' ডেকে তোলপাড় করে ফেলল। তারপর একসময় পুকুরের দিকে চোখ পড়তেই দেখল তার একটা পাত্র ভাসছে—জলে ভাসছে। যেমন সংসার-সমুদ্রে মানুষ ভাসে—ভাসে মানুষ। কিন্তু সে পাত্রটা যেন ডুবছে আর ভাসছে—ভাসছে আর ডুবছে সেই পুকুরে ... ...।

— x —

।। সুখ ঃ সন্দেহ ঃ শোক ।।

পীযূষ রাউত

এইমাত্র গুডস্ ট্রেনটা না থেমে শুধুমাত্র তীব্র হুইসেল্ দিয়ে স্টেশন পার হয়ে গেল।

এখানে এই ঘরে সুনন্দ হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। স্বভাবতই চোখদুটো তার ক্যালেণ্ডারের পাতায় এগিয়ে গেল। জুন। পঁচিশ। এক বছর ফুরিয়ে গেল।

তিনি চোখ ফিরিয়ে শূন্যের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আকাশে তারা নেই। অন্ধকার। তাঁর অসহায় অলস দৃষ্টি হতে অনেকগুলো মুহূর্ত ঝরে পড়ল।

ভারী হল রাত। নিশ্চুপ হয়ে গেল স্টেশন সংলগ্ন এই শহরগামী পথ। সুনন্দ তখনো জানালার গরাদে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ওর চোখেমুখে স্পষ্ট হল। তিনি কেমন অশান্ত অস্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। ভয়, বেদনা, বিক্ষোভ সব রেখাগুলো প্রকট হয়ে উঠল মুখাবয়বে।

সুনন্দ এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে দেরাজ টানলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। এক বছর আগে তুলে রাখা বাঁধানো ফটোখানা আস্তে আস্তে বের করে আনলেন। কেমন ধোঁয়া-ধোঁয়া বিবর্ণ মনে হল। আলোর নীচটাতে গিয়ে ফটোখানা সোজা চোখের উপর তুলে ধরলে তার মনে হল জয়ন্তী কিছু যেন বলতে চাইছে।

তার সমগ্র চেতনা উন্মুখ হল। তিনি দেখতে পেলেন জয়ন্তীর ঠোঁট নড়ছে। অস্ফুটস্বরে সুনন্দ বললেন, 'কিছু বলবে?'

—হ্যাঁ।

—বলো।

—আমি রাত সাড়ে বারোটার লোকালে আসব। তুমি স্টেশনে এসো।

সুনন্দ ফটোখানাকে এবার আর দেরাজে তুলে রাখলেন না। টাঙিয়ে দিলেন আলোর নীচে একটা পেরেক ঝুলিয়ে। তারপর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন।

একমুঠো বাতাস অকস্মাৎ ঢুকে পড়ে এলোমেলো করে দিল সুনন্দকে। একটা গভীর বেদনাবোধে মনটা তার কঁকিয়ে উঠল। তিনি ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন নিঃস্ব সম্রাটের মতো। তার চলমান দেহ হাত বাড়িয়ে স্যুইচটা টিপে দিলনা কিংবা ভেজিয়ে দিলনা খোলা দরজাটা। বাতি জ্বলতে থাকল। দরজা খোলা রইল। সুনন্দ দু'কদম পথ পার হয়ে স্টেশনে ঢুকবার মুখে যে বাঁধানো চত্বর সেখানে প্রবেশ করলেন। নীরব, নির্জন, অস্বাভাবিক। দু-একটা নেড়িকুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। ঘোমটা টেনে অনড় ভঙ্গিতে পড়ে আছে দু-একটা সাইকেল রিক্সাও।

এখানে দাঁড়ালেন না সুনন্দ। প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেন। দৃষ্টি ফেললেন চতুর্দিকে।

উপরে ঢেউখেলানো শেডের নীচে উজ্জ্বল নীল রড্‌লাইটগুলো জ্বলছে। বুকিং কাউন্টার এবং অফিসের মধ্যেও আলো। কিন্তু কেউ জেগে আছে কি না বুঝতে পারলেন না সুনন্দ। আলো থাকলেই মানুষ জেগে থাকে না। অন্ধকারেও জাগে। চোখের সুমুখে এই শেডের উজ্জ্বলতার বাইরে যে অতন্দ্র সীমাহীন অন্ধকার—সে অন্ধকারের দিকে চোখ পড়তেই সুনন্দর মনে হল অন্ধকারেও এক এক সময় মানুষকে জেগে থাকতে হয়। মানুষ ভালোও বাসে হয়তো। তিনি টের পাচ্ছিলেন—এই অন্ধকারে কল্পনার পক্ষীরাজ তাকে পিঠে নিয়ে তেপান্তরে পাড়ি দেবে না সত্যি, কিন্তু এমন কিছু দেবে যা এযাবৎকাল তিনি চেয়ে আসছিলেন এবং যার প্রয়োজন এখনো তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। তার এমত ধারণা স্টেশনের রাত বারোটার প্ল্যাটফর্মেও তার চিন্তাধারাকে আবর্তিত করতে লাগল। তিনি অতীতের দিকে ফিরে তাকালেন.।

অন্য এক স্টেশন। অন্য এক সময়।

ভীড়ে গমগম করছে সারা প্ল্যাটফর্ম। যেন সমগ্র শহর উঠে এসেছে।

জয়ন্তীকে তুলে দিতে এসেছিলেন সুনন্দ ও অরুময়।

তখনো সেকেণ্ড ওয়ার্নিং পড়েনি বলে সুনন্দ ও অরুময় জয়ন্তীর সুমুখের বেঞ্চিটাতে বসেছিলেন।

জয়ন্তী আবার বলছিল—তোমরা কবে আসছো আমাকে কথা দাও।'

—সামনের রোববার। সুনন্দ, তুমি কি বলো?' অরুময় জয়ন্তীর কথায় উত্তর দিয়ে সুনন্দর সমর্থন চাইলেন।

—না, আমি পারছি না।

—এ কথার কোনো মানে হয়না সুনন্দ। আসতে তোমার হবেই আর অরুময়ের কথাই রইলো। আগামী রোববার।

ওয়ার্নিং পড়ল। সুনন্দর মনে হল স্টেশনের সময়গুলো বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়।

ভীড় ত্রস্ত হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণ হুইসেল দিল ইঞ্জিন।

সুনন্দ ও অরুময় নেমে পড়লেন।

ট্রেন চলতে শুরু করলে ওরা হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সরে দাঁড়ালেন।

ট্রেন গতি বাড়িয়ে দিচ্ছিল। জয়ন্তীর হাসি হাসি মুখখানা দূরে সরে যেতে লাগল। সে হাত বাড়িয়ে বিদায় নিলে। সুনন্দর মনে হল জয়ন্তীর খুব কষ্ট হচ্ছে ছেড়ে যেতে। তার হাসিটাকে খুব করুণ দেখাচ্ছিল যেন।

জয়ন্তীর ভালোবাসাকে বুঝতে ভুল করেনি সুনন্দ। অথচ স্টেশনের সেই মুহূর্তটির মতো আরো কিছু মুহূর্ত তার মনে এই প্রশ্ন উঁকি মেরেছে, কাকে ভালোবাসে জয়ন্তী? অরুময় না তাকে?

সব প্রশ্নের উত্তর জয়ন্তী সুনন্দর সংসারে এসেই দিলে।

সুনন্দর কৌতূহলের উত্তরে জয়ন্তী বলেছিল, 'জানি না আমার প্রতি অরুময়ের মনোভাব কি রকম ছিল, তবে আমি নিছক বন্ধুত্বের বাইরে ওকে কল্পনা করিনি।'

—কিন্তু অরুময়ও হয়তো তোমায় ভালোবাসতো জয়ন্তী।

—না।' ভালোবাসলে আমাদের বিয়েতে এতো মনখোলা ভাবে সে মিশে থাকতে পারত না।

প্রথম প্রথম সুনন্দরও তাই মনে হত। তিনি বিশ্বাস করতেন জয়ন্তীর কথা। কিন্তু বিশ্বাসের ভিত শেষ পর্যন্ত কতটুকু অটুট রইল?

বিয়ের পর অরুময়কে প্রায়ই নেমন্তন্ন করতেন সুনন্দ ও জয়ন্তী।

অরুময় আসত। নিঃসংকোচে তাদের আতিথেয়তা স্বীকার করত। কিন্তু সুনন্দই পারলেন না সহজ থাকতে। তার পূর্বতম ঈর্ষা নোতুন করে তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। তিনি মনে মনে অসুস্থ হয়ে উঠলেন।

একদিন ঘরে ঢুকবার মুখেই জয়ন্তী ও অরুময়ের হাসির ফোয়ারার কাছে থমকে দাঁড়ালেন সুনন্দ। ঢুকলেন না ভিতরে। নিঃশব্দে আবার বেরিয়ে গেলেন। জয়ন্তী ও অরুময়ের হাসির শব্দ তাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি দ্রুত ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

তখন অনেক রাত। সুনন্দ ফিরলেন।

জয়ন্তী জেগে বসেছিল। শব্দ পেয়ে দরজা খুললে, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে? আমি এদিকে ভাবতে ভাবতে মরছি। আমায় জানিয়ে গেলে কি চলত না?'

এ-কথার উত্তর দিলেন না সুনন্দ। বললেন, 'অরুময় এসেছিল?'

—হ্যাঁ।

—কখন?

—বিকেলে।

—কেন?

—কেন আবার কি? বেড়াতে।

শুরু হল।

সুনন্দর সন্দেহ জয়ন্তীকে বিঁধল।

দ্রুত একটা চরম পরিণতির দিকে উভয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন।

অনুরূপ ঘটনা আরো ঘটল। সুনন্দর সন্দেহ আরো স্পষ্ট হল জয়ন্তীর কাছে।

—অরুময় এসেছিল?

—হ্যাঁ।

—কতক্ষণ ছিল?

—আমি ঘড়ি দেখিনি।

—তুমি এখানে আসতে তাকে মানা করতে পার না?

—কেন, সে কী অপরাধ করেছে আর সে কি তোমার বন্ধু না?

—আমার বন্ধু হলেও তোমার কি?

—আমারও বন্ধু।

—না, ওসব বন্ধুত্ব এখন আর চলবে না।

—কী, কী বললে?' রাগে, দুঃখে, অপমানে কাঁপতে লাগল জয়ন্তী। 'ছিঃ, তুমি এই কথা বলতে পারলে?'

—যা সত্যি তা বলতে সুনন্দ ভয় পায় না।

—সত্যি!!' কান্নায় কেমন বিকৃত হয়ে গেল জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর। চেহারা। জড়িয়ে গেল কথা। হু-হু করে ভেঙে পড়ল বিছানায়।

জয়ন্তী সে রাত্রেই পালিয়ে গেছল।

গৌহাটিতে দাদার সংসারে গিয়ে কিছুদিন থাকার পর চিঠি দিয়েছিল : 'পঁচিশে জুন রাত সাড়ে বারোটার ট্রেনে আমি ফিরে আসছি—তুমি স্টেশনে থেকো।

এখন রাত সাড়ে বারোটার সেকেণ্ড সিগন্যালের কাছে ট্রেনের হুইসেল শুনে সুনন্দ চমকে উঠলেন।

ট্রেনটা দ্রুত এগিয়ে আসছিল। তার মনে হচ্ছিল একটা বিরাট ঝড় ছুটে আসছে। বুকে হাতুড়ির ঘা অনুভব করছিলেন সুনন্দ। তিনি চীৎকার করতে চাইছিলেন কিন্তু পারছিলেন না।

অতএব পূজায় আত্মনিয়োগ ছাড়া উপায় কি?

আসুন এবার ঘরের কথা চিন্তা করা যাক। সারাদিন কলম গুঁতিয়ে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে অন্যের উপকার বা অপকার করে এসেছেন। কিংবা 'বসের' বকা খেতে খেতে মাথাটা বিগড়ে যাওয়ার পরে গড়ের মাঠের হাওয়ায় রিপেয়ার না করেই বাড়ি ফিরেছেন। তখন যদি গিন্নির হাসি মুখটুকু না দেখেন, তা হলে কি অবস্থাটা হবে বলুন তো? আপনার বিগড়োনো মাথাটা কি অবস্থায় এসে দাঁড়াবে—যখন জলখাবার না দিয়েই আপনার নাকের ডগার উপর দিয়ে প্রসাধনের গন্ধে বাতাসে হিল্লোল তুলে গিন্নি সটান বেড়াতে বেরিয়ে গেলেন। গায়কের ভাষায় বলতে গেলে—

মন না দিলে বধু,
মন যে নিলে শুধু।

মন দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে আপনি বিলকুল হেরে গেছেন। আপনি সাংসারিক জীবনের খতিয়ান খুলে দেখুন, হিসাব মিলছে না। অর্ধাঙ্গের কথা ছেড়ে দিন, সর্বাঙ্গ বিলিয়ে দিয়েও জমার ঘরে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবেন।

আপনার গায়ের জামাকাপড় থাকুক কিংবা না থাকুক, স্ত্রীর দৈনন্দিন অঙ্গসজ্জা চাই-ই। এতে আপনি আপত্তি করলে হিন্দু ম্যারেজ কোডের সংশোধনী খড়্গ এসে আপনার ঘাড়ে পড়বে। অথচ আপনি তাকে এ'কথা বোঝাতে পারবেন না যে বাজারে আপনার অনেক দেনা হয়ে গেছে। আপনি পাওনাদারদের উৎপাতে ঘর থেকে বেরুতে না পারেন, আপনার স্ত্রী তা-ই চায়। কারণ আপনি ঘরে থাকলে আপনার ঘাড়ে ছেলেমেয়েদের চাপিয়ে দিয়ে তিনি দিব্যি বেড়িয়ে আসতে পারেন।

আরও হরেক রকমের দাপটের সম্মুখীন হচ্ছেন আপনি। যেমন—রাস্তায় বেরোতে যান, মেয়েদের দাপট। তীর্থ করতে যান, পাণ্ডাদের দাপট। ঘুমোতে যান, মশা আর ছারপোকার দাপট। ট্রেনে বাসে চড়ুন, পকেটমারের দাপট। খেতে বসুন, মাছির দাপট। শেষেরটি অবশ্য আপনাকে সহ্য করতেই হয়। পৃথিবীতে মাছি না থাকুক তা আপনি চান না। কারণ, মাছি আছে বলেই মাছিমারা কেরাণীর চাকুরী। অন্যথায় স্বর্ণশিল্পীদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হত।

আজকাল বাজারে জিনিস কিনতে যান, সর্বাগ্রে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে ভেজালের দিকে। ভেজাল আর তার ছোটভাই জালে মিলে আপনাকে নাজেহাল করে ছেড়েছে। আপনি যে নিশ্চিন্তে আত্মহত্যা করবেন তারও জো নেই। অথচ নিশ্চিন্তে বাঁচতেও পারবেন না। এই যে ভেজালের দাপটে ত্রিশঙ্কুর মতো বেঁচে থাকা, তা সীমান্তে চীনা দাপটের চেয়েও ভয়াবহ।

আমার পাশের বাড়ির বিড়ালটার দাপট দেখলে আপনি হতবাক হবেন। ভদ্রলোকের চুক্তিভঙ্গ করার পর মাছের দাম যখন গ্যাসভর্তি বেলুনের মতো উপরের দিকে উঠতে থাকে, তখনকার কেনা আমার একটি ইলিশমাছে ভাগ বসিয়েছিল। পনেরো দিন ডাল আর পোস্ত খেয়ে প্রাণটা যখন আমার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব করেছিল—তখন ইলিশ মাছটি না কিনে

পারছিলাম না। অথচ বিড়াল মামা ভাগনের এই দূরঅবস্থার কথা কিছুতেই বুঝতে চাইল না। আমি ভাবছিলাম এ ব্যাপারটা তার মালিকের কাছে নালিশ করি। পরে ভাবলাম—নালিশ করে কিছুই কাজ হবে না। আবার তার মালিকের দাপটের সম্মুখীন হতে হবে। যা একেবারেই অসহনীয়। এ পাড়ার কাউকেই তিনি কেয়ার করে কথা বলেন না। হালে কালোবাজারি করে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছের মতো ফেঁপে উঠেছেন। তারপরই তাঁর দরিদ্র নিধন অভিযান আরম্ভ হয়। তিনি যেখানে একখণ্ড জায়গা কিনতে পেরেছেন, রোগজীবাণুর মতো এর চারিদিকে তাঁর মালিকানা ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁকে রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ তাঁর ভাষায় আইনের পাশে যে অদৃশ্য ছেঁদা রয়েছে, ধনী হওয়ার সাথে সাথে তিনি তার সন্ধান পেয়েছেন।

তাহলে কি তিনি দানধর্ম করেন নি? করেছেন। কালীবাড়ির পাঁঠাবলির কাঠগড়া ও তার চারপাশটা মজবুত করে বাঁধাই করে দিয়েছেন। অষ্টগ্রহের সম্মিলিত দৃষ্টি থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য তিনি অহর্নিশি সংকীর্তনের আয়োজন করেছেন। ভোটের সময় মাইক ফাটিয়ে জনগণকে পরিত্রাণ মন্ত্র দিয়েছেন।

সবচেয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য দান হল—একটি ষাঁড়। এই অসার সংসারে ষাঁড়ের গুঁতো ছাড়া পরিত্রাণ নেই—এই কথা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই আজ আমরা তার মহান উপলব্ধি দ্বারা প্রাপ্ত মহাদেবটির মহাশাসনের সম্মুখীন হয়েছি। পাড়াতে শাকসব্জি ফলাবার উপায় নেই। উপায় নেই বাজারে তরকারি ফলমূল নিয়ে বসার। আয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের সঙ্গীনের চেয়েও এর গুঁতো মারাত্মক।

আপনি শুধু গুঁতো খেতেই এসেছেন। গুঁতো দিতে পারবেন না। শতেক ধর্মপ্রাণ মুখ এসে আপনাকে বাধা দেবে। তার উপরে রয়েছে পাপের ভয়। পাপে বাপকেও ছাড়ে না। এ পাপে নাকি বাবার বাবা ঠাকুরদাকে নিয়ে টানাটানি করে।

এদিকে সীমান্তে চীন আর তার নয়াদোস্ত পাকিস্তানের দাপট। দেশের অভ্যন্তরে চোর আর মুনাফাখোরদের দাপট। মুনাফাখোরদের দাপটে টিঁকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অ্যাটমের রিঅ্যাকশনের মতো আপনাকে ধীরে ধীরে যমালয়ের সিঁড়ি ভাঙতে সাহায্য করছে। অথচ আপনার কিছু বলার নেই। কেন নেই তা আপনিই জানেন। আপনার পেটের সর্বজ্বালাসহ বটিকা এখনও তার কাজ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে।

সে যুগে যুধিষ্ঠির তাঁর প্রিয় কুকুরকে নিয়ে স্বর্গযাত্রা করেছিলেন। এ যুগে অবশ্য রাশিয়ানরা তা হাতেনাতে প্রমাণ করে দিয়েছে। আমাদের দেশের পশ্চিমবঙ্গ সরকার নরকযাত্রীদের বাছাই করার জন্য কুকুর 'লাকি'কে নিয়োগ করেছেন। অথচ আমরা সেই কুকুর জাতকেই অযথা বা সামান্য অন্যায়ে মুগুর পেটা করি।

প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমরা যেমন অনেক ক্ষেত্রে বিলাতি লোককে ঘৃণা করি। আবার অন্যদিকে দেশী কুকুরকে ঘৃণা করে বিলাতি কুকুরকে ভালোবাসি। এই যে ভালোবাসার অন্তর্দ্বন্দ্ব তা প্রকট হয়ে উঠেছে আমাদের পাড়ার রাণী সাহেবার (পাড়ার ফচকে ছেলেদের

দেওয়া নাম) মাঝে। তাঁকে তাঁর দেশী স্বামী ছাড়া রাস্তায় বেড়াতে দেখবেন কিন্তু বিলেতি কুকুর ছাড়া নয়। এই কুকুর কয়টির দাপটে রাণীসাহেবার বাড়িতে নিশ্চিন্তে কেউ ঢুকতে পারে না। ভিখারিরা গেট থেকেই বিদায় নিতে হয়। পাড়ার ছেলেরা পূজা-পার্বণে রাণীসাহেবার কাছে গিয়ে চাঁদার আব্দার করবে তারও জো নেই। এ জন্য অবশ্য রাণীসাহেবার অনেক টাকা বেঁচে যায়। এ দিয়ে তিনি তার টি-পার্টির বাজেট বাড়াতে পারেন।

এখন কথা হচ্ছে, এই যে আমরা নানারকম দাপটের সম্মুখীন হচ্ছি তা কেন? 'কেন' কথাটার উপর জোর দিতে গিয়ে আমি নিজেই দমহীন ঘড়ির মতো নিশ্চল হয়ে পড়ি। কাজেই আসুন, আমরা ঢাকঢোল পিটিয়ে দাপটকে স্বাগত জানাই। দাপট বন্ধ হলে যে আমাদের দেহের রক্ত চলাচলের ছন্দপতন হবে।

।। কবিতায় গদ্য ।।

পূর্ণেন্দু বিকাশ চক্রবর্তী

আজকাল দেখা যায় যে চারদিকে কেবল গদ্য লেখার হিড়িক চলেছে। খণ্ডকবিতা, গীতি-কবিতা, কাহিনীগাথা সব কিছুই এখন গদ্যের বাহনে চড়ে চলতে শুরু করেছে। অথচ পৃথিবীতে প্রথম কিন্তু সাহিত্যের সব কয়টি শাখা তো বটেই, এমনকি দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞানও প্রকাশিত হত পদ্যের মাধ্যমে। বাল্মীকি, হোমার, রবীন্দ্রনাথ—যাঁরা সাহিত্যের সভায় সবচেয়ে বেশী সম্মান পেয়েছেন, তাঁরা পদ্য লিখেই পেয়েছেন। আর এখন সাহিত্যের সব শাখাতে গদ্যের প্রাধান্য পেয়েছেই, আবার 'কবিতা' শাখাও গদ্য দিয়ে চালানো শুরু হয়েছে। তাই রক্ষণশীলদের অহরহ চিন্তার উদ্রেক হচ্ছে—কপাল কুঁচকে যাচ্ছে, 'এসব হল কি? ছন্দময় কাব্যই যদি না থাকবে তবে পৃথিবী যে মনুষ্যবাসের উপযোগিতা হারিয়ে ফেলবে! এখনকার কবিরা কি সুন্দরের জ্ঞানেও বঞ্চিত?'

কিন্তু আসলে কবিদের দোষ দিলে চলবে কেন? তাদের তো করবার কিছু নেই। সাহিত্যের বা কাব্যের বিষয়বস্তু বাস্তবকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। আর হলেও সেটা সাময়িক ভাবে পাঠকমনে দাগ কাটতে পারে। কিন্তু পরমুহূর্তে পাঠক যখন কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হবে তখন আর সেই সুন্দর সুশোভন রূপবর্ণনা বা ছন্দমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ 'সালংকার-ঝংকৃত' কাব্যের রেশ কোথায় মিলিয়ে যায় তার হদিশ মেলা শক্ত। সেইজন্যে আজ 'শুভ্রজ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্, ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম্'-এর পরিবর্তে কবিকে লিখতে হয়, 'পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'।

সারা পৃথিবী আজ অর্থনৈতিক অভাব-অনটনের জন্যে সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কবলে পড়ে সুন্দরকে হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। 'যে খেতে পায় না, যার অন্তর কেবল 'হা-অন্ন, হা-অন্ন' করে মাথা কুটছে, সে কাজেকাজেই পূর্ণিমার চাঁদ দেখে আনন্দ করতে পারে না। তৃষ্ণার্তের কাছে একগ্লাস জলের দাম যেমন মহামূল্য মণির চেয়ে অনেক বেশী, তেমনি করে ক্ষুধার্তের কাছে 'শুভ্র চন্দ্রমা'র চেয়ে একটুকরো ঝলসানো রুটির কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাই সে চাঁদকে রুটির সঙ্গে তুলনা করতে পারে। শিশুর মতো রূপকথার রথে করে কল্পনার সুদুর পারে অপরূপা সুন্দরী পরীর দেশে যাওয়া তখনি সম্ভব, যখন শিশুর মতো নিশ্চিন্ত থাকা যায়। তাই আজকাল কবিরা ছন্দকে কবিতা থেকে বাদ দিতে বাধ্য।

মানুষের সৌন্দর্য্যানুভূতির আকর হল তার মন। কিন্তু সেই মন বর্তমান যুগের কৃত্রিমতা, স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতার অত্যাচারে একেবারে মরে গেছে। যে জগতে মানুষ মানুষকে

হিংসা করে, ভাই ভাইকে কাটে, ছেলে দেখতে চায় পিতৃরক্ত, সারাদিনের উপোসী ঘুমন্ত ছেলেকে মা বলতে পারে, 'হ্যাঁরে, তুই উঠলি না, আমি খেয়ে নিচ্ছি পরে ভাত না থাকলে কিন্তু কাঁদবি'। যেখানে মাতৃস্নেহ নেই, কর্তব্য নেই, দায়িত্ব নেই। সেখানে সরলতা পবিত্রতা বা সুন্দরতা থাকবে কি করে? তাই আধুনিক কবি বলেন, 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়।'

কবিরা আজ কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয়েছেন তবু কবিতা, লেখার সহজাত প্রবৃত্তি তাদের রয়েছে। কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় সুললিত ছন্দ বার হয় না—এবং যা হয় তা আবার ঠিক গদ্যও নয়—দুয়ের মাঝামাঝি হয় একটা কাব্যিক ছাঁচে গদ্য রচনা। তাই তারা লেখেন গদ্যকবিতা। অবশ্য এর পিছনে আরও একটা কারণের কথা আমি আগেই বলেছি যে সাধারণ পাঠকের মনের সুন্দর জ্ঞানের অবলুপ্তি। কবিকে সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়।

এরপর যে কারণটা আমি বলব সেটা হল এই যে, যান্ত্রিক যুগে আমাদের সময়ের বড় টানাটানি। তাই গদ্যের ছন্দ এবং অলংকারের ভিতর থেকে আসল বিষয়বস্তুকে টেনে বার করতে আমাদের অনেক সময়ের দরকার। আবার গদ্যের সুবিস্তৃত বর্ণনা পডবারও সময়ের অভাব। তাই কবিরা করেন কি—একটা Oriental পদ্ধতিতে স্বল্পপরিসর গদ্যকবিতা লিখে বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। কিছুদিন আগে প্রকাশিত নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'আগুনের আয়নায়' কবিতাটি থেকে বোঝা যায় কত ছোট্ট কবে ১৯৬২ সালের একটা যুদ্ধের ইতিহাস তথা দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরা হয়েছে। এরকম অনেক কবিতা আছে যেগুলির দশ, বারো বা কুড়ি লাইন। অথচ তাতে রয়েছে একটি মহাকাব্য বা একটি বিরাট উপন্যাসের বিষয়বস্তু। কর্মব্যস্ত লোকের মন জয় করা ও তাকে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী করতে হলে এছাড়া কঃ পন্থা?

গদ্যকবিতা লেখার কারণ হিসাবে আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আজ আমরা কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ হয়ে পড়েছি। প্রকৃতির আসল রূপটাকে আমরা আর দেখি না। আমাদের সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির বুকে মুখে ঠোটে রুজ-লিপস্টিকের প্রলেপ পড়েছে। ফলে যখনই আমার মনে হবে যে সোনালী সকালে ফুরফুরে হাওয়ায় নীল আকাশের তলে মুক্ত প্রান্তরে কচি ঘাস মাড়িয়ে একটু বেড়িয়ে আসি—মনে একটু তৃপ্তি পাব, ঠিক তখনই বেরুতে গিয়ে দেখব কলকারখানার ধোঁয়া ও গন্ধে ভরপুর হাওয়া ইঁটের কট্‌কটে সাদা পাঁচিলগুলোতে বাধা পেয়ে দুমড়েপড়ছে আর খোয়া-ওঠা রাস্তার ইট সুরকিগুলি দাঁত বের করে তাতে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। তখন কি আমার মনে হবে, 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভুলায় রে' ...?

তাই রক্ষণশীল কবি, পাঠক এবং সমালোচক যারা কবিতায় গদ্য দেখে চোখের ঘুম হারিয়ে ফেলেছেন—তাদের প্রতি অনুরোধ যে নিজের সুখনিদ্রাকে নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। সমাজ ও সভ্যতা বর্তমান গতিতে যতদিন চলবে 'গদ্যকবিতা'র উন্নতিই হবে। উপন্যাস লেখা বন্ধ হতে পারে, কিন্তু গদ্যকবিতা লেখা বন্ধ হবে না।

— X —

শারদীয়

কবিতা সংকলন

১৩৭৩

সংকলন :

তৃতীয়

সম্পাদক :

পীযূষ রাউত

সহকারী সম্পাদক :

মানিক চক্রবর্তী

প্রদীপ বিকাশ রায়

এ সংখ্যায় লিখেছেন

- শক্তি চট্টোপাধ্যায়
- নচিকেতা ভরদ্বাজ
- সুবন্ধু ভট্টাচার্য
- শিবশম্ভু পাল
- প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
- অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়
- শিশির সামন্ত
- দীপংকর চক্রবর্তী
- শঙ্কর চক্রবর্তী
- তাপস গুপ্ত
- দীপেন রায়
- ভক্তিপদ ব্রহ্মচারী
- কল্যাণব্রত চক্রবর্তী
- মণীন্দ্র রায়
- শীতাংশু পাল
- স্বপন সেনগুপ্ত
- নীরেন্দু কুমার হাজরা
- কালীকৃষ্ণ চৌধুরী
- প্রদীপ বিকাশ রায়
- তাপস শীল
- বিমল দেব
- সুধীরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী
- পরেশ দত্ত
- মানিক চক্রবর্তী
- পীযূষ রাউত

শারদীয়
কবিতা সংকলন
১৩৭৩

সংকলনঃ

তৃতীয়

সম্পাদকঃ

পীযূষ রাউত

সহকারী-সম্পাদকঃ

মানিক চক্রবর্তী
প্রদীপ বিকাশ রায়

এ সংখ্যায় লিখেছেন

- শক্তি চট্টোপাধ্যায়
- নচিকেতা ভরদ্বাজ
- সুবন্ধু ভট্টাচার্য
- শিবশম্ভু পাল
- প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়
- অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়
- শিশির সামন্ত
- দীপংকর চক্রবর্তী
- শঙ্কর চক্রবর্তী
- তাপস গুপ্ত
- দীপেন রায়
- শক্তিপদ ব্রহ্মচারী
- কল্যাণব্রত চক্রবর্তী
- মণীন্দ্র রায়
- শীতাংশু পাল
- স্বপন সেনগুপ্ত
- নীরেন্দু কুমার হাজরা
- কালীকুসুম চৌধুরী
- প্রদীপ বিকাশ রায়
- তাপস শীল
- বিমল দেব
- সুধীরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী
- পরেশ দত্ত
- মানিক চক্রবর্তী
- পীযূষ রাউত

নচিকেতা ভরদ্বাজ

মঞ্জুশ্রী মোনালিসা

জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার সে যেন একটি শরীরী ভাষ্য,
সমস্ত বেদনার, কত কত উত্থান-পতনের সূর্য-শিলালিপি :
তার জোছ্‌নার অবয়বে থরথর করে কাঁপছে যেন সমস্ত সভ্যতার
কাহিনী। বুদ্ধের বেদনার মত দুটি অতলান্ত নীলচোখে
কত কান্নার, কত সিদ্ধির সৌরভ,—আকাশের আলোছায়ার
শিল্পরচনা তার বোধিমূলে। বুদ্ধ-খৃষ্ট—কনফুসিয়সের
সমস্ত আত্মজিজ্ঞাসা মৌন হয়ে আছে তার মণিকর্ণিকায়।
নিরঞ্জনা নদীকূলে সুজাতার প্রণামের মত প্রসন্ন দিনগুলি
কাঁপছে কাঁপছে যেন। পাতায় পাতায় নীল নক্ষত্রের বর্ণালী।
অথচ রূপ-রঙ-রেখার সমন্বয়ে আশ্চর্য সেই নারী প্রতিমা,
দেহের দীপবর্ণে তার দেবতার ঐশ্বর্য, চিবুকে ঠোঁটে রূপকথা,
দুটি হাতে তার উত্তরীয়ে শেষহীন স্বপ্নের স্খলিত পরাগ।

মনে হয় সে যেন ভালোবেসেছে আমাকে, তির্যক করে আকাশে
রহস্যের রিম্‌ঝিম্ এমনি নিরন্ত হয়ে আছে চিরকাল, চিরকাল!
সে ভালোবাসেনা কাউকে। অথচ তার মায়াবী স্নিগ্ধ হাতের
করুণায় কাছে ডেকে নেয় সবাইকে,—আমিও তার অভীপ্সিত।
জীবনের সমস্ত অন্বিষ্ট সাধনার সে যেন রূপময় নির্বাণ,
আশ্চর্য মানুষের সুখ দুঃখ, হাসি কান্নার সমস্ত সংবাদ যেন
সংরাগী চেতনার নির্যাস হয়ে আছে তার ফেন-শুভ্র-অবয়বে।
স্তনে-ঠোঁটে-চুলের পাহাড়ে তার সূর্যের সমুদ্রের মৌসুমী;
তাকে পেলে যেন সব পাওয়া হবে—এমনি এক দূর সৌরভের
কারুকার্য তার পাপড়িতে। শিশুর মতোই চেয়ে থাকি তার দিকে;
যৌবনের আকাঙ্ক্ষা আছড়ে পড়ে তার বেদনার বেলাভূমিতে।
আত্মআবিষ্কারের আনন্দেই যেন তাকে আমার প্রয়োজন,—
যুগে যুগে হাজারো যুবক যেমন পেয়েছে রক্তের নীল সংক্রমণে
নিজেদের নিঃশেষে জ্বেলে দিয়েছে অতল আস্বাদের ঘরে।
তার জোছ্‌নার অবয়বে আমার রূপালী কান্না ঝিকমিক করে
সৃষ্টির সরোবরে একটি পদ্মের মতোই টলোমলো করছে মেয়েটি
সেই অবাক মেয়েটি, রূপমন্থর হয়ে আছে আমার দৃষ্টির
বিভাসে।

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

একজন প্রত্যাখ্যাত প্রেমিককে

সেইতো ফিরে আসতে হল অন্ধকার ঘরে।
দুয়ারে খিল, জানলা দুটি বন্ধ করে যদি
আড়াল করা যায় নিজেকে লোকচক্ষু থেকে;
অন্ধকারে মনের চোখ দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে।

বৃথাই হাত বাড়িয়েছিলি, অবিমৃষ্যকারী।
আগুনে হাত পোড়েনি শুধু, অপমানের দাহ
শিরায় শিরায় ছড়িয়ে গেল, অশেষ অনুতাপে
এখন তোকে অহর্নিশ দগ্ধ হতে হবে।

চোখ বুজলে দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হবে
ভাবিস যদি, তাহলে ভুল করবি, অগোচরে
শিলাস্তূপে ঘটে গেছে ভীষণ বিস্ফোরণ,
স্রোতস্বিনী বয়ে যাচ্ছে নাতিশীর্ণ বেগে।

ভালোবাসার আরেক নাম কঠিন যন্ত্রণা;
শোকের থেকে জন্ম নেবে করুণ পদাবলী;
পৌষ ফাগুনের স্মৃতিগুলি চলচ্চিত্র যেন,
মনে পড়বে, আঁকড়ে তাই, বাঁচবি স্মৃতিচারী।

স্বপন সেনগুপ্ত

ভিয়েত্‌নামের উদ্দেশ্যে একটি কবিতা

ভিয়েত্‌নামের যুদ্ধে যাদের ঘরের আলো,
ক্ষেতের ফসল, মনের গভীরে নদী দাঁড়ায়েছে
অকস্মাৎ থেমে, যে শিশু আঁতুড়ঘরে
এইমাত্র জন্ম নিলো রক্তনীল বীরের শপথে;
বৃদ্ধাজননীর কপোলের ভাঁজে ভাঁজে
চুপ্‌সে যাওয়া নির্দয় সূর্যের জ্যোতি যে পথে
হারিয়ে গেল, সে পথে ছড়িয়ে দিলেম
আমার বুকের প্রেম, নিভৃত ভালোবাসা।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কাছে থেকে দূরে

কাঁটাতার, রাঙচিতা ঘিরে রাখে একটুকরো জমি
পশ্চিমে ইটের বাড়ি, স্টেশনই, আমার মনে হয়,
আবছায়া মুখ তার, কিছুতেই মুখ নয়—মমি
এখন সম্পূর্ণ হলো, কোনোমতে, যাবার সময়।

যেতে, চিরকাল কেন বিদায়ের হাওয়া লাগে মুখে?
আমরা গিয়েছি অল্প, তবু প্রতিবারই সুখত্রাস
অনুভব করে গেছি, স্মৃতি যেন স্বতঃই চিবুকে
আঙুল ছোঁয়ায়, বলে—'এসো কিন্তু, বাদরে রাজহাঁস

ছেড়ে যাচ্ছো—মনে রেখো, মাঝেমাঝে তার কথা ভেবো,
রাঁচীতে নির্জন সস্তা? সস্তা পাবে হেসাডি বা টেবো—'

এভাবে পথের সীমা পরোক্ষেই বেঁধে দিলে নাকি,
বালুচরে ঢেলে দিলে ঝর্ণার নির্মল জলধারা
আঙুলে দিবস গুণছো নাকি তুমি আঁধারে জোনাকি
কাছে থেকে দূরে গিয়ে দেখি চাঁদে তোমারই পাহারা!

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

মৃত্যুর বানানে কিছু ভুলভ্রান্তি

আজ বেলা বারোটার আগে নিষ্প্রভ শহর থেকে
যার মৃতদেহ কাঁধে করে তুলে আনা হল তাঁর নাম
স্বর্গীয় মৃগাঙ্ক সেন। আমার আবাল্যবন্ধু,
ব্যাঙ্কের চাকুরী থেকে এলিয়ট হয়ে ফেরা, কিছু রক্ত,
প্রেম, শিল্প ছাদের ওপর থেকে ছুঁড়ে দিয়ে সন্নিহিত
অক্টোবরে ঘর্মাক্ত দোলক-ঘড়ি বুকে নিয়ে ধাবমান
মেলট্রেনে অকস্মাৎ তীব্র হয়ে ঢুকে পড়া—
এরকমতরো আশা, উত্তেজনা, স্মৃতি ইদানিং
দূর বা নিকট কোন অন্তরালে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে।

অথচ, গতকাল সন্ধেবেলা, শিরোনামহীন তাঁর
মৃত্যুর খবর প্রথমত: আমার টেবিলে এসেছিল।
কোন মূঢ় মুদ্রাকর মৃগাঙ্কের নামের বানানে শূন্যতায়
ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। বাঁদিকে দু' 'এম' স্পেস্
অনাবশ্যক—কেননা মৃত্যুর কথা চারদিকে মোটারুল
টেনে আরও কিছুদূর ঢেকে দিতে হয়।
আশ্চর্য কি করে শুধু মনে হল গতকাল সমগ্র
সমগ্র রাত মৃগাঙ্ক আমারই ঘরে শুয়েছিল।

এ সমস্ত মনে হওয়া কত ভুল! আসলে মৃগাঙ্ক
অশোক কিংবা সুধাকান্ত কেউ নয়—একান্ত নির্জনে
আমি ক্ষীণ এক বাংলা অভিধান মাথায় বালিশ
করে সারারাত মেঝের উপর কাটিয়েছি।

আর ঠিক সে সময়ে (কি জানি দেখেছ কিনা হে ঈশ্বর) এই প্রিয় নামের বানান
দূরতর নগরের অন্ধকার প্রুফশীটে
শূন্যতায় ঢেকে গিয়েছিল।

মণীন্দ্র রায়

পাহাড়পুরে ঃ ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে

এই আঠারোমুড়ার পাহাড পেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছি আমি।
চড়াই উৎরাই নির্জন পাহাড়ে বাঁকানো পথের পাশেই গভীব গহ্বর;
ঢলে পড়া সূর্য্যের আলোতে ঝিঁঝিঁ-র ডাক আর বনফুলের উগ্রগন্ধে
মাতাল মৌমাছির মতোই আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম।
এখন খোয়াইয়ের তীরে এসে জাফরি-কাটা এই রাতের অন্ধকারে
হিমের দৌরাত্ম্য দেখে জোনাকির আলোও বুঝি প্রচণ্ড শীতল,
তথাপি রক্তের উষ্ণতা বুঝে হাঁটু আর দাঁতের ঠক্‌ঠকানিতে
ভোরের প্রথমরোদে চা'য়ের পেয়ালা হাতে বোন বেখাকে পেলাম।
এবার বনকুমারীর পাহাড় পেরিয়ে প্রাচীন রাজবাড়িটাতে যাবো আমি।
ফাল্গুনেই যাবো; রাজকন্যার স্বপ্নচোখে রাজকুমার আসছে কি-না,
হাওয়াইর মতো পঙ্খী ঘোড়ায় তুবড়ি ছেড়ে গ্যাসবাতি আর ফুলঝুরি
হৃদয় জুড়ে পাহাড়পুরে খুশীর মালা গাঁথছে কিনা দেখতে যাবো।

শিবশম্ভু পাল

বর্ষামঙ্গল

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। অন্ধকার উৎস হতে
প্রেম ঘৃণা ক্ষুধার নিভৃত
শিল্পীদল গান গাইছে নেপথ্যে মেঘের তানপুরা
বেজে চলে। বৃষ্টি পড়ে : সব দৃশ্য ঝাপসা হয়ে
ক্রমে ক্রমে শেষে
শূন্যতায় অবসিত হয়,
আকাশের মতো শূন্য যেখানে মেঘের আয়োজন
সমাচ্ছন্ন কালিমায় আকুলতা ছাড়া কিছু নেই।
কেউ নেই কথা বলব, বন্ধুরা স্বর্গের খোঁজে গ্রন্থচারী
হয়তো বা কেউ
দুর্গাপুরে আটকে গেছে অমোঘ চুম্বকে।
বৃষ্টি পড়ছে একটানা, ওদিকে আকাশ খাঁ-খাঁ করে
এদিকে হৃদয়ও দেখি পড়ে আছে শূন্যশাদা
বিধবার সিঁথির মতন।

দীপেন রায়

কবিতার চারিদিকে

তোমার বাড়ির সামনে তোমাকে দেখিনা।
তুমি আমাকে দেখো না। আমাদের চারিদিকে
অদৃশ্য ঘুঙুর নির্ভুল বেজে ওঠে। জলের প্রপাত,
ঝর্ণা, হস্তচ্যুত ঈশ্বরীয় কমণ্ডলু; নির্ভুল ঘুঙুর
শুধু জলেরই কলতান। তুমি বাড়ির বাগানে
ঘনীভূত দেবদারু দাঁড়িয়ে রয়েছো
আমি দেখিনা। জল চাই বলে
অনস্তিত্ব ঘুরে আসি। আমাদের চারিদিকে
পদশব্দ থামেনা কখনো। তুমি বা আমি
আমাদের বন্ধুরা সবাই একটি
অবিষ্ট রচনা আত্মমুখী কবিতার। তোমার
হাতের মধ্যে পোড়োবাড়ির ছন্দহীন নির্জনতা
অন্ধকারে একাকী তালগাছ।
তুমি আমাকে দেখো না।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

গোত্রহীন কবিতাগুচ্ছ

১.

মুখ দেখিনা বুকের ভেতর কেবলি পাখা নড়ে
বাসনাহীন বৈশাখের ঝড়ে।
আসলে নেই নিমন্ত্রণও, তাই কি তুমি নিজে
মুখ পুড়েছ, বুক পুড়েছ, প্রেম রেখেছ ফ্রীজে।
অধুনা কোন বৈরাগীর মাঠে
হৃদয় খুলে বসেছি অকপটে
দৃশ্যপটে ভাসেনা কিছু প্রণত আভূমি
মুখ দেখিনা, বুকের ভেতর কেবলি জাগো তুমি।

২.

মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রাখো তুমি
অথচ গভীর দুঃখে আন্দোলিত শান্ত বনভূমি।
হৃদয়ের মতো যাহা চড়া দামে বিকোবে সদরে
নাবালক পাতার মর্মরে
তাকেও ডোবাতে চাও; তুমি ট্রাষ্টি, উত্তরে দক্ষিণে
অধস্তন পুরুষেরা আকণ্ঠ ডুবিয়া গেছে ঋণে।
পলায়ন ভাল ছিল, শেষ অস্ত্র তুরুপের তাস
সশব্দে পতন হলে আহত আসন্ন সর্বনাশ
ঘরে ফিরে যাবে বলে বেদনা সংহত
মিত্যা স্তোকবাক্য দিয়ে আমাকে ভোলাবে বলো কত!

৩.

তখন এসে প্রগল্‌ভতায় হঠাৎ বলেছিলে
এইতো আমার বাড়ি
আবিশ্বে সে সংঘটিত সবুজ সমারোহে
হেসে উঠলে নারী।
চতুর্দিকে চোখ ফেরালাম, চতুর্দিকে তুমি
এবং পরস্পর
বুকের নীচে আগুন, তুমি আঁকড়ে ধরে আছো
তোমার ঈশ্বর।

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

অসময়ে

তুমি বলেছিলে দেখা হতে পারে
বিকালের লোকালয়ে,
আকাশ কাঁপানো কতিপয়
কুসুমিত দাবীর অঙ্গীকারে।

না হয় বিশ্বাসে কিছু
রক্তের দাগ আছে
তথাপি তো প্রিয় পারিনি কাঁদিতে
বেআব্রু জন্মের অধিকারে।

মাঘের বিকালে, যদি কদাপি
ফাগুনের হাওয়া বয়
কী করিবে প্রিয়, অপ্রত্যাশিত
নাগরিক ঘরে থাকা
তবে বিহঙ্গ এবারের মতো
বন্ধ করোনা পাখা।

প্রদীপ বিকাশ রায়

আলোর অধিক

ওরা আমাকে আঙুল দিয়ে দেখালে—
'ঐ দেখ আকাশে চাঁদ'। আমি চাঁদ দেখলুম না।
বরং তাদের আঙুলের দিকে না দেখে আমি বুড়ো আঙুল
দেখালুম। এবং চাঁদের দিকে না চেয়ে উত্তর আকাশে
মেঘরাজের সাজ দেখলুম। কেননা আপাত আলোয়
আকর্ষণের চাইতে শাশ্বত আঁধারের সত্যতায় আমি
অধিক বিশ্বাসী।

যাত্রাগান দেখতে গিয়ে ওরা আমাকে
মঞ্চের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে—'ঐ দেখ লক্ষ্মণ
একটা সোনার হরিণ ধরতে যাচ্ছে।' মঞ্চের দিকে
না চেয়ে আমি বরং সাজঘরের দিকে তাকালুম, কখন
রাবণ এসে সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখাবে।

দীপংকর চক্রবর্তী

প্রতিবিম্বে মুখ দেখছে

প্রতিবিম্বে কোন্ মুখ দেখতে পাচ্ছো দুলাল মিস্তির?
বাহারে কল্পনা ছিল, অভিনয় একান্ত-জীবন
চালচিত্রে মূর্তি আঁকা, বামে ডাইনে সখীরা প্রচুর
রুচি, তৃপ্তি সুখ দুঃখ ছিল কতো কাঁপানো রাত্তির
জীবন দর্পণে দেখছো এইখনে কোন্ মুখ দুলাল মিস্তিব?

নারী মদ স্মৃতি দুঃখ সমস্তই একান্ত আত্মীয়
বাসনা অতৃপ্তি সুখ সবই বুঝি প্রেমিকের মোহ।
মুচড়িয়ে ওঠে প্রাণ, কয়েকটি বাদুড় ঝোলে আকাশে যদিও
পৃথিবীটা চোখে দুলছে, ঝলসায় মনে তার শতেকের জ্বালা
কেন সে বিধ্বস্ত হলো, পাহাড় পর্বত যতো নদী মাঠ বন
দুলাল মিস্তির ঘুরছে পথে পথে, রক্তাক্ত দর্পণ।

মাঝে মাঝে অন্ধকারে মুখটি দ্যাখে দুলাল মিস্তির
নারী মদ সিগারেট আড্ডা নিয়ে কাটায় সময়
মাঝে মাঝে অন্ধকারে নিবিড় নির্জনে রচে ক্ষয়িত বলয়
রুচি তৃপ্তি সুখ দুঃখ প্রেমে আঁকা প্রভূত চিত্তির
জীবন শিহরে দ্যাখে, চমকায়, দর্পণেতে দুলাল মিস্তির।

... এখন কোথায় যাবে? কোন্ পথ? সম্মুখেতে পথের জটলা;
রাত্রে যেথা অন্ধকার হাত মেলে ভোরে জ্বলে উজ্জ্বল সকাল,
তুমি কোন্ পথে যাবে?
দর্পণেতে অন্ধকার, কোন্ পথে যাবে?
জীবনেরা ভেঙে যাচ্ছে সহস্র শাখায়
কোন্ পথে যাবে?

প্রতিবিম্বে মুখ দেখে কি লাভ তুমিই বলো দুলাল মিস্তির
সন্ধ্যা হয়, রাত্রি বাড়ে, আকাশেতে আলোর চিত্তির।

অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়

হঠাৎ কখন

হঠাৎ কখন শিউলি সকাল উধাও হল বেগে
আলোয় জ্বলে উঠছে দুয়ার, স্মৃতি।
শ্রাবণ রাতের বৃষ্টিঝরা অভিজ্ঞতায় লেগে
দৃশ্যপট ছড়ায় বিস্মৃতি।
নিয়ম মাফিক এ-ঘর থেকে ও-ঘর দিয়ে যাওয়া
দু'হাত দিয়ে দৃষ্টি ঢেকে রেখে;
গতানুগতিক অসুস্থতার, কোন সুযোগের হাওয়া
করছে চুরি, পর্দা তুলে ডেকে।
দু'দিক খোলা বক্ষপটের বিশাল ফাঁকা মাঠে
আমায় দেখে আজকে কেন সবার মাথা নীচু?
গতানুগতির অসুস্থতায় সমস্ত দিন কাটে—
হঠাৎ কখন শিউলি বেলায় থাকবে না আর কিছু।

মানিক চক্রবর্তী

শব সহবাস

সেদিন আমার বন্ধু মৃত্যুঞ্জয় একটা বিচিত্র স্বপ্নে দেখেছিল :
সে তার এক বন্ধুর পাশে শুয়ে আছে। কী আশ্চর্য!
স্বপ্নে ঘুমভেঙে সে দেখল পাশে শুয়ে থেকেই বন্ধুটা
ওর মারা গেছে ঠাণ্ডা শবদেহটা অনায়াসে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে।
হিম হিম কান পেতে সে শুনতে পেল আশেপাশে ওরা
বলাবলি করছে : মৃতদেহ নিয়ে শুয়ে থেকে মৃত্যুঞ্জয়ের
দেহটাও নাকি শব হয়ে প্রতীক্ষা করছে শ্মশানযাত্রার।
মালকোঁচা দিয়ে ওরা আসছে, বন্ধুর দেহের সাথে মৃত্যুঞ্জয়ের
দেহটারও শ্মশানের কাজ শেষ করে শবসভার সদস্য বাড়াতে।
আর কী বিচিত্র! অমনি ভয় পেয়ে মৃত্যুঞ্জয় ওর রোগা দেহেও
পলাতক হরিণের মতো ছুটছিল ... ছুটছিল ...।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে দিয়ে ক্ষুধার্ত বাসনারা চিমটি কেটে দেখালো
স্বপ্নটা স্বপ্ন নয়। অনেকটা সত্যি ঘটনা। কারণ ইতিমধ্যে
সে প্রায় শবসভার সদস্য পদপ্রার্থী হয়ে আছে।

কালীকুসুম চৌধুরী

চিতার আগুনে কবিতা

রেশনের দোকান ... ...

সারি দেওয়া
অনেকগুলো নীরক্ত মানুষের
অনেক পেছনে দাঁড়িয়ে,
পীযূষ, দেখছিলাম,
হ্যাঁ ভাই, অসহায় ভয়ে দেখছিলাম,
কবিতা নামীয় আমার রূপসী মেয়ে
আমার শূন্য চাল-ব্যাগের
সর্বনাশী আগুনে
পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

অজস্র রমণীর স্মৃতি
আমার সমস্ত ক্লান্ত অনুভূতিগুলোকে
ভীষণ নাড়ায় ভিজিয়ে দিয়েছিল
(কান্না আটকাতে পারিনি)।

তারপর একসময় হঠাৎ
সারি দেওয়া আধমরা মানুষের
ভীড় থেকে
দৌড়ে পালিয়ে এসেছিলাম।
নীরব লোকগুলো ক্ষণিক চাঞ্চল্যে
হয়তো বলেছিল। (তাই বলে)
আহা, এ লোকটিও পাগল হল।
আমি কি হয়েছি জানিনে।
তোকে বলি,
আমার হাতের চালের ব্যাগ
এখনো হাতে লেগে আছে।
এই শূন্যব্যাগের সর্বনাশী আগুনে
আমার প্রিয়তমা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

শঙ্কর চক্রবর্তী

নোঙর

মৃত্যুও সুন্দর হয় যদি সেই অসহ্য যন্ত্রণা
সমগ্র সত্তায় জ্বলে অনিঃশেষ বেদনার রঙ
ভালোবাসা নিভে গেলে শেষ হলে নিষ্ঠুর যন্ত্রণা
চিতার আগুনে বাজে পুলকের আশ্চর্য সারং!

মনে হয় এই মৃত্যু, ভালোবাসা, যা পাইনি তার
দু'খানি অঞ্জলি ভরে নিয়ে তবু উপচে পড়ে আলো,
সে মেয়ের দুটো চোখ, সেই মন, হাসির তারার
ফুলগুলি ঝরে গেছে, যাক, তবু সেই স্মৃতি ভালো!

অনুপম আকাশের অনির্দেশ্য উধাও মননে
ক্লান্ত পৃথিবীর ভোর দীর্ণ কোনো তমসার তীর
শরাহত প্রিয়তম পাখিনীর ক্ষুব্ধ শ্লোকস্বর
প্রসন্ন আকাশ নীল আঁকা যেন কান্নার দর্পণে;
পৃথিবীতে প্রেম আসে অশ্রু তার আলোর শরীর—

মাটির হৃদয় বিদ্ধ ক্ষত-মুখ নিষ্ঠুর নোঙর।।

পীযূষ রাউত

জনৈক পলাতকের ডায়েরি থেকে

কারা যেন অদূরের ডাকঘর থেকে আমার
সমস্ত ঠিকানা আক্রোশে ছিঁড়ে ফেলে আমাকে কোনো এক
অপার্থিব দূরতম দ্বীপে নির্ব্বাসিত করতে অধুনা
উৎসুক। তাদের অদৃশ্য অস্তিত্বকে ইদানিং আমি
অনুভূতি দিয়ে বিধৃত করেছি। চেতনাকে দর্পণে নীত
অতঃপর বীতশোকে করেছি মগ্ন আয়ত বৎসর।
স্পষ্টত প্রতীয়মান : রাতের মালগাড়ি করে
অগত্যা প্রান্তীয় স্টেশনে যাচ্ছে আমার পরম শ্রদ্ধেয়
ঈশ্বর এবং প্রিয়তমা রমণীর কথিত প্রণয়।

সফেন অন্ধকারে বিলুপ্তি ঘন হাহাকার
খরস্রোত-শব্দ তোলে অলিন্দে অলিন্দে; চতুষ্পার্শ্বে যেন
ভগ্নতীর সমুদ্রের চরম চীৎকার। ফলত আমি
জেলভাঙা নির্দোষ কয়েদির মতো তোমাদের নাকের
ডগায় বুড়ো আঙুল নাচাতে নাচাতে মেলট্রেনে উঠে
যাবো অকস্মাৎ একা প্রদোষে তখন রক্তাভ রোদ্দুর।
এবং বিশেষ দ্রষ্টব্য : আগামীকাল
প্রভাতী
দৈনিকে প্রকাশিত হবে আমারই বিচিত্র সংবাদ।

শিশির সামন্ত

এখন মৃগয়া নেই

এখন মৃগয়া নেই কিংবা যুদ্ধ জয়,
পূর্ব্বপুরুষেরা যতো রাজপুরুষের দল যেতেন সবুজ
বনে
হলুদ দুঃস্বপ্ন হতে পায়চারি করা যাবে ভেবে।
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে আমি হরিণের গন্ধ পাই মৃত,
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে আমি গন্ধ পাই কাঁচা কোনো
গোবৎসের ত্বক
টান হয়; বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা, শুনি কানে।

রাজা-বাদশা'র মতো শোথ, মেদ রক্ত চাপ,
বহুল উদ্বেগ হতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় হেঁটে চলে
ফিরি,
এ অরণ্যে গাছে গাছে জড়িয়ে শিকড় গেছে তলে,
শাখা-প্রশাখায় বৃক্ষ অবরোধ করে রাখে আলো!

সূর্য্যহারা এই দিবা; দিবাভাগে লোহিত পশ্চিম,
এবং পূর্ব্বের কোণে জমে ওঠে ক্রমেই উদ্বেগ!
মুখশ্রী পৈতৃক দেহ, ব্যক্তিগত বিষয় আশয়,
নখরের দাগে দম্ভ, কবে কোন বাঘিনীর নখে
লেগেছে আঁচড়! এই দর্পণের দৃশ্যে বারবার
মুখ রাখি। অতঃপর দন্ত শৃঙ্গী, মানুষের দল!

নিজের দেহেতে রাখি নিজের কামড়,
নিজের শরীরে তার ক্ষতচিহ্ন নিজের নখরে।

শীতাংশু পাল

ভাসানের গান

একটি ফুলের নামে নাম রেখে আরক্ত
হৃদয়ের রক্তদলগুলি কবিতার অনুরাগে চন্দ্রমার
উচ্ছ্বাস বিলাসে চতুর্দ্দিক জ্যোৎস্নার ছিনালিতে অপরূপ
সুগন্ধ ছড়িয়ে কোন এক অলৌকিক নিষিদ্ধ পর্ব্বতের
উজান অভিমুখে রাঙা ভাঙা রোদে বিস্মৃত হয়েছিল

অনবদ্য পর্যাপ্ত ভাসানে দেখেছি রূপবতী
প্রতিমার লাবণ্যের বর্ণ অঙ্গগুলি একে একে জলে মিশে গেছে!
হৃদয়ের বহুবর্ণ প্রজাপতি উড়ে গেছে বিজন বিদেশে,
লখিন্দর ভেসে গেছে গলিত মান্দাসে, আত্মার অমল
শব্দগুলি অজস্র মুখের ভাষায় একান্ত হাওয়ায় উড়ে গেছে।

নিয়মিত আগ্রহের অঙ্গীকারে শব্দ নিয়ে
প্রেমালাপে খেলেছি নিবিড় খেলা, জলের অক্ষর থেকে
দৃশ্যহীন সময়ের দ্রুত স্রোতে অমলিন কারুকার্য্যে এঁকেছি
অনেক ছবি। উদ্দাম প্রেমিক আমি; অন্ততঃ মৃত্যুকীর্ণ
আঙ্গিনায় রাত্রির অন্ধকার দিনের আলোর বলয়ে সারাক্ষণ
বাহুবন্ধে বেঁধে রেখে কম্পিত লীলায়িত রক্তাভ শরীর
অসংখ্য চুম্বনের সমন্বয়ে বিন্দু বিন্দু সুগন্ধি পাপড়ি দিয়ে
অপরূপ একটি ফুলের নামে রক্তগোলাপ ফোটাই।

সুধীরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী

বাসর ফুরালে

শত্রুর মুখোমুখি সৈনিকের মন নিয়ে দেখো ... ...
দেখো, কত অসহায় তুমি।
অর্থনীতির ফাঁকে ফাঁকে যদি দেখো এবং ভাবো
তবে, তোমার কাল্পনিক দুষ্মন্ত নয়ন
ভিয়েতনামের হারিয়ে যাওয়া সৈনিকদের মতো
মিলিয়ে যাবে মাটির সত্যের কাছে।

তাপস গুপ্ত

সূর্যের অন্তরঙ্গে

সূর্যের অন্তরঙ্গে চলে যেতে হবে। দূরে সোফায় কোন্ মহাজন ব্যবসার
তাঁবু খুলে বসেছে ক্যাম্পখাট ভেঙে ভেঙে নিঃসীম অন্ধকাবে—
পৃথিবীর অনিমেষ বিস্ময়ের সে সময় নেই। যেহেতু আজো
দ্বীপের মতন তার দূরসূক্ষ্ম ধ্রুবতারা সমস্ত অহঙ্কার রশ্মিময় আকাশের মাঝে
ক্ষমাহীন লেগে থাকে অবেলায়।

এখন কিছুই দাঁড়াতে শেখেনি। বাচালতা সমস্ত প্রাঙ্গন জুড়ে
শুধু অসংখ্য হাসির ফুলঝুরি ওড়াচ্ছে। আমি যেদিকে তাকাই গাঢ়তম
কীর্তিবান অন্ধকার শিরিষের আঠার মতন নগ্ন চট্‌চটে হয়ে আছে।

কি করে আমার মনের বিগত বাক্সের নিভৃত জিজ্ঞাসাগুলি
দ্বারের জানালায় নিখুঁত পৌছে দেব, ভাবি। কেননা বালককালে আমার
প্রধানশত্রু একা আর কয়েকজন অন্যে একসঙ্গে ভালোবাসার নাম শুনিয়ে
অমৃতত্ব রক্তবিষ কেমন দিয়েছিল বেশ ভালোভাবে জেনেছি একদিন।
কিংবা মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে কিভাবে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধিয়েছিল তার
পরিচয় আমি পেয়েছি একদিন

এখন সময় নেই কোথাও যাবার। তাই সূর্যের অন্তরঙ্গে—
ঘুমিয়ে পড়তে হবে। বাঁয়ে নয়, ডানে নয়—সোজা স্থির বারান্দার থেকে
ষাটফুট গভীরে—ওপরে নীচুতে—ষাটফুট গভীরে চলে যেতে হবে।

বিমল দেব

ইচ্ছার ঠিকানা খুঁজে

কালাহারির অগ্নিবুক আর
প্রশান্ত মহাসাগরের সূর্যগলা জল পেরিয়ে
অধুনা উপনীত আমি
কোনো উপকূল বন্দরে।
সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের অবশিষ্ট পথে
সম্প্রতি অভিযাত্রী আমি
সুদীপ্ত সূর্যকে পাশাপাশি রেখে।

এখনো আমি চলবো,
সময়ের বহু বিচিত্র পথে
আলো-ভিজা সড়কে, কখনো-বা
ছুঁচো-মরা গলি থেকে বাইলেনে।

আমার কিশোর ইচ্ছা
একদা প্রবাসী হয়েছিল সেখানে
বলতে পারো অমুক এভিন্যুটা
কোন্‌দিকে?
না থাক্, বলতে হবে না,
জেনে নেবো স্ট্রীটগাইড দেখে।

স্ট্রীটগাইড দেখে সেই এভিন্যুর
ফুটপাতে যেতে যেতে
ফুটপাতে যেতে যেতে এখন ভয়ংকর
ব্যস্ত আমি
আমার ইচ্ছার ঠিকানা খুঁজে।

তাপস শীল

১) সবুজ নিখিল

সাপের গতির মতো আঁকাবাঁকা পথ,
ভীষণ মেঘাচ্ছন্ন শরৎকাল; সুকঠিন
একনিষ্ঠ ব্রত এবং সবিনয় মিল,
পাখির ক্রুদ্ধ ঠোঁটে বন্দী আমার সবুজ নিখিল।

২) আহত কুয়াশায়

নির্বাসন আমার অবধারিত (যেহেতু নিরাপত্তা নেই)
বিকল্প ভরসা শুধু নিলীন নিশা;
অর্পিত পরিত্রাণ উপদ্বীপ পাখিদের ডানায়,
সাজঘরে নীহারিকা আহত কুয়াশায়।

৩) আমার বিকৃতি দেখে

আমার মুখের বিকৃতি দেখে তুমি যেওনা সময়,
আমার ক্ষীণতা দেখে তুমি কলঙ্কিত হয়োনা কখনো;
আমি আরম্ভ, প্রথম সুর ও স্বরলিপির
আমি ধ্বনিত, শব্দায়মান মিহির।

নীরেন্দু কুমার হাজরা

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

বৃষ্টি নেই কতদিন! তৃষা-রুখু-মাটি
মেঘেদের আড়ালে ফেরে ফেরারী মৌসুমী
কতদিন হল, হায়—কতদিন হৃদয় দোপাটি
কেঁদে কেঁদে ফিরে যায় ...; কতদিন আর
অনাবাদী এ হৃদয়।

চারিদিকে হাহাকার। তীব্র মরুময়
ফুটিফাটা মাঠ-মাটি, মানব হৃদয়
বৃষ্টি তুমি স্বয়ংবরা
বন্যা হও; মুছে দাও পুঞ্জীভূত জরা
পলিমাটি। প্রাণে নেশা দোপাটি হৃদয়।

বৃষ্টি নামে চারিদিকে। বৃষ্টি অন্বেষা
দিগন্তে দিগন্তে। মোহমত্ত মানুষের
লালজিহ্বা টেনে, ছিঁড়ে সর্বনাশা নেশা।
ফুল ফোটে, পাখি ডাকে, ধু-ধু অনাবাদী মাঠে
অফুরন্ত যে হৃদয়।

বৃষ্টি নামে চারিদিকে। কোথা যেন বৃষ্টি হয়ে যায়
ঘরমুখো পাখি সব সমারোহে খবর ছড়ায়।

পরেশ দত্ত

প্রেম

একঝাঁক নীল পায়রাকে একটা দুষ্টুছেলে
ঢিল ছুঁড়ে উড়িয়ে দিল।
আকাশময় ছড়িয়ে পড়ল অসংখ্য নীলবিন্দু।
অসংখ্য তারারা সূর্যের আলোয়
লুকানো ছিল সেখানে।
সন্ধ্যাতারা প্রথম ঘোমটা খুলে বলল :
এসো, আমরা ভালোবাসি!
পায়রারা ওদের ভালোবাসল।
শুধু একটা পুরুষ ওদের মধ্যে
কাউকেই চাইল না।
আধখানা ভাঙা অষ্টমীর চাঁদকে ঘিরে
সে প্রেমের কুঞ্জবন রচনা করতে চাইল।
চাঁদ ওকে প্রতিশ্রুতি দিল :
আমাদের প্রেম সম্পূর্ণ চক্রাকার একদিন হবেই।
দু'জনার সে প্রেম পূর্ণিমা-চাঁদের গোলকে যে গাছ থাকবে
ওখানে আমরা বাঁধব নীড়,
যেখানে কালোগাভীও থাকবে, আর
সত্যদ্রষ্টা দুধ খেতে বাটিও দেবেন।

জোনাকি কবিতা প্রেমিকদের জন্য জোনাকি কবিতা প্রেমিকদের জন্য জোনাকি

আসুন কবিতার জন্য আমরা ৬০ দশকের কবিরা উন্মাদ হই।

'আধুনিক কাব্য আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর প্রশস্ত করে নিচ্ছে।' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

আমি একা ; চারিদিক বিশ্বাস অনাচারে ডুবে গেছে।' [পাস্তেরনাক]

'কাগজের বুকে বিঁধে কলমের মত নখর।' [প্রেমেন্দ্র মিত্র]

'শুধু কবিতা সম্বল করে বা কবিতার জন্য নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশের দৃষ্টান্ত * * * পৃথিবীর বিখ্যাত ধনী ভাষাগুলিতে খুব বেশী নেই।' * * * কবিদের এই বিপুল সংখ্যার প্রতি দেশের শাসকদল, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী সমাজ সকলেরই মনোযোগ দেওয়া উচিত।' [নীললোহিত]

আসুন কবিতার জন্য আমরা ৬০ দশকের কবিরা উন্মাদ হই।

জোনাকি কবিতা প্রেমিকদের জন্য জোনাকি কবিতা প্রেমিকদের জন্য জোনাকি

জোনাকি

চতুর্থ সংকলন

ফাল্গুন

১৩৭৩

জোনাকি ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র

আনুমানিক প্রকাশকাল :

১ম সংখ্যা : আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ন

২য় সংখ্যা : পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন

৩য় সংখ্যা : চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ

৪র্থ সংখ্যা : আষাঢ় শ্রাবণ, ভাদ্র

সম্পাদক—

পীযূষ রাউত

সহকারী-সম্পাদক—

প্রদীপ বিকাশ রায়

মানিক চক্রবর্তী

প্রকাশক —

পীযূষ রাউত

গোবিন্দপুর, কৈলাসহর

ত্রিপুরা

মুদ্রাকর —

গুরুগোবিন্দ ধর

শ্রীপ্রেস, কৈলাসহর

ত্রিপুরা

মূল্য : ৫০ পয়সা

কবিতাকে যাঁরা সাময়িক নেশা কিংবা
একটা হুজুগ বলে মনে না করেন এবং
যে সকল কবি যথার্থই আন্তরিক এবং
সংস্কারমুক্ত—'জোনাকি' সবসময়ই
তাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে রাখবে।
মনোনীত রচনা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায়
প্রকাশের প্রতিশ্রুতি আমরা দিতে
পারিনা। অমনোনীত রচনা ফেরৎ
পাঠানো সম্ভব নয়। রচনা সম্পর্কে
কিছু জানতে হলে সংগে ডাকটিকিট
থাকা বাঞ্ছনীয়।
প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা।
নমুনা কপি কিংবা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা
পেতে হলে ডাকব্যয় সহ মূল্য আগাম
পাঠাতে হবে। দশ কপির কম এজেন্সি
দেওয়া হয়না।

বিপ্রলব্ধার উক্তি | সুবন্ধু ভট্টাচার্য

তার কথা ভেবে সারাটা সকাল গেলো
বিকেলও যে যায়, ভাবনার শেষ নেই।
গোধূলি গগনে ঘন মেঘ ধেয়ে এলো;
দিগন্তে ছায়া সায়াহ্নে ঘনালেই
অকারণ ব্যথা উদাসীন করে মন;
তখন বৃথাই তারার সম্ভাষণ।

যে কেড়ে নিয়েছে আমার ভাবনাগুলি,
সেই নিষ্ঠুর অনুতাপে হোক সারা;
যে ভুলে গিয়েছে কি করে যে তাকে ভুলি,
ভিতর দুয়ারে কে দেয় সজোড়ে নাড়া?
প্রণয়ের এ কী নির্মম কৌতুক!
তাকে ফিরে পেতে মন কেন উৎসুক!

শব্দ ভাবনা | শান্তনু ঘোষ

কবিতা লিখব বলে সন্তর্পণে কালি নিয়ে
বসে আছি
বাইরের হাওয়া জানলা পালিয়ে এল ভিতরে
সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই এল কিছু খুচরো শব্দমালা

আরও কিছু কারিগরী আমি গতকাল কেনা
সিলভিয়া প্ল্যাথ থেকে জীবন্ত ধার করলাম
কিন্তু আরও কিছু মালাগাছি কিংবা পবিত্রতার
দরকার, সহসা না পাওয়ায়
উঠে গিয়ে তীব্রভাবে জল খেতে চাই, দেখি
তোমার সেই সখের বাক্সটি চাবি নিয়ে চেয়ারেই ঘুম।
চাবি নাড়তে নাড়তে বাক্স ভিতরে দেখলাম ফাঁকা মাঠ
কোনো গাছপাথর, কিংবা শব্দ নাই

আমি আজ আর কবিতা লিখব না, নাইতে যাবো না
ভাত খাবো না, কাউকে ভালোবাসবো না
কারণ কোনো শব্দ মাত্র নাই।

একমাত্র কবিতার জন্য | স্বপন সেনগুপ্ত

তির ছুঁড়তেই একটা অস্পষ্ট কাতর কান্নায় এসে পায়ের তলায়
রক্তাক্ত বালিহাঁস হামাগুড়ি দিল ... চট্ করে তুলে নিই,
দু'হাতে জড়িয়ে ধরি। পিঠে একটা হাতের স্পর্শ ·
মাইরি, অবাক করলি, দারুণ নিশানা তোর।

জানিস্ পীযূষ। ওসব মহার্ঘ বৈকালিক উল্লাসগুলো আজো
পেণ্ডুলামের মতো আন্দোলিত ছন্দের শরীর হয়ে
মাঝে মাঝে চৌকাঠে ছড়িয়ে দেয় রোমাঞ্চিত সমুদ্রের ঘ্রাণ।
রাইফেল কাঁধে নিয়ে শিকারীর মতন, সত্যি শিকারী—
ফ্লাস্কে গরম চা, মুখ খুলতেই কুণ্ডলিত ধোঁয়া।

আজকাল কেমন একটা স্থবিরতা তবু রক্তে এসে গেছে;
স্থবিরতা চড়ের মতন ভেসে উঠে একদিন আমার বাগান, ঘর
সব নীলামে ওঠাবে জানি। তবু মনে হয়,
নিজের চেহারা ছাড়া আর কিছু ভালোবাসা যায় না কখনো;
নিজের কবিতা দু'দশ মিনিট পরই ভয়ানক বাসি হয়,
উপেক্ষিত প্রেমিকের মতো মুচড়ে পড়ে খাতার পাতায়—
জল ঢালি, আহত জায়গায় কিছু আইডিন কিংবা ডেটল
অতিরিক্ত বরাদ্দ নিশ্চয়। তুই বলবি . তাহলে লিখিস কেন?
আয়না বরং রাইফেলে পুনর্বার লক্ষ্য স্থির করি।

অথচ জানিস, কবিতা ছাড়া আমি বাঁচবো না, কবিতা
আমার ঘরে আগুন দিয়েছে—আমি জ্বলে জ্বলে জ্বলে
একদিন ধোঁয়ার মতন মিশে যেতে পারি, তবুও জানিস পীযূষ,
কবিতা কবিতা করে পাগল হওয়া ছাড়া আর কোনো রাস্তার
খবর আমার 'টেবিল টাইমে' আজও স্পষ্ট নয়।

মনে হয়, কিছু রক্ত ছাড়া কবিতা হয় না, কবিতা ভীষণ রাক্ষুসী।
বালিহাঁসের মতন ও আমার রক্ত দেখতে চায়—দেখতে চায়
আমি অস্পষ্ট কাতর-কান্নায় এসে ওর পায়ের তলায় হামাগুড়ি দিই।

কফিনের ভেতরে আমরা | মানিক চক্রবর্তী

'এখানে কেউ আছো নাকি হে'—
আমেজ খোঁজা প্রেমিক যুগলের ৬০ দশকীয়
ছুঁড়ে মারা প্রশ্নটা
বন্ধ দরজায় হোঁচট খেল।

ভেতর থেকে
দীর্ঘশ্বাসে
ভয়ার্ত উত্তর ভেসে এল :
আমরা এখানে
মহেঞ্জোদারো, পিরামিডের মাসোহারা পাওয়া
বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল।

অতঃপর
বিরক্ত প্রেমিক যুগল চলে গেল
নিকেল শব্দ ওঠা বাড়িটার পাশে,
ইতিহাসের বুলেট ছিদ্র হৃদয়ের
চিত্র প্রদর্শনীতে
প্রমোদ বিহারে।

'রাবিশ' বুলিতে অলংকৃত হয়ে রইল
বাগানের ভাঙা কুটির।

প্রেম | অতীন দাশ

কেবল সাহিত্যে নয়—প্রেম বলে বাস্তবে প্রখর
উজ্জ্বল শব্দের ধ্বনি স্বীকৃতিতে হৃদয়ে প্রবল
উল্লাস ও উত্তাপ হয়—মনে হয় তুমি দূরে গেলে
সকলি যাবে না দূরে, কি যেন কি রয়ে যায়,
রয়ে যায় একান্ত কাছেই; এবং যতোই বলো
ভালো করে ভেবে দেখো মনে—হৃদয়ে আছেই
একটি গোপন তৃষ্ণা, ভালোলাগা স্মৃতি
তুমি তাকে যা'ই বলো সে'ই প্রেম, ভালোবাসা, প্রীতি।

পরিদর্শক আমি | পীযূষ রাউত

কিছু লিখতে গেলেই
আমার অতিপ্রিয় ভাঙা চায়ের পেয়ালার কথা,
আমার চুরি যাওয়া হংকং মেড এভারেডি টর্চের কথা,
কৈশোরে পঠিত ঠাকুরমার ঝুলি, গোপাল ভাঁড়
কিংবা আরব্য উপন্যাসের কথা চারিধারে ভিড় করে আসে।

কিছু ভাবতে গেলেই
কল্পনার যে আব্রু চোখে এসে জটলা করে
দুঃস্বপ্নের শিংওয়ালা দৈত্য, গভীর কূপ,
সহস্র শ্বাপদজন্তু, দুরারোগ্য অসুখের স্মৃতি।

কিছু দেখতে গেলেই
চোখের উপর অন্ধ, কালা, বোবা এবং পঙ্গুদের অতিদীর্ঘ কিউ।
১০০ কেজি ওজনের শহরের সেই বিখ্যাত মহিলা,
সিনেমার চতুর ভিলেন। চৌরঙ্গীর ফুটপাথে
কোনো কোনো ডবল ডেকারের নির্মম কৌতুক।

কিছু শুনতে গেলেই
অশ্লীল খিস্তি, গালাগাল, কলের জল নিয়ে ইতর বিবাদ।
খেঁদি কিংবা পেঁচির মুখে অদ্ভুত আধুনিক কিংবা
ফিল্মী সঙ্গীত।
কিশোরের মুখে কুমারীর যৌবন নিয়ে চটুল কেচ্ছা।

এখানে, এই কলকাতায়—
আমি যখন নিঃসঙ্গ শুয়ে আছি ঘরে— চেতনার প্রকোষ্ঠে
বৃশ্চিকের অমোঘ দংশন। দেয়াল ঘড়িতে রাত্রি দুপুর,
গর্ভের অন্ধকারের মতো কুটিল অন্ধকার ছুটে এসে আবৃত করে
আমারই বিক্ষত জটিল আমি।
অতএব মৃত কোনো বসন্তের জন্য ইদানিং মোটেই ভাবি না।

আমার ভালবাসা আমার কবিতা | প্রদীপ বিকাশ রায়

ভালোবাসা কতখানি ভালো, রক্তক্ষরণ কতখানি চায়
জানা হলনা কতখানি অসুস্থ হতে হয় কবিতা লেখায়।
নরম পাপোষের মতো হৃদয়খানি মেলে দিলাম
চৌকাঠের পাশে দরজা খুলে পা রাখল না
প্রেয়সী আমার। আহা কী নির্বোধ আমি!
শব্দগুলো শুকোতে দিলাম খোলা ছাদে, দমকা হাওয়ায়
তুলার মতো উড়ে গেল তুলার মতো। কবিতা
লেখার সময় একটাও স্মৃতি খুঁজে পেলাম না,
যেমন নখ কাটার সময় পুরোনো ব্লেডগুলো খুঁজে পাই না
অথচ যখন ঘুমাতে যাই কত সহজেই বিছানার তলায়
পুরোনো ব্লেডগুলো চোখে পড়ে, স্মৃতিগুলো ছুটে আসে
পচা মাছের গন্ধে মাছিদের উৎপাত। অথচ এই
দারুণ ২৭-এর রক্তকণিকায় ১০০০০০০ সন্তানের
হাত-পা নাড়ার শব্দ আমি টের পাই। ১০০০০০০
কবিতার ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকায় মগজের ভেতর—
আমি পাগল হই। অথচ আমার অনাগত সন্তানের মতো
আজও তেমন কোনো কবিতা ভীষণ আপত্তিতেও
কাঁদতে কাঁদতে ভূমিষ্ঠ হল না।

ভালোবাসা কতখানি ভালো, রক্তক্ষরণ কতখানি চায়
জানা হল না কতখানি অসুস্থ হতে হয় কবিতা লেখায়।

তোমার প্রতীক্ষায় | শীতাংশু পাল

দূর দিগন্তে নদীর পারে পারে
হলুদ সাদা রাইসর্ষে ও মুলার ফুলে ফুলে
রবিশস্যের অফুরন্ত শ্যামল প্রাচুর্যে যেখানে
হরিয়াল ও বর্ণবহুল পাখিদের অপূর্ব খেলাধুলা
সেখানে অতীত ধানগন্ধী আবহাওয়ায়
তোমাকে সন্ধান করেছিলাম।
আমি স্পন্দন অভিলাষী বীজ আহা, মেঘের

অপেক্ষায় বর্ষার যৌবনের আকাঙ্ক্ষায়
কতক্ষণ পরে অঙ্কুর উদ্গীর্ণ হবো
তাই তোমাকে সন্ধান করেছিলাম
সন্ধ্যারাগে শীতবসন্তে
শ্রেণীবদ্ধ কৃষ্ণচূড়ার আগুন প্রদীপ্তরাগে।

তোমাকে সন্ধান করি বর্ষার প্রতীক্ষায়
আনন্দবিলাসে মগ্ন হতে চঞ্চল ধারায়—
বুকে নিয়ে সমুদ্র মোহনায যাবো
অফুরন্ত ঢেউযের খেলায়।

ভুল করে চাওয়া | অনিল কুমার চক্রবর্তী

এবং বলেছিলে তুমি
মগ্ন নও, মগ্ন নও
শুধুই আলোর খেলা কৃত্রিম রক্তিম
বলেছিলে স্বপ্নময় তোমার মগ্নতা।
আমি চাইলাম তবু বাস্তবের দেখা
বিলাসের বর্ণোচ্ছ্বাস কর্তব্যের পথে যাতে
হয় পরিমিত।

প্রভাত আকাশ তাই
গোধূলির ম্লান রক্তে পরিণত হল
সূর্যের বর্ণালীছটা ধীরে ধীরে তিমিরে মিলালো।

এবং বুঝেছি আজ
স্বপ্ন ভালো কল্পনাও ভালো
অন্ধকারে আলো চাওয়া
ভুল করে চাওয়া।

তাঁত | উদয়ন ঘোষ

তুমিই আমার অসুখ তুমি মর্ম্মমূলে
ছায়ার মতো অনুসরণ মেঘে মেঘে
কখন আমার বেলা গেল এখন আমি
তন্তুবায়ের মতন বসে টুকরো হাসি
চোখের ঝিলিক, কিংবা হঠাৎ রৌদ্রটুকু
মুছে নেওয়া মেঘের আভাস চোখের কোণে
বোঝার ভুলের তোড়ায় কিছু কণ্টকিত
ফুলের জ্বালা ঠিকানাহীন ঘর পোড়ানো
কিছু আগুন এসব নিয়ে নক্সা গাঁথি।

শীতের ভোরে হয়ত এখন মিষ্টি রোদে
পিঠ দিয়ে এক সুদূর দেশের রৌদ্র ও মেঘ
বর্ষাগহন মধ্যরাতের দুঃখিত মুখ
অচিন নদী ঘাস ও প্রবাল মুক্তো জরি
বরফ তুষার নিবিড় শীতল ঘনান্ধকার
এ দেশের বা অন্যদেশের ফুলের গায়ে
থরো থরো শিশিরে এক প্রসন্ন ভোর
এসব নিয়ে সকালবেলা তোমার উধাও।

নিজের ছায়া দেখবো বলে নদীর কাছে
এগিয়ে যাই নদী তখন ঢেউয়ের দোলায়
সব মুছে দেয় আমার শিথিল হাতের ফাঁকে
জলটুকুও রয়না আমি নদীর দিকে
অসহায়ের মতো শুধু তাকিয়ে রই।

সন্ধেবেলার মালিগাঁওয়ের রেলকলোনি
দীপাবলী লাজিয়ে নীরব বাতায়নে
একলা বসা বিষণ্ণা এক মেয়ের মতো
তাকিয়ে দেখে অন্ধকারে স্থির সিল্যুয়েট
লুইড নদীর ব্রিজ একাকী রাত পাড়ি দেয়

ভোরের রোদে অলস উদাস বালুর চরা
নদীর বুকে মাছের খোঁজে একলা ভাসা
নৌকোটিতে যেমন এসে ছায়া বিছায়
একখানি মেঘ তেমনি কোনো মেয়ের মনে
আরেকটা মুখ হয়তো হঠাৎ অঝোর প্রপাত।

স্বল্পায়ু এক জলের ধারা | উমা ভট্টাচার্য

আমার মনে স্থির থাকেনা
কোনোকিছুই স্থির থাকেনা।
শব্দ পড়ে জলের মতন
পদ্মপাতায় জলের মতন—
হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটো
শব্দ কেবল একটা দুটো,
আঘাত হানে ঢিলের মতন
আস্তে ছোঁড়া ঢিলের মতন।

পদ্মপাতায় জলের ধারা,
স্বল্পায়ু এক জলের ধারা
আমার মনে স্থির থাকেনা—
কোনো কিছুই স্থির থাকেনা।

এখনো কবিতা লেখা | বিমল দেব

এখনো কবিতা লেখা আমি ছেড়ে দিইনি, পীযূষ।
স্বাভাবিক নিয়মে এখনো রাস্তার চিন্তায় নিমগ্ন মানুষগুলোকে
অমাবস্যার জোয়ারের মতো ঢেউ তুলে
স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দেয় সকালের লোকাল ট্রেন,
সেই বন্যায় ভাসমান বাসে জীবনের প্রশ্ন গতানুগতিক।
কাব্যহীন সময়ের বৃত্তে এটা অনন্তকালের পবিক্রমণ।
হায়, যুবক কবির ভাষা বেদবাক্য!
পরিবারগুলোর মন আজ রেশনের দোকানে—
কেন না, খবরের কাগজে খাদ্যবাহী জাহাজ এখন সমুদ্রে।
আকাশবাণীতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা।
মনুমেন্ট ময়দানে নিয়ত আশিলক্ষ কণ্ঠে ক্ষুধিত জিজ্ঞাসা।
দেয়ালে ইলেকশনের পোস্টারে চাপা পড়ে গেছে
মুক্তিকামী ভিয়েতনামের জাতীয় চীৎকার।

তবু সমস্ত দেহে ভিখিরি-ক্ষুধা নিয়ে সহজেই আজও
পীযূষ, তোদের মতো আমিও ভাবতে পারি
সন্ধ্যার লেডিস্-বাস (ট্রাম—ধর্মঘটে বন্ধ)
যেমন ভ্রাম্যমান কোনো জাপানী ফুলবাগান।
বলতে পারিস যদিও :
'মোনালিসার মতো হাসিতে মনোলীন কোনো ঈশ্বরীর সন্তান
নিমজ্জিত করুক আমার কোন অপার্থিব মুখে'—
একদা যা ছিল আজ নাইবা হলো আমার কবিতার সামগ্রী।
তবু বিশ্বাস কর, বলতে কোনো দ্বিধা নেই—
এখনো কবিতা লেখা আমি ছেড়ে দিইনি, পীযূষ।

আত্মদর্শন | তাপস শীল

নরমবুকের তলায় আগ্‌লে রাখি
এক পাহাড় নগ্ন কুয়াশা
শহর অ্যারিস্টোক্র্যাসি—ভ্যানিটি—এটিকেট্
গণিকা পাখির তৎপরতা
পালিশী অন্যান্য ব্যবহার
পাপড়ির উপলব্ধিগুলো খসে পড়ে
গোলাপ গোঁয়ার হয় চণ্ডাল স্বভাবে
রক্তবীজে বিষপুষ্ট কীটের দংশন
৩০ দিন অশালীন মনে হয়
তবু হিরো হবার লোভ সামলাতে পারিনে
পার্টি—কক্‌টেল—ড্যাশ্ ড্যাশ্ ড্যাশ্
আরো হাজার পোশাকী-চাল
কায়দার বুনোট
সাবেকি মারপ্যাঁচে মাফিয়া স্টাইল
মক্‌শো করি ইদানিং
এবং রেইন্‌বো টাই বেঁধে টেরিকটনে ক্রীজ
রেখে চলি
পলকে ম্যাগনোলিয়া—হ্যালো হাউ ডু ইউ ডু
শেইক হ্যাণ্ড ...
তীব্র চিত্ত চাঞ্চল্য উন্মাদনা উল্লাস
(তা কি জয়ের অথবা ভয়ের?)
আর্টগ্যালারিতে দর্শকদের বাসি হাততালি কুড়িয়ে
মার্কোপোলোর মজলিশী কক্ষ ছেড়ে
বাইরে আসি যখন
জুতোর ঢিলে ফিতে বাঁধতে বাঁধতে
কেবলি মনে হয় আমি ন্যাংটো
আমারই বিভিন্নবর্ণের ছবি দেখে দেখে
ফেরিওয়ালা—মুটে—রিক্সাওয়ালা হাসে
অনুভব করে অঙ্গহীনতা
বিদ্রূপে চেতনা হারায়
যেহেতু আমি প্রতিবিম্বিত এখন উৎকৃষ্ট মনুষ্যসমাজে।

অচেনা বিন্দুতে | কাজল পুরকায়স্থ

ক্রমে ক্রমে
নানাদিক হতে শুনেছ তুমি
বিলুপ্তির ডাক
নিষ্প্রভ নেপথ্যে।

শান্ত অনিল প্রেম,
সবুজ হৃদয় সবুজ প্রণয়
অশালীন ভাষা হয়ে আছে যত সব,
আশাতীত কোনো অদেখা বিদায়ের ডাকে
সচকিত দেখেছ তুমি
নিদারুণ বিদায় সংকেত।

ক্রমে ক্রমে
নিলীন তুমি তাই স্থির কোনো অচেনা বিন্দুতে।

পদক্ষেপ | পদ্মাদেবী

পুজাই সুন্দর
হাতের কাছে যা পাওয়া যাবে, তাই দিয়ে।
নাগালের বাইরে যাবার
হুড়োহুড়ি নেই—
উপাচার ক্রমাগত এগিয়ে আসছে
রুচি বৈচিত্র্য নিয়ে।
দ্বিধাবোধ মানুষের—
এক পা এগিয়ে তিন পা পেছোনো
নৈবিদ্যের থালি অপূর্ণ বলে
ভাবনা নেই
যা হবার হবে।

ভ্রম সংশোধন : পুজোসংখ্যা 'জোনাকি'-তে কবি প্রণব চট্টোপাধ্যায়ের পরিবর্তে ভুলবশত প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা হয়েছিল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত। সঃ জোঃ
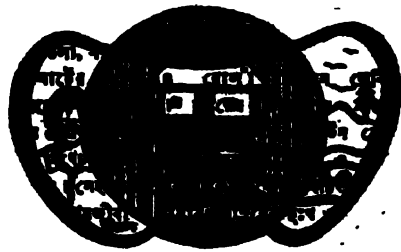
ত্রৈমাসিক কবিতা-পত্র ॥ ৩য় সংকলন ॥ শ্রাবণ, ১৩৭৪ ॥

ত্রৈমাসিক কবিতা সংকলন

৫ম সংকলন

শ্রাবণ : ১৩৭৪

সম্পাদক—পীযূষ রাউত

সহ-সম্পাদক : প্রদীপ বিকাশ রায়, মানিক চক্রবর্তী

প্রচ্ছদশিল্পী—বিমল দেব

মালবিকা রায়ের মৃত্যুতে | স্বপন সেনগুপ্ত

শান্তনু, মালবিকা রায়ের কথা মনে আছে তোর?
রেডিও আর্টিস্ট মালবিকা রায়;
আমাদের ক্লাসমেট ছিল। গেল বর্ষায়
যার নিদারুণ মৃত্যুর কথা লিখেছি চিঠিতে।
যার গান নমনীয় আঙুলের মতো
গড়ে তুলতো অন্য এক উপাস্য আকাশ।
শান্তনু, এখানে এই নদীটার পাশে দাঁড়া,
বিনীত রক্তের মতো শীতল শরীরে
কী করে রোজদিন সংখ্যাহীন আর্তনাদ
ঢেউ তুলে, ভেঙে পড়ে দু'পার ডুবিয়ে নেয়
বৈরী অন্ধকারে,—আমরা তা কখনো জানিনা।
সমাহিত অন্ধকারে ডুবে থাকা কাঁটাঝোপ থেকে
কারা নাকি কেঁদে ওঠে গভীর নিশীথে—
অবিকল নবজাতকের মতো সরল স্বভাবে।
শান্তনু, এখানে বেড়াতে এলেই বড়ো বেশী রূঢ়তায়
চোখে পড়ে লাল আলোয় ডুবে থাকা বেকার-ভবন।
মালবিকা অমন আলোর নীচে কত সন্ধ্যা,
কত রাত দীর্ঘ করে গেলো; তবু কেন ইচ্ছে করে
ঘুমের বড়ির ভেতর অনায়াসে খুঁজে পেলো—
সেই রূঢ় কালো কালো দুর্বিসহ মুখোশের ছায়া!
শান্তনু, আজো মাঝে মাঝে অন্ধকারে রেডিওর
নীলাভ আলোয়—কেঁপে ওঠা মালবিকা রায়ের চোখ
তরতর করে নেমে আসে; মনে হয়, দূরাগত কোনো
ভয়ার্ত মাঝির কণ্ঠ কেঁপে উঠছে সামুদ্রিক ঝড়ে।
মনে পড়ে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে বহু ঘরে ফেলেছিল
নমনীয় কণ্ঠ ওর স্মরণীয় জোছনার সভা :
" ... ...
একলা ঘরে চুপে চুপে এসো কেবল সুরের রূপে
দিয়ো গো, দিয়ো গো,
আমার চোখের জলে দিয়ো সাড়া।"

আজ তবু মনে হয় | নচিকেতা ভরদ্বাজ

তোমাকে কী বলে ডাকব বুঝতে পারি না
কোন্ সম্পর্কেরে ঘরে বুকে করে রাখা তোমাকে!
আকাশের গ্রহতারা এবং মানুষ পশু সকলেই ডাকে
তোমাকে যে। অভিমানী হৃদয়ের শোকাহত বীণা
স্তব্ধ হয়ে গেছে তাই অক্ষম আশ্চর্য বেদনায়।
তোমাকে, ইচ্ছে করে, আগলে রাখি সবার আড়ালে
সব দুঃখ ব্যথা থেকে, সকলের দৃষ্টি-সূঁচ থেকে
রৌদ্র-কোলাহল থেকে নিয়ে যাই তোমাকে আমি নীল নীল নির্জনতায়
ইচ্ছে করে, দারুণ প্রখর রৌদ্রে সূর্যের উত্তাপে
তোমার সর্বাঙ্গ আমি ছায়া হয়ে ঢেকে
থাকি, মুগ্ধ বৃষ্টি হয়ে অপরূপ আনন্দ তৃষায়
ঝরে পড়ি—ঝরে পড়ি তোমার মুখের চারিদিকে।

তুমি তো সুনীল জ্যোৎস্না হয়ে আছ জীবনের অন্তরঙ্গ মূলে,
অথচ তোমাকে আমি পাই না রূপের রহস্য-উপকূলে
সম্মোহিত আলোকমালায়। আমি পলাতকা হীরামনটিকে
ধরিতে পারিনা কভু স্থির কোনো বৃত্তের উপরে।
অথচ তোমাকে আমি সম্পর্কের স্থায়ী অন্ধকারে
পেতে চাই না—এও সত্য। কারণ তাহলে জানি তুমি বাঁচবে না।
এক একটি কৃষ্ণচূড়া বৈশাখের রঙ্গালয়ে ঝরে
আষাঢ়ে একক রিক্ত। সব সুর জীবনের তারে
বাজে না যে। আমাকে শুধিতে হবে একা এই জীবনের দেনা।
অথচ তোমাকে আমি আমার যে দিনরাত্রি সমস্ত দিয়েছি।
আমার ধাবন্ত রীলে শুধু একই মুখের মিছিল।
আমার সর্বস্ব দিয়ে পেতে চাই তোমাকে আমার
পরিচিত বৃত্তলগ্ন। অথচ বৃত্তগুলি জীবনে দেখেছি
অন্যবৃত্তে ধাবমান। বিকেলের ছায়ারৌদ্র করে ঝিলমিল।
আমরা সকলেই জানি পলাতকা আসন্ন আষাঢ়।
নিষ্ঠুর নিষ্ঠুরতম সময়ের চতুরঙ্গ সেনা
সবকিছু নিয়ে যাবে। আমাকে হয়তো তুমি মনেও রাখবে না
একদিন অন্যবৃত্তে। নিত্য পরিবর্তমান জগৎ সংসার।
সন্ধ্যার সরোবরে শ্বেতপদ্ম একটিও থাকে না।
আজ তবু মনে হয় তুমি শুধু একক আমার—
আর কেউ কিছু নেই। চারিদিকে অতল আঁধার।

আবর্তন | বিজন চৌধুরী

এলোমেলো চাঁদগুলো অপসৃত হলে
অন্ধকার আড়মোড়া ভাঙে।
গরিলার নিঃসীম বুকের দরজাটা খুলে
গেলে আতঙ্কে তাড়িত নাস্তিকও ঈশ্বরকে
খোঁজে প্রাকৃত নিয়মে। কৌতূহল
ক্লান্ত ফিকে ভ্রমণেই, অবশেষে
ঈশ্বর অথবা ঘুম কারো সন্নিধানে অকপট
নিভে যেতে গিয়ে মূর্চ্ছায় গলিত।
সকালে, কিমাশ্চর্য, দ্যাখো, লুঙ্গিটা গুছিয়ে
মড়াটাই কাঠকাঠ কাশি কেশে
দু'পাটি দাঁতের ফাঁকে বিড়িটা ধরিয়ে হাটে
এসে সুসম্পন্ন সুরসিক ক্রেতা।

ঘরের ভিতর ও বাইরে | দীপেন রায়

ঘরের ভিতরে আমি অন্ধকারে মাটি চাই
বাইরে আমার চাই বিশ্বস্ত করুণা। হাত
পেতে আছি বনভূমে, অরণ্যের ছায়াতল।
প্রেমের কঠিন চিঠি ছেলেবেলা ছিঁড়ে গেছে
নর্তকীর নিরুদ্বেগ উরুর ওপর। মাত্র
কয়েকটি দিন যাদুমন্ত্রে যেন বা আচ্ছন্ন।
আমার নির্লজ্জ ইচ্ছা খেয়েছিল যেই হাত,
বাসনার মন্ত্রগুপ্তি, পরম আশ্চর্য শুধু
গোপনীয় অন্তর্বাসে যার দারুণ পিপাসা।
ঘরের ভিতরে আমি অন্ধকারে মাটি চাই
বাইরে আমার চাই বিশ্বস্ত করুণা। হাত
পেতে আছি মমতায়, বাসনার জাগরণে।

প্রাচীরে ছায়া কাঁপে তোমার আমার | প্রদীপ বিকাশ রায়

তোমাদের পুকুর পাড়ের পুবদিকে প্রাচীর
পশ্চিমে সূর্যের রক্তাক্ত বিদায় পুকুরের জলে
বিষণ্ণ ঢেউ তোলে।
ছায়া কাঁপে প্রাচীরে সূর্যের ও জলের
আমার অসহায় ছায়া তোমার উঠানে
এখন হামাগুড়ি দিয়ে যেতে পারে না—
কেননা সূর্যই প্রাচীর।
তোমার বাগানের পথ রুদ্ধ ছিল বলে
এইমাত্র যে পাখিরা ফিরে চলে যায়
তাদের ঠোঁটে তোমার মৌসুমী ফুলের
কোনো গন্ধ নেই।
তোমার ঠোঁটদুটো বেজায় ফ্যাকাশে হয়ে গেছে
অনেক দিন কোনো রঙ মাখনি, যেন বিশ্বাস করোনি
আমার বুকেই ছিল তাজা গোলাপী রঙ
ইচ্ছে করলেই আমার হৃদয় থেকে
কিছু রঙ নিয়ে তোমার ঠোঁটে যৌবনকে বাঁচাতে পারতে
আরো কিছুদিন।
অথচ বেলা দুপুর অব্দি ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম
পুকুরের ঘাটে
আমার ছায়া কেঁপেছিল তোমার জানালার পর্দার
তোমার মুখের সামনে আয়না ছিল বলে দেখতে পাওনি।
আজ বেলা শেষে তোমার বাঁধভাঙা ছায়া
আমার পদপ্রান্তে এসে পড়ে; আমি মুখ ঘুরিয়ে দেখি;
তুমি নেই, চারিদিকে শুধু তোমারই ঘনীভূত ছায়া।

দুয়ারের অন্ধ-ভিতর | মন্মথ দাশগুপ্ত

দুয়ারের শিকল শক্ত ভীষণ; মরিচার তীব্র আক্রমণ, কিন্তু খুলবেই।
সাহস নেই, ভয় হয়; আইনের বাধা তো নেই!
আজ স্মৃতিতে জাগছে বহুদিন আগে একটি শীতার্দ্র রাতে অন্ধকার
নেমে এসেছিল এমন একটি দুয়ারের অন্ধ-ভিতর।

ভয় পেয়েছিলুম। বুকের সব রক্ত স্রোতহীন হলো; কিছুই পাইনি।
আমার আবিষ্কার করা হলো না—আজ স্বীকৃত না হলেও
আমার দৃঢ়তা অনেক উপরে, চতুর্দিকে উপকূল নেই। দু'হাত জড়িয়ে ব্যথায়
সহ্যের সীমা ডিঙিয়ে শপথ করছি—আজ ভয়ের অর্থ নেই।
নিরর্থক যতো শক্ত তোমার আবেষ্টন আজ আমি ভাঙবোই
শক্ত শিকল; দেখবই দুয়ারের অন্ধ ভিতর।

সামনের মাঠটায় | কাজল পুরকায়স্থ

মনে হয় জানালার এই ফাঁকটা দিয়ে
লাফিয়ে পড়ি সামনের মাঠটায়।
এখানে বসে বসে রোজদিন
তৃণের বিশাল বুকে
আকাশ, জল এবং নিরীহ পশুদের
সংজ্ঞাহীন মৌন মিছিল দেখি
আততায়ী আকাশ নয়
সময়ে নেই কুটিল কটাক্ষ;
নিরভিমান বাতাসে জটিলতা নেই;
বা ভিড়ে ঘর্মাক্ত হওয়ার ভীতি।
নিজেকে একটি প্রশ্নের উত্তরে
ফিরে পাবার মোহে
রোজদিন আন্দোলিত আমি
মনে হয় জানালার এই ফাঁকটা দিয়েই
লাফিয়ে পড়ি সামনের মাঠটায়।

অবশিষ্ট—
রেশনশপের বন্ধ দরজার
সামনে আমার অকারণ অস্তিত্ব | জালাল উদ্দিন

বিছানায় শুতে গেলে
অকারণ ভাবনাগুলো
সারারাত কেঁদেকেটে উপদ্রবে উপদ্রবে আমাকে নিস্তেজ করে।
অতঃপর আমার সত্তার সঙ্গে শখের মিতালি জুড়ে দিয়ে

আমার বরফ বুকে মুখ রেখে
তুমি এক অবিশ্বাস্য ঘুমে অচেতন।
এবং অকস্মাৎ সর্দির প্রকোপ ভয়ানক বেড়ে গেলে
তোমারই চুলের গন্ধ অ্যামোনিয়া কিংবা
কাঁচা পেঁয়াজের ঘ্রাণের মত আমার উপকারে আসে।

অতএব তোমাকে সরাতে গেলে
স্নায়ুর অশ্লীল ক্ষতস্থানগুলি আঁকড়ে ধরে
অনায়াসে লেপ্টে থাকো—নির্বিকার জোঁকের সামিল।
সাময়িক রক্তক্ষরণ বন্ধ রাখার জঘন্য অভিপ্রায়ে
দুর্বল হয়ে আমিও ঘুমাই।
রঙচঙে পাখিদের নির্ভেজাল ঘুমভাঙা
প্রত্যুষের সবুজ সময় উৎরে গেলে
আটটার রুক্ষ রোদে অপূর্ব খোলস এঁটে
তুমি ঢাকা পড়ো পর্দার আড়ালে।
তোমার জানালাটা তখন আমার ধূসর দৃষ্টির বাইরে।
অবশেষে রক্তে লবনের বিরক্তিকর পার্সেন্টেজ
অনুভূত হলে মনে হয় আমার স্নায়ুর ক্ষতে
সারারাত পুঁজ হয়ে জমেছিল তোমারই বিবস্ত্র দেহটা।
লবনের চায়ে চুমুক দিতে দিতে আরও প্রকট হয় :
ব্যক্তিগত কুপনে ২০০ গ্রাম চিনি থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য
গাফিলতিতে অসম্ভব দেরী করে রেশন শপের
বন্ধ দরজার সামনে আমার অকারণ অস্তিত্ব।

কবি সংবাদ| সংগ্রাহক : প্রদীপ বিকাশ রায়

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা দিয়ে 'অস্ট্রেলিয়ান পোয়েট্রি' নামে একটি বার্ষিক সংকলন বেরিয়েছে। কাব্যচিন্তায় অস্ট্রেলিয়ানরা কত পিছিয়ে আছেন এই সংকলনটি তার প্রমাণ। এর অধিকাংশ কবিতায় না আছে যুগচেতনা, না আছে জীবন সত্যের প্রকাশ, না আছে প্রতিশ্রুতি। এককথায় অস্ট্রেলিয় কবিদের নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। কতগুলো গাছপালার বর্ণনা, সুন্দর সুন্দর জায়গার নাম ও আঞ্চলিক প্রবাদ-প্রবচনের ফিরিস্তি ছাড়া কোনো কাব্যগুণ এ'সব কবিতায় নেই। যেন একশ বছর আগের মরচে-ধরা ইংরেজী কবিতাকে একটু ঘযেমেজে এখনও কাজ চালাচ্ছেন। সংকলনটি সম্পর্কে সমালোচকগণ এ-রকম মন্তব্য প্রকাশ করেছেন : 'সংকলনটি কবিতা-পাঠকদের হতাশ করবে। কেননা, কোনো সংকলনে যে পরিমাণ কবিতা ভালো হওয়া উচিত, তুলনায় নিকৃষ্ট কবিতারই সংখ্যাধিক্য দুঃখজনক।'

বর্তমানে শিল্প ও সাহিত্য ক্ষেত্রে জার্মানীরা কতদূর এগিয়ে গেছে এবং দেশের বুদ্ধিজীবীদের লম্ফঝম্প থামিয়ে দিয়ে কী রকম বিপ্লবাত্মক ঘোষণায় মুখর হয়ে উঠেছে তা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় পশ্চিম জার্মানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হাইরিষ ব্যল-এর বক্তৃতায়। ভূপারটাল শহরের রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধনীতে সাহিত্যিক ব্যল বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

"I only say for emphasis : he who is concerned with it (art) does not need a state –he needs a certain provincial administration for which he pays taxes : Lamplighters, who offer him light when comes home drunk, dustmen who free him from his rubbish ... ... This is what literature with heavt tread and under heavy fire has always done and is doing : breaking through taboos, not because it understands anything about love, not because it is searching and searching in vain for it—something which neither state nor church have even understood."

সম্প্রতি জার্মানীর কবি-সাহিত্যিকরা দাবী তুলেছেন লেখক, কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের জন্য তৃতীয় পৃথিবী চাই। ন্যায্য দাবী। এবং এ ধরণের দাবী সেই দেশের কবি-সাহিত্যিকদের মুখেই মানায় যে দেশের মানুষ রাজনীতিবিদদের চাইতে কবি-সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্যকে অনেক বেশী মূল্য দেয়। জার্মানীর কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীরা এখন দল বেঁধে নিজেদের বক্তব্য জাহির করছেন। একা যখন কিছু করা সম্ভব নয় তখন গ্রুপ কর। গ্রুপ ছাড়া এখন অন্য কথা নেই। শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে জার্মানীতে যখন এ রকম হৈ চৈ, জার্মানীর কবি-সাহিত্যিকরা সবাই যখন এরকম বলিষ্ঠ ঘোষণায় মুখরিত, সেই সময় নেলী সাখস্ যেন

সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। জার্মানীর তীব্রগতি সাহিত্য-প্রবাহে ভিন্নমুখী নেলী সাখস্ এ বছরের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

বাংলা কবিতার প্রতি জার্মানীদের অসীম আগ্রহ। বার্লিনে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে ভারতের পক্ষ থেকে শ্রী সন্তোষ কুমার ব্রহ্ম আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে বাংলা সাহিত্য আলোচনার প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতা আবৃত্তি করার সুযোগ পান। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রোতারা বাংলা কবিতার প্রতি কী রকম আকৃষ্ট হয়েছেন তা শ্রী ব্রহ্মের ভাষায় বলা যাক—"বাংলা কবিতা যখন একটার পর একটা পড়া হতে লাগল, তখন লক্ষ্য করা গেল, শ্রোতাদের কী অসীম আগ্রহ বাংলা ভাষার ধ্বনির উপর। প্রবন্ধ পাঠের পর যত না আলোচনা আর প্রশ্ন চলল, বর্তমানে ভারতীয় সাহিত্য তথা বাংলা দেশের কবি-সাহিত্যিকদের ওপর তার চাইতে বেশী আলোচনা হল। বাংলা কবিতার শব্দ ধ্বনিমাধুর্য, চিত্রকল্প আর তার বিভিন্ন ছন্দ তার বিষয়বস্তু"। কবিতা পাঠের পর শ্রী ব্রহ্মকে একজন মহিলা সাহিত্যিক জিজ্ঞাসা করলেন—"বাংলা ভাষা আর বাংলা কবিতার ধ্বনি কি সত্যি এত সুন্দর না আপনার পড়ার জন্য এতো ভালো লাগল?" উত্তরে শ্রী ব্রহ্ম বলেন—"আমার কবিতা পড়ার চাইতেও বাংলা ভাষাটা আরও অনেক ঐশ্বর্য সম্পন্ন আর ধ্বনি-মাধুর্যময়।" শুধু তাই নয়, বিদায় নেবার সময় স্বয়ং সভাপতি শ্রী ব্রহ্মকে অনুরোধ করেছিলেন · "আমার একটা শেষ অনুরোধ আছে—আপনি বিদায় নেবার পুর্বে আরো একটা কবিতা যদি পড়তেন।" *(শ্রী সন্তোষ কুমার ব্রহ্মের 'বার্লিনের চিঠি' থেকে সংগৃহীত)*।

বর্তমানে ইংরেজী কবিতার আসরে হুগো ইউলিয়ামস্ উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। ষাটের দশকের প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কবি হুগো ইউলিয়ামস মাত্র বিশ বছর বয়সে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ—'সিম্পটমস্ অব লস্' সম্প্রতি পোয়েট্রি অব বুক সোসাইটির পুরস্কারের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। সমালোচক আয়ান হ্যামিলটন 'সিম্পটমস্ অব লস'-এর সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন "লেখকের কাব্যপ্রতিভা ও নির্মাণশৈলী বিষয়ে আমি নিঃসন্দিগ্ধ। তাঁর কবিতায় চৈতন্যের যে অবিস্মরণীয় বিকাশ তা তাঁকে স্পষ্টতই অন্যান্য কবির থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করবে।"

তাছাড়া ১৯৬৬ সালের 'এরিক গ্রেগরি ট্রাস্ট ফাণ্ড' পুরস্কার প্রাপ্ত তিনজন তরুণ কবির মধ্যে হুগো ইউলিয়ামস অন্যতম বলে বিবেচিত হয়েছেন।

আধুনিক তরুণ কবিদের মধ্যে রাজকমল চৌধুরীর নাম বিভিন্ন কারণেই উল্লেখযোগ্য। হিন্দি কাব্য আন্দোলনে তাঁর বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি 'বীট' প্রভাবিত 'ভুখা পিঢ়ি' আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা। অবশ্য তাঁর কবিতা কতোদূর সার্থক হয়ে উঠেছে সে বিষয়ে বিস্তর মতানৈক্য থাকলেও তাঁর কবিতা যে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তা সবাই স্বীকার করবে। তাঁর কবিতায় বর্তমানে তান্ত্রিক শব্দাশ্রয়ী এক বিশেষ ধরণের শব্দ প্রয়োগ এবং প্রতীকী শব্দ প্রয়োগের প্রবণতা দেখা যায়।

● সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ● সুবন্ধু ভট্টাচার্য ● রামেন্দ্র দেশমুখ্য ● শুদ্ধসত্ত্ব বসু ● বিনোদ বেরা ● শংকর চট্টোপাধ্যায় ● রবীন্দ্র দত্ত ● সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ● মনোরমা সিংহরায় ● শংকর দে ● শিবশম্ভু পাল ● কল্যাণব্রত চক্রবর্তী ● শিশির সামন্ত ● পীযূষ রাউত ● সমীর রক্ষিত ● শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ● প্রদীপ বিকাশ রায় ● শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় ● দীপেন রায় ● দীপংকর চক্রবর্তী ● অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় ● স্বপন সেনগুপ্ত ● শান্তনু ঘোষ ● শীতাংশু পাল ● মানিক চক্রবর্তী ● তারাপদ রায় ● নচিকেতা ভরদ্বাজ ● কালীপদ কোঙার ● অজিত কুমার ভৌমিক ● বিমল দেব

শারদীয়

কবিতা-পত্র

সংকলন—ছয়

আশ্বিন—তেরোশ' চুয়াত্তর

সম্পাদক—পীযূষ রাউত

সহ-সম্পাদক—প্রদীপ বিকাশ রায় : মানিক চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ শিল্পী—বিমল দেব

মূল্য—পঞ্চাশ পয়সা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আত্মা

প্রতিটি ট্রেনের সঙ্গে আমার চতুর্থভাগ আত্মা ছুটে যায়
প্রতিটি আত্মার সঙ্গে আমার নিজস্ব ট্রেন অসময় নিয়ে
খেলা করে।
আলোর দোকানে আমি হাজার হাজার বাতি সাজিয়ে রেখেছি
নষ্ট-আলো-সঞ্জীবনী শিক্ষা করে আমার চঞ্চল
অহমিকা।
যাদুঘরে অসংখ্য ঘড়িতে আমি অসংখ্য সময় লিখে রাখি
নারীর উরুর কাছে আমার পিঁপড়ে দূত ঘোরেফেরে
আমারই ইঙ্গিতে তারা চুম্বনের আগে
কেঁপে ওঠে।
এইরূপ কর্মব্যস্ত জীবনের ভিতরে-বাইরে ডুবে থেকে
বিকেলের অমসৃণ বাতাসে হঠাৎ আমি দেখি
আমার আত্মার একটা কুঁচো টুকরো
আজও কোনো কাজ পায়নি।

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

দমকল বেজে যায়

দমকল বেজে যায়; কোথায় যে লেগেছে আগুন
কেউ তা জানে না, শুধু দমকলের ঘণ্টার আওয়াজ
অবিরত বেজে যায়—ধর্মালয়ে স্কুলে গ্রন্থাগারে,
জাহাজে বন্দরে কলে কারখানায় সরকারী অফিসে
যাদুঘরে সিনেমায় রেস্তোঁরায় চিলের কোঠায়
অবিরাম ঘণ্টা বাজে; অন্তরালে ঘণ্টার বাদক
পেশল রোমশ হাতে ঘণ্টা নেড়ে যায় দিনরাত;
ঘননীল পোশাকের আভাস রয়েছে মেঘে মেঘে।

অলক্ষ্যে কে বসে বসে ঘণ্টা নাড়ে, গম্ভীর আওয়াজ;
যেন বা গীর্জায় একলক্ষ কণ্ঠে প্রার্থনার সুর;
আকাশ পর্বতমালা বনরাজি তরুলতা নদী
সভয়ে ছেড়েছে পথ; পথিকেরা এখনও সাবধান!
দমকল ছুটে আসছে ঝটিকার মতো ক্ষিপ্র বেগে;
রক্তিম ইঙ্গিত তার দেখা যায় ঈশানের কোণে।

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

হাসিকে ভুলেছিলাম

কতদিন আমি তোমাকে ছিলাম ভুলে
নীলাম্বরীর নয়ন-জুড়ানো রূপ,
কতদিন আমি মনের সুখেতে হাসিনি
যন্ত্রণা-ঘেরা মনের কূপের ভিতর
আবদ্ধ দিন-যামিনী।

আজকে এখন শ্রাবণ-ভাবনা ঘিরে
জনস্রোতের আশায় গন্ধরাজ
মুক্তিপথের দু'ধারে সবুজ গাছে
সকালবেলার সিন্ধু পাখিরে ডেকে
স্বপ্নের বুকে নাচে।

কতদিন বলো, বিষাদকৃষ্ণ মনে
পদযাত্রার যন্ত্রণাভরা পথে
হে স্নেহশালিনী, তোমাকে ছিলাম ভুলে
অথচ, তুমি যে চোখের অতল নীলে
ছিলে সমুদ্রগামী।

আহা কত রাত, আমার চোখের বুকে
করুণা-যুবতী শুয়েছিলে অভিমানে,
হায় রে, আমি যে নীলাকাশ ভুলে গিয়ে
বিফলে দিলাম হাজার বাসর রাত
স্বর্ণতারার ফুলে।

শুদ্ধস্বত্ত্ব বসু

বার্ধক্যে, তবু—

আর একটি সংখ্যা শুধু যোগ হলো। প্রত্যয়ের গভীরে
কি পেলাম ডুব দিয়ে? সেখানে শংকিত দ্রুতি,
ভীরু অরণ্যের কম্পিত গাছের মতো!
বয়স বাড়ছে, মৃত্যুর দিকে যারা পা বাড়িয়ে মিছিলে যায়
আমারও মিতালি বুঝি সবার অলক্ষ্যে।

জীবন কি রোশনাই? পৃথিবীতে আরাম, উষ্ণতা,
নদী, নারী, নীপবন—সব বুঝি পলায়নপর,
মেল ট্রেন থামে না এমন নগণ্য স্টেশনের মতো
সরে যায়—ছিঁড়ে যায় আয়ুর সড়কে?

তবু কি পালায় সব? হতাশার বর্জিত উদ্যানে
কিছু উদ্যমের আশ্চর্য কমল
সূর্যহীন হয়েও ফোটে, কিছু বা সৌরভ ছড়ায়, কিছু সৌন্দর্যও।
তাই ফের সূর্য জাগে প্রাণে, হয়তো, হয়তো কেন—
নিশ্চয়ই কিছু করণীয় আছে! ট্রেন ছাড়ে—
সবুজ নিশানা পায় বয়সের অভিজ্ঞ চালক!

বিনোদ বেরা

চেতনা রয়েছে ডুবে

চেতনা রয়েছে ডুবে গোধূলির ঘাসে
চেতনা রয়েছে ডুবে গোধূলির গোলাপ আকাশে
চেতনা রয়েছে ডুবে গাঢ় রৌদ্র জবার আগুনে
এবং সকল বর্ণ দৃশ্য আর সুখ ও স্বপ্নের স্বাদুনুনে।

নিবিড় সরল কণ্ঠে ঝর্ণা গান গায়
আলোর পালকগুলি রামধনু খেলা শেষে সহসা.জুড়ায়
থমথমে রহস্যে ভরা প্রশান্ত পশ্চিমে
সূর্য ডুব দিল—ডুব দিল বুঝি মেঘে-মৃদু-হিমে!

গুহা আর গাছের বাতাসে
নক্ষত্ররা দোলে, শাদা হাঁস মেঘ ভাসে
পল্লব প্রশাখাগুলি পরিষ্কার নড়ে
মোমের আলোর মতো শান্ত মনে পড়ে
কত কথা। ছবি,—কত গানের অসীমে
আমাকে পৌঁছে দিয়ে নিভে গেলো বিপুল পশ্চিমে।

গোধূলির রক্তে ডুবে রই
ঘাস ও তারার সঙ্গে ফুলের ভাষায় কথা কই,
সে যদি আবার ফিরে আসে
আমার আকাশে
এলে খুব ভালো
হবো আমি চমৎকার আলো।।

শংকর চট্টোপাধ্যায়

বিফলতা

এই বা কী মন্দ বলো
        সকাল সন্ধ্যে তাড়া খেয়ে
        এসে দেখলুম ঘরটা খালি।
হয়তো ঠিকসময় এলে দেখা যেতো
        তোমার ট্র্যাজিক মুখশ্রী
        অহংকারী শীতল দৃষ্টি
        বিরুদ্ধ দু'টি গোপন স্তন*
        যাদের করপুটে ধরলেও বোঝা যায় না
                        আপন বলে।
শোনা যেতে পারত
        তোমার বিদগ্ধ রহস্য পরিহাস
        যা কিনা তৃতীয় ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বলা
কিংবা, সুখে-দুঃখে জড়ানো তোমার গার্হস্থ্য নিঃশ্বাসের
                        শব্দ।
তবু এই বা মন্দ কী
        সকাল সন্ধে তাড়া খেয়ে
        ঘরে এসে দেখা, তুমি নেই।

রবীন্দ্র দত্ত

আত্মহনন

রাজমিস্ত্রি প্রথমেই মনে করে চারকোণা ঘর
শেষ ইঁট লেবেল নিয়ে স্থির হয়েই শেষবারের মতো
        আলো বাতাস পরিপূর্ণ
তারপর সৌখিন জানালা মাথা উঁচু দরজার পাল্লা
কড়িকাঠ বরগায় ঐতিহ্যের কারুকার্য
মানুষের ঘর, ঝড় বৃষ্টি রোদ ও অপমানের হাত
        থেকে রক্ষা পাবার অস্থায়ী তাঁবু।
দিনের আলো নরম ধাক্কা দেয় জানালায় দরজায়
ঘরের হাওয়ায় পড়ে অভাবের টান
আমার হাত পা ঠোঁট বুক চৈতন্যে জেগে ওঠে

দরজা খোলে, সমুখেই পথ, অনেক পায়ের দাগ,
শহর গ্রাম নদী ছেড়ে চিন্তায় কতোদূর ঘুরে তোমার
আশ্রয়ে চলে যায়।
যেখানেই যাই, একাকী কাউকে খুঁজে পাই না।
বিলাসী বিখ্যাত পায়রার কঠিন অনুশীলন :
দূরের আকাশে পাখা গুটিয়ে চুপ, বৃষ্টির মতো
পতনশীল ভীষণ দ্রুত
উন্মুখ মাটির মুখের কাছেই পাখা দু'টি খুলে যায়
উজ্জ্বল ছবিতে, ছাদের কার্নিশে, বারান্দায়, রাস্তায়
সমস্ত মানুষ মুগ্ধ পায়রার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে।
এই উপমা এখন পছন্দ করে না কেউ
সুঠাম নারীদেহ চিন্তায়, দেহের চাপে শিরার হিংস্রতায়
ছিন্নভিন্ন
মনে হয় একটা মৃত্যুর অধিকার মাতাল পুরুষের শরীরে
অন্তত পক্ষে একজন 'একাকী' প্রাণী সৃষ্টি হল আশেপাশে
হায়, বেশভূষা, পায়ের পাতা ক্ষতবিক্ষত শরীর
আরাম পায় কতো, প্রাচীন অভ্যাসে বিছানার ভীষণ
বাস্তব আলিঙ্গনে।
চিরকাল ঈশ্বর থেকে যাবে একাকী
হয়তো তার অস্তিত্বের মিথ্যা ভাবনাই আমার একক
বিশ্বাসের মর্মোদ্ধার করতে পারবে না।
শুধু হাত দু'টি ধরো দেখবে কি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ
রাজনীতিতে,
পায়ে পায়ে হেঁটে চলো নির্জন রাস্তায়
ফিস্‌ফিস্‌ শব্দে সাপও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়ে ছোবল
ফিরিয়ে নেবে,
এখন গাঢ় চুম্বন আলিঙ্গন সব পাশাপাশি থাক্
সময় অল্প মিথ্যা প্রমাণে সব মানুষই
ভীষণ অরণ্যে আস্তে হাঁটে।
'একাকী কেউ নেই' এই বোধের তাড়নায়
মানুষ নির্জন রাস্তায়, আমি আরও ঘনিষ্ঠ একাকী
দিন থেকে রাত, ঘর ছেড়ে পথ
তোমার অনিশ্চিত আশ্রয়ের দিনে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কলকাতাও সুখী হতে পারে

রাত একটায় কলকাতাকে আজো সুখী মনে হয়।
চৌরঙ্গীর অতিকায় নিয়ন সাম্রাজ্য নিভে গেলে
আউটরাম-ঘাটের গঙ্গা অনেকটা এগিয়ে আসে
চারপাশের বাড়িগুলিকে মনে হতে থাকে
জাহাজ, জোয়ার এলেই ভীষণ জোর সিটি দিয়ে বেরিয়ে পড়বে।
রাত একটার কলকাতার সমস্ত মানুষই যাত্রী
নিদ্রার ভিতরে স্বপ্নে, স্বপ্নের ভিতরে তেরো নদী
সাত সমুদ্রের নীল ডাক। আমি শব্দ, জেগে আছি,
ঘুমহীন আমি আজ সমস্ত কলকাতাকে একা
ছন্দের পাহারা দিচ্ছি; ঘুমাও শহর, শহরের ঈশ্বর; ঘুমাক তোমার ঐ
যন্ত্রসভ্য ট্রাম, পদাতিক রিক্‌শা, বাস ও লক্ষ্যণীয় মোটরশকট, আমি
চৌরঙ্গী রাস্তার মধ্যিখানেই শীতলপাটি বিছিয়ে বসেছি;
বাতাস, গঙ্গা ও রাতের নক্ষত্র ছাড়া
আর কেউ কথা বলছে না; ট্রাফিক-সিগন্যালে
সভ্যতার লাল নীল অভিমান নেই;
তাই কলকাতাকে সুতানুটি গোবিন্দপুরের মতোন প্রাচীন লাগছে। আমি কি এখন
পিচরাস্তা খুঁড়ে রজনীগন্ধা লাগিয়ে দেখবো যে
ভোরের আগেই ওই শুভ্র-সত্যবাদী ফুল ফুটে ওঠে কিনা!

রাত একটায় মনে হয় কলকাতাও সুখী হতে পারে।

মনোরমা সিংহরায়

সেই চিরন্তন

লিখে রাখবো শিলালিপি কবিতায় ছন্দ গেঁথে গেঁথে
একদিন তুমি ভালোবেসেছিলে।
তারপর ভগ্নস্তূপ শিলাময় শিল্পের সম্ভার
পড়ে থাকবে। তখন যদি বা কেউ এসে
দেখে আর বলে, হায়, প্রেম এতো কি ভঙ্গুর!
মনেও কোরো না কিছু শিক্ষা হবে তার।
যতোই করুক গবেষণা,
ভালোবেসে পুনরায় ব্যথার দোলায় দুলবে সে,
মিলে ও অমিলে
হয়তো বা গড়ে তুলবে আর একটি শিল্পের পাহাড়।।

শংকর দে

দু'টি কবিতা

১. পাতা কিংবা ফুল

পাতা কিংবা ফুল এ দু'য়ের বিচারেই আজ
তোমার কাছে যেতে হলো, ফুল কিংবা পাতায়
ঝরে পড়া, বৃষ্টিতেই, নির্বিচারেই আজ
তোমার কাছে যেতে চাই, কল্পতরু এ-দু'য়েরই প্রাণ।
সুখ কিংবা দুঃখ, এই দু'য়ের তুলনায় আজ
তোমাকেই জানাতে চাই, দুঃখেই ঝরে পড়া
সুখের দিনেই আজ তোমার কাছে যেতে হবে
আমি দুঃখী কিংবা সুখী মানুষের মধ্যেই একজন।

২. জানবে না।

হাতে কুষ্ঠ, চোখে ঘৃণা, ছুঁয়ে কি দেখবে না।
জলে গলে যাবে প্রাণ, ভুলে কি থাকবে না।
গাছে ছায়া বাঁধা তরী, বন্ধনে যাবে না
ভুলে থাকা মরুভূমি, আমাকে জানবে না।

শিবশম্ভু পাল

তাৎক্ষণিক অনুভূতিতে রচিত কয়েক লাইন

আমি দেখছি তোমার প্রোফাইল
সঙ্গোপনে এ পাশ থেকে কোণে
তুমি আমায় কয়েক শ' মাইল
দূরে নিয়ে ফেললে উপবনে
এ-সব কিচ্ছু জানো না।
তুমি আমায় ধরে রাখলে, বন্ধ
হয়ে গেল দোকানপাট ওদিকে
কোথায় ছিল এত ছড়ার ছন্দ
দরজা ভেঙে এল নানান প্রতীকে
এ-সব কিচ্ছু জানো না।
চলে গেলে, ভ্রমণ সেও যায়
তোমার খোঁপার কাঁটার পিছে পিছে
আমিও যাব যাবার জায়গায়
থাকলো শুধু পদ্য ত্বকের নীচে
এ-সব কিচ্ছু জানো না।

কল্যাণব্রত চক্রবর্তী

অবিকল চোখ বুজলে

অবিকল চোখ বুজলে বাঁদিকের অলস তারায়
কোথাও ভেতর থেকে সরু সরু রেখার মতোই
অনেকক্ষণ পড়ে থাকে; কে যেন একটা লোক
নিবস্ত্র পোশাকে ঢেকে এসব বিবর্ণ দৈর্ঘ
মশালে জড়িয়ে মাঠে সন্তর্পণে দৌড়ে চলে যায়।
কে যায় একটা লোক অবিকল মাঠেও তখন
কেউ থাকে না নিয়ত, শূন্য সহবাসে শুধু বিমান
নামবার মত প্রয়োজনহীন কিছু বিস্তৃত আওয়াজ
অন্ধকারে ক্রমাগত চূর্ণ হয়ে ভেঙে ভেঙে যায়।
মনে হয় এ সময়ে টেবিল ছুঁলেই একটা
ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে যাবে; বাইরে ওপাশে
ছাদে সম্প্রতি স্বর্গত কোন্ উর্বশীর গানের রেকর্ড
কেউ আদ্ধেক বাজিয়ে কৌতুহলে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।
আকস্মিক আলো নিবলে পরিচিত আমার ঘরেই
আমি প্রবল উৎসাহে, মেলে কবিতার শরীর, উপমা,
শব্দ কিছুই পারি না ছুঁতে, অবিকল চোখ বুজলে
মনে হয় চোখের তারায় কে যেন একটা লোক
নিবস্ত্র পোশাক পরে মশাল জড়িয়ে মাঠে
অবিকল দৌড়ে চলে যায়।

শিশির সামন্ত

চোখের নিকট

চোখের নিকট নেই রাজপ্রাসাদ, রয়েছে সাদা বাড়ি;
পেটা ঘড়ির হৃদয়ে ইস্কুল
দুপুরে কাঁপায় নির্জনতার গভীরতর নাড়ী,
বেলা শেষের উজানে যখন বালিকাদের ছুটি;
ভাঙা হাটে ছড়ানো স্বরবিতান
        সেখানে আমি হারিয়ে গেছি,
সেখানে যেন শিষমহল, ময়ূরমহল
        সাতমহলা, সিঁড়ি
রাজপ্রাসাদের খুলেছে দ্বার খুশীর মহল;
        ঢুকে পড়েছি হঠাৎ
চোখের নিকট রহস্যময় স্বপ্ন, সাদা বাড়ি।।

পীযূষ রাউত

লৌকিক আশ্রয়

আমার তুচ্ছ স্বপ্নগুলি লৌকিক নেশার মতো আমাকে
সর্বক্ষণ পেয়ে বসে; এই ধরুণ বাড়ি ফেরবার মুখে
এখন এই রাত বারোটায়! মনে পড়ে
সাদা শ্বেতপাথরের মতো সেই ইস্কুল বাড়ি,
আমার সমস্ত দুপুরের চিন্তাভাবনা দূর হ'লে
শহরের উপকণ্ঠে সূর্যাস্ত সময়ের শীতল কোনো
মন্দাক্রান্তা মাঠ,
অনূর্দ্ধ তিরিশের কোনো কোনো যুবতীর অনুষ্টুপ মুখ।
আমার চোখের উপর শেষ ট্রাম এখনো অনেক দূর।
স্টপেজের নরম আলোর নীচে দাঁড়িয়ে থেকে
জীবন তীর্থ দেখি চৌরঙ্গীর বুকে।
ঠিক ঐ সময় জীবনানন্দের মতো চলে যেতে ইচ্ছে করে
কোনো এক 'ধানসিঁড়ি নদীটির ধারে'।

তারপর বিকট জন্তুর মতো তিনচক্ষু ট্রাম
এসপ্ল্যানেডে ঢোকে।
মনে মনে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলি—সেই প্রকাণ্ড ছায়াবৃত
তেরোতলা বাড়িটি দূরে থাক। বাচ্চাকে বুকে টেনে,
আর্তনাদ বুকে চেপে কিংবা শরৎ বৃষ্টির মতো
কেঁদে কেঁদে এখন শুয়ে পড়ুক একান্ত বিশ্বাস্য আশ্রয়
তার প্রিয় বিছানায়।
বেহদ্দ মাতাল হয়ে ফিরে এসে যেন তাকে না দেখি
বসে আছে—হাঁটুর উপর তন্দ্রাবিজড়িত
কষ্টক্লান্ত মুখ।

গাড়িবারান্দায় জায়গা প্রচুর। এই কলকাতার অনেক
অনেক নিরাশ্রয় লোক নির্ভয়ে ঘুমুতে পারে।
হে আমার বিশ্বস্ত বন্ধু অর্জুন সিং, তোমাকে কাল
সিনেমার পয়সা দেবো,
একটু আশ্রয় দাও; রাত্রি তো শেষ হয়ে এলো।

সমীর রক্ষিত

নীলিমা মাথুর

ভেসো না আকাশে আর
কুসুমিত প্রাণের মতন
নীল নীল ব্যাপ্ত প্রতারণা।
নিশিদিন—
অকথিত অশান্ত বেদন
প্লাবিত হৃদয়ে ঝুরে প্রিয় অনুক্ষণ
কৃষ্ণপক্ষ নভোছায়া তীরে
মেঘ মেঘ তামসী যন্ত্রণা।
নিদাঘ নিখিলে
অবিরল ধারা—
শষ্পভূমি প্লাবিত গরলে
প্রতিকূল শ্যামলিমা।
চকিত বিদ্যুতে—
আমি আর ত্রিভঙ্গমুরারী নই
তুমি নও কদম্বের যৌবন গরিমা।
ভেসো না আকাশে আর
নীল নীল নীরক্ত প্রতিমা।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

মাতাল অবস্থায় আঠারো লাইন

ইচ্ছে করে নখের খোঁচায় চোখ দুটোকে অন্ধ করি
ইচ্ছে করে বুকের ভেতর জাপটে রাখি প্রাণেশ্বরী
এ-পিঠ ও-পিঠ হাত ঘুরালাম ও কার শাড়ি হাওয়ায় ভাসে
বুক জুড়ে কার সানাই বাজে এই বে-আদব চৈত্র মাসে
ইচ্ছে করে রকেট চড়ে চন্দ্রে গিয়ে বস্তি গড়ি
কেবল যদি সঙ্গে থাকো লক্ষ্মীসোনা প্রাণেশ্বরী।

জিহ্বা থেকে তৃষ্ণা দেখায় ভুরু নাচায় ডব্‌কা ছুঁড়ি
ভরন্ত এই দুপুরবেলায় বর্ষা হবে ইল্‌শেগুঁড়ি
ধনুর মতো পিঠ ভেজাবো? কী হবে আর গণ্ডগোলে
এই ভালো আজ সন্ধি করি শপথ করি ইচ্ছে হলে

সিঁথির উপর সতীপনা আয় মুছে দিই শালগ্রামে
মৃত্যু শুধু খাঁটি কথা রাবণ মারুক কিংবা রামে।
অনেক কিছু ইচ্ছে ছিলো পোষা কুকুর হয়ে থাকি
কিংবা তোমার অশ্বশালায় চিকন-সুরে চিঁহিঁ ডাকি
ময়না হয়ে রোজ দু'বেলা নাম শোনাবো কৃষ্ণ-রাধা
কিংবা যদি ইচ্ছে করো হতে পারি ধোপার গাধা
ময়লা ঘেঁটে ধন্য হবো মহাশয়া প্রণাম করি
একটু যদি মিষ্টি হাসো হাতের মুঠোয় প্রাণেশ্বরী।

প্রদীপ বিকাশ রায়

এমন সময়

ইদানিং বেশ কিছু স্বপ্ন দেখে ফেলছি রাতের শেষে
শেষরাত আমার বেশ কাজে লেগে যাচ্ছে ইদানিং
পথ থেকে ছেঁড়া কাগজ, পোড়াকাঠি যা কিছু তুলে নিচ্ছি
তাই ঘটনা, এত ঘটনা ঘটার ছিল পথের শেষে,
শেষপথে কাঁচ টুকরো হীরে হয়ে যায় জানা ছিল না।
বাতাসে অক্সিজেনের চাইতে প্রেমের ভাগ যদি বেশী
তবে বাতাস শ্মশানের দিকে এমন ছুটে যায় কেন?
তরঙ্গে ফসফরাসের চাইতে প্রেমের ভাগ যদি বেশী
তবে তরঙ্গ এমন পাড় ভাঙে কেন, প্রেম ভাঙে কেন?
আহা, প্রেম, পথের ধুলোয় প্রেম কুড়াতে দিয়ে
হাতের মুঠোয় ঈশ্বরের চালাকি চক্‌চক্‌ করে ওঠে।
বুক ভরে নিঃশ্বাস নেব বলে সমুদ্রের দিকে ছুটে যেতে
আমার মনে পড়ে নাগরিকদেরও একসময় দমবন্ধ হয়
এই দমবন্ধের ব্যাপারটা অনেকবার ঘটে যায় জীবনে —
কচি শিশুদের একটু জোরে বাতাস দিলে দমবন্ধ হয়,
একবার ডুব সাঁতারে জলের অনেক গভীরে গিয়ে
ভেসে ওঠার সময় আমার দম ফুরিয়ে গিয়েছিল;
এখন বুঝি এইসব ব্যাপারগুলো কিসের ইঙ্গিত।
ভেবেছিলুম, শস্য কুড়ানোর কাজে আরও কিছু দিন
বহাল রাখার জন্য ঈশ্বরের কাছে আমি চিঠি দেব;
কিন্তু চিঠি আমার দেওয়া হয় না, এখন একটুও
বসা যায় না, তাড়া করে কাকতাড়ুয়া এমন সময়।

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

নিসর্গের ভিতরে

একটা কিছু বলতে চাই বলে নির্জনে মেঘ ডেকে উঠলো
কতবার, ফুল ফুটলো বৃষ্টির পরে, হাওয়া
দুপুরবেলার কাশবনে দৌড়ে গেল গভীর স্বরে
একটা কিছু বলতে চেয়ে—
সে কোন্ কথা? সে কি সুখের? সে কি বিষাদের?
কেউ জানলো না।

বিশেষ কিছু দেখতে চাই বলে দিগন্তে চাঁদ ভেসে উঠলো
মাঝরাতে, মৃদু জ্যোৎস্না দৃষ্টির মতো ছড়িয়ে
পড়লো মাঠের পথে, নদী কৌতূহলে মুখ ফেরালে
বিশেষ কিছু দেখতে চেয়ে—
সে কোন্ দেখা? সে কি চোখের? সে কি হৃদয়ের?
কেউ জানলো না।

শুধু নিজের কথা নিজের দেখা নিয়ে মানুষের দিন গেলো।

দীপেন রায়

পথের যে কোনো মোড়

পথের যে কোনো মোড় আমার ভালো লাগে।
যে কোনো মোড়ের পথে তুমি আসতে পারো।
যে কোনো পথে তোমার সফল উপস্থিতির
গাঢ় সমাচার অনুভবে সাজিয়ে রেখেছি।
অজস্র নীলের জন্য অপরাধমূলক ব্যস্ততা—
পথের আকস্মিক রক্তাক্ত বেদনা
প্রতিরোধ করে রাখি গভীর আগ্রহে।

পথের যে কোনো মোড়ে আমার সুখ। চিন্তিত মুখের
সমগ্র রেখাগুলি আপাত সুদূর কোনো তারবার্তা
প্রেরণের সমারোহ। রক্তাক্ত হাতের উপর
প্রশ্নচিহ্নগুলি আত্মলুপ্ত চৈতন্যের স্মরণে বিস্তৃত।
—তুমি যে কোনো পথেই দ্বিধাহীন আসতে পারো।
আমি ঘর খুলে বাইরে আসি। নির্ঘুম নক্ষত্র

যেন রচনা করেছে তোমার আমার
ব্যবধান। পরস্পর সঞ্চারিত স্রোতের মিলন ভাবি
পথের যে কোনো মোড়। যে কোনো মোড়ের পথে
তুমি আসতে পারো। আমি ঘর খুলে
বাইরে আসি অনন্য প্রস্তাবে।

দীপংকর চক্রবর্তী

হে আমার সর্বনাশী

দৃশ্যাবলী মুগ্ধ থাক আপন স্বরূপে।
চতুর্দোলা কোথা গেল, স্বপ্ন প্রাণ তরঙ্গের মেলা
জাহাজ অথবা ঢেউ কোনোমতে বড় নয় মানুষের চেয়ে
সমুদ্র মৃত্তিকা নয়, আমি আর সমুদ্রে যাবো না।

বহুকাল অবিনাশ ছিন্নমূল রূঢ়তা দেখেছে।
বহুকাল বাহু তুলে ডেকেছে ঈশ্বর।
কোথায় ঈশ্বর তোর, ওরে মূঢ়, চেয়ে দ্যাখ আর্ত মানুষেরা
শস্যহীন ক্ষেতে শুয়ে।

হে আমার সর্বনাশী, মায়া দিয়ে কতকাল ঢাকিবি আকাশ?
ব্যঞ্জিত স্বরের রেখা কতকাল দোলাবে হৃদয়?
মনে মনে তরঙ্গেরা কতকাল করিবে ছলনা?
আর্তকণ্ঠ কতকাল ব্যথিবে আকাশ?

কে আজ সক্ষম বলো, ধান্যদূর্বা মঙ্গল কলস
নদী কেন অবিরত জলস্রোতে আমাকে জাগায়
পুষ্পবনে অন্ধকার, রিক্ত রাজধানী
বেদনার অগ্নিকোণে পদশব্দ কার?

রাজপথে জনপথে শতকের আলো অন্ধকার
শকুন্তলা, কোথা যাস্, অভিজ্ঞান যেন ঠিক থাকে।

অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়

হাওয়া, শুধু হাওয়া

আবার কেন জানতে চাওয়া, হাওয়া,
কেমন করে বইছে কোথা থেকে,
ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে চমকে উঠে বলা—
হঠাৎ কেন পথটি গেছে বেঁকে?
ডাকটিকিটের ছোট্ট বুকে একটুখানি ছাপে
হাত বাড়িয়ে বিশাল আকাশ ধরে,
তার চেয়ে যে অনেক ভালো জানলা খুলে দেখা
রোদের গায়ে মুগ্ধ বকুল ঝরে।
দু'ধারে ধানক্ষেতের মাঝে চরণ-চিহ্ন এঁকে
বৃত্ত ভেঙে আবার কেন যাওয়া?
সমস্ত মন উজাড় করে জড়িয়ে ধরার ছলে
এলোমেলো বইছে, যখন হাওয়া।

স্বপন সেনগুপ্ত

নিরাপত্তা চাই

আরবের তেজী ঘোড়া না পাঠালে
তোমার নেমন্তন্ন আমি—
        রাখতে পারি না ঈশ্বর।
বৃদ্ধা মায়ের মতো কারা সব দুয়ারে দুয়ারে;
প্রতারিত প্রণয়িনী, ধূর্ত যুবারা—
        অজস্র ঈর্ষার শর
সংগোপনে রেখেছে গেঁথে তূণের ভেতর।
পথে পথে পাওনাদার লালখাতা
খুলে ধরবে আমার সম্মুখে, আমি যে
কপট ছলনা করে এতোকাল বেঁচে আছি
মায়াবী দাবায়; জানাজানি হয়ে গেলে
পলায়ন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তুমি কি জানোনা ছাই
        অজস্র চিতার উপর আমার মমতা।

আরবের তেজীঘোড়া না পাঠালে
তোমার নেমন্তন্ন আমি—
রাখতে পারিনা ঈশ্বর!

শান্তনু ঘোষ

বিষ্ণু দে

শেষবেলার বিদায়ী ট্রেনের জানালায় উদ্ভাসিত অকস্মাৎ?
বৃষ্টিমালা দেখে আমি শব্দ তুলে নেমে গেছি
হাফলং হিল
কিন্তু নীরব চোখে বলতে পারিনি আমি সাহসভীত স্বরে
'এসো আমরা গোল হয়ে তোমাদের গান গাই'
ব্যালকনির পশ্চিমদিকে রাস্তার মিছিলে মিছিলে দেখেছি
মেঘদল, সজ্জিত সমুদ্র বাতাস, কিন্তু কোনোদিন নিজেকে
বারান্দার নিঃসঙ্গজাগা লণ্ঠনের আশ্রয়হীন ভাবতে পারিনি।
মধ্যে মধ্যে কোনোদিন কোনো মেহগনি সকালবেলায়
বিষ্ণু দে'র কবিতা চোখের অতলে চলে এলে, এই সমস্ত
স্মৃতি, বিস্ময় নুভ্যেলভাগ সিনেমার কম্পনে নৃত্য করে
মনে পড়ে যায় কতদিন ভালোবাসার প্রতিমার কাছাকাছি
পূর্ণ চোখ মেলিনি, মনে পড়ে
মধ্যহাওর দেখলে কতদিন নিজের অগোচরে ভয়
বিষ্ণু দে'র কবিতা মনে পড়লে মেহগনি সকাল সমস্ত কিছু
খুলে ফেলে, দেখায় খুলে খুলে।

শীতাংশু পাল

প্রবঞ্চক পিপাসার কথা

শুষ্কপথে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হলে হে সুজন
যখন অন্ধকার আসে,
বিশ্রামের প্রীতি স্মৃতিগুচ্ছে প্রবঞ্চক কাব্যের কুহকে
সোহাগী নারীর ঘ্রাণে পিপাসার কথা মনে হয়,
অন্ধকারে তীব্র পিপাসার কথা।
দুরন্ত পাতাল পর্যন্ত লোমশ সমস্ত শরীরের
বিভ্রান্তিকর যাতনায় ছায়াবাজী;

একান্ত বন্ধুদের সহযোগে দার্শনিক শবযাত্রায়
অন্য কোনো মহিয়সী নদীর জলে ডুব দিতে ইচ্ছা করি
ডুব দিতে বড় ইচ্ছা করি।
রোজ রাত জেগে জেগে যে দৃশ্য চোখের সামনে দেখি
হঠাৎ চন্দ্রসীমায় সারি সারি রূপকথাগুলি ঝুলতে দেখি
সাম্প্রতিক মানুষের দল রাজনীতি অর্থনীতি খাস পার্ক
বিজ্ঞাপনের বহুবর্ণে নিজেকে কেমন লাগে দেখি।
মস্তিষ্কের কারুকার্য্য দিয়ে অসম্ভব কল্পনার মত
বিচার সাপেক্ষ আয়োজন সব অঙ্ক করতে পারিনি
গৃহস্থালি মুছে দিয়ে নদীকে ঠিক ঢেউয়ে ঢেউয়ে
তরল হাসির লাবণ্যে কবিতার মত জাগাতে পারিনি
তাই শুষ্ক পথে হেঁটে হেঁটে স্মৃতিগুচ্ছে অন্ধকার এলে
প্রবঞ্চক পিপাসার কথা তীব্রভাবে মনে হয়, হে সুজন,
বড় তীব্রভাবে মনে হয়।

মানিক চক্রবর্তী

আশ্রয়

উন্মুক্ত প্রান্তর থেকে
কিছুটা নীরবতা ধার নিয়ে
আমি শুনি
হৃদয়ের অনুচ্চারিত সংলাপ :
বিবর্ণ শীতের রাতে আমি
খুঁজে নেবো আশ্রয়
পাখিদের কোমল উষ্ণতায়
আকাশের নীলিমা দিয়ে
ধূসর চোখেতে।
অনুক্ত আবেগ বিষণ্ণতায় কাঁদবে যখন
আমি চলে যাব
যেখানে বসন্তের বিকেল হাসে
উদার আকাশে।

তারাপদ রায়

প্রকৃতির প্রতিশোধ

যে কোনো সমুদ্র
আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়,
কুর্ণিশ করার ছলে
বারবার বালির উপরে।
কাদাজল থেকে কষ্ট করে উঠে দেখি
আমার রাজপোশাক
আমার সোনার মুকুট ঢেউয়ে ভেসে গেছে।
যে কোনো পাহাড় শ্রেণী
আমাকে দাঁত বের করে হেসে অভ্যর্থনা জানায়,
'আসুন, এইখানে আসুন।'
যতবার উঠতে চাই
পা পিছলে বরফে, পাথরে কাদায়
দাঁত বের করে পাহাড় শ্রেণী হেসে ওঠে।

নচিকেতা ভরদ্বাজ

প্রিয় বান্ধবী

কারো সঙ্গে তুমি একটিও কথা বল
আমার ভালোলাগে না।
কারো সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক থাকে
আমি চাই না।
কারো দৃষ্টি তোমাকে স্পর্শ করে
আমি সইতে পারি না।
আরক্ত একটি পদ্মের মতো তুমি শুধু
ফুটে থাকবে নীল আকাশের নীচে।
আর আমি সেই নীল নির্জন আকাশ হয়ে থাকব
তোমার চারিদিকে :
তোমার সর্বাঙ্গে আমার নীরব নীল
ভালোবাসার অলঙ্কার।
আমার ইচ্ছে করে সারাদিন সারারাত
তুমি শুধু আমার পাশে বসে থাক :

তোমার এক-একটি কথা এক-একটি নত নিঃশ্বাস
এক-একটি ফুল হয়ে
সময়ের স্রোতে ভেসে যায়।
তোমাকে দেখেই কেন যেন মনে হয়েছে আমার
তুমি শুধু আমার—একক আমারই শুধু
—আর কারো নয়।
লক্ষ কোটি যুগ ধরে তোমার আমার এই পরিচয়
এক আকাশের দুটি নক্ষত্র আমরা।
বিশুদ্ধ যৌবনে নন্দিত একটি তরুণ বৃক্ষের মত
পুষ্পে মুকুলে তোমার শাখায় পল্লবে
কত ঐশ্বর্যের অবাক সমারোহ!
তোমার চরিত্র, আরো কতো মানবিক অর্জনের আভিজাত্য
পলকাটা হীরের দ্যুতিতে
ঝলমল করে উঠছে তোমার সত্তার সর্বাবয়বে।
সবাই তোমাকে ভালোবাসে
পেতে চায় তোমাকে সবাই,
নাম ধরে ডাকে তোমাকে।
কিন্তু আমি ভাগ দিতে চাই না কাউকে এতটুকু
এমন কি তোমার মা'কেও আমার ঈর্ষা।
জীবনানন্দের নায়কের মত আমারও জিজ্ঞাসা
কী এত কথা ঐ সুন্দর যুবকের সঙ্গে?
কেন সবাই কুশল-প্রশ্ন করে তোমাকে?
অধ্যাপক কেন এগিয়ে আসে সাহায্য করতে?
—কাউকে আমার পছন্দ নয়, কাউকে না,
কাউকে সইতে পারি না আমি।
আমার অনুমতি ছাড়া
কেন ওরা সবাই 'তুমি' বলবে তোমাকে?
ভালো লাগে না আমার।
'আমি' ছাড়া কাউকে দিতে চাই না এই
—উজ্জ্বল অধিকারের ছাড়পত্র।
তুমি তো জানোনা আমার বুকের মধ্যে
আজ কত আকাশ ঝলসে উঠছে,
কত সমুদ্র গর্জন করে ফিরছে;

সব আকাশে একই মুখের মেলা,
একটি নামেরই মন্ত্র তরঙ্গিত সব সমুদ্রে।
—কত গোলাপ ফুটে উঠছে আমার মরু-অরণ্যে।
অথচ আশ্চর্য এই যে তুমি এসে বসেছ আমার কাছে
কথা বলছ আমার সঙ্গে কত মমতায়
এ যে আমার দুর্লভ অধিকার,
সুশ্রী একটি স্বপ্নের মত মনে হয় সব।
দু'দিন আগেও কি ভাবতে পেরেছি
এই সুদুর্লভ অধিকারের গৌরব
সম্রাটের মতো আমাকে পরিয়ে দেবে
এমন বিজয়ীর মুকুট।
এই যে তুমি বসে আছ আমার সামনে
কথা বলছ মৌসুমীর রহস্যে
তোমার চোখের দিকে চেয়ে
আনন্দে আবেগে ব্যথায়
সুখে স্বপ্নে অহংকারে
আমার দু'চোখ ভরে জল আসে;
মনে হয় ধন্য আমি।
ঐ যে তুমি আমার কাছে এলে
তুমি আমার সঙ্গে কথা বললে
নাম ধরে ডাকলে আমাকে
এত আনন্দ রাখতে পারি না বুকের মধ্যে,
এত সুখ, এত যন্ত্রণা—অনূদিত হয় চোখের জলে।
অকৃতার্থ আমাকে তুমি ধন্য করেছ
রূপহীন ভালোবাসার মহত্তম গৌরবে।
আমার সর্বাঙ্গে তোমার ভালোবাসার উত্তরীয়।
তুমি আজ আমার সর্বোত্তম বন্ধু
—আত্মার আত্মীয়।

কালীপদ কোঙার

মধুচক্র

বিকৃত ইচ্ছার ভারে সোঁদাগন্ধ রাতের উরুতে
কামিনী শরীর
নাসারন্ধ্র স্ফীত,
কতকাল পলাতক কলেজ গার্লের সেই
কজ্জলি বিকেল
ছলাকলা
আরো কত কি যে, যৌবনের রূপোলি সন্ধ্যায়
আজ ব্যর্থতায়
ডিঙি নৌকো উল্টে যাওয়া
অথৈ জলেতে মগ্ন কল্পনার তাসের প্রাসাদ।
গরুর গাড়ির মত ক্যাঁচ ক্যাঁচ অসহ্য জীবন
গতিহীন
সাতপাকে বাঁধা
সিঁদুরে শাঁখাতে বাঁধা, অতৃপ্তির ভীষণ নরক
চোরাগোপ্তা পথে
পঞ্চশর
রোমশ উৎসে প্রেম সোনার হরিণ।
অতঃপর মধুচক্র
মৌরাণী পরিবৃত
হাজার মধুপ বড় নির্বোধ এবং নিঃসহায়।

অজিত কুমার ভৌমিক

জন্মনিয়ন্ত্রণ

তোমার ধারালো নখের দিকে চেয়ে মনে হলো
বিশ্বাস এবং আত্মহত্যা তুমি পাচার করে ফেলছো
শেষবারের মতো—
তৈরী মানুষ ও সামাজিক সভ্যতা

এবং পৃথিবীর মতোই তুমি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছো যেন
মানুষের কথা ভেবে, করুণ নিঃশ্বাস এবং ঘুমে
তোমার গোলাপী অংশ দেখা যাচ্ছে অচেতন শাড়ি খুলে

উন্মোচিত দুঃখ এবং পাপ।
তোমার শরীরের ভেতর চমৎকার শরীর তৈরী হচ্ছে যেন
ক্রমশঃ ফাঁকা জাহাজ বন্দরে এসে ভিড়ছে
অসহিষ্ণু মানুষ এবং মানুষের ঈশ্বর—

জলের শব্দের মতো কিছু অবাস্তব দৃশ্য-গন্ধ-গানে
ভালোবাসা-পাণ্ডুলিপি ছিন্নভিন্ন হচ্ছে;
ছিন্নভিন্ন হচ্ছে।

বিমল দেব

দেউলিয়া

চৌরঙ্গীর বিলাসী কোলাহলে শোনা যায়
অরণ্য যন্ত্রণায় জীবনের সকরুণ আর্তনাদ।
নিয়ন আলো আজকাল বড় অসহ্য—পকেটে খুঁজি
স্যারিডন ট্যাবলেট।
ফিরিঙ্গি তরুণীর বন্ধুর দেহ
শরীরের শীতলতম অঙ্গে শুধু উত্তাপ জাগায়
এবং ইডেন-উদ্যানে প্রতিজোড়া নিকটতম প্রাণে
গুহাযুগীয় বিদ্রূপ : তুমি চরমভাবে ব্যর্থ;
কেননা, কল্প-মেরুপ্রদেশ থেকে সূর্যালোকে এলে
তুমি মৃত!

কবিতার মতো যার রূপ
গঙ্গাজলের মতো যার উত্তাল যৌবন
এবং আচরণ যার স্বরলিপির মতো
নবনীতা এক চাতক-যৌবনকে
চৈত্রের দুপুরে শীতলপাটি বিছিয়ে
তোমার দাওয়ায় দু'দণ্ড শুতে দিয়েছিলে।
অভিশপ্ত ঠিকুজি!
শান্তি পাইনি এই শীতল সুখনিদ্রায়।
নবনীতা, আমি দেউলিয়া, দেউলিয়া—
তোমার নরম বুকে মাথা রেখে শুনেছি,
সংখ্যাতীত বছর ধরে কিসের এক বয়লার জ্বলছে।
দেউলিয়া, দেউলিয়া—
তোমার বুকের সমস্ত বিষ চুষে নিয়ে
নবনীতা, বিশ্বাস করো, আমি আজ দেউলিয়া, দেউলিয়া।

জোনাকি : অক্টোবর। উনিশ শ' সাতষট্টি

'বর্তমানে বাংলা কবিতার বড় আশ্চর্য সময়।' কথাটিকে অস্বীকার করিতে পারেন এমন কোনো কবিতা পাঠক সম্ভবত এই ছ'এর দশকে খুব বেশী নেই। সারা বাংলাদেশ এবং বাংলা ভাষাভিত্তিক ত্রিপুরা ও কাছাড়ে কবিতা নিয়ে এতো হৈ চৈ, কবিতা নিয়ে কী বড় শহরে, কী ছোট শহরে সর্বত্রই যেন একটা সরগরম আবহাওয়া। এটা সুখের কথা, এটা আশার কথা এবং এটা অহংকারের কথাও বটে।

● ● ◖ 'জোনাকি'র বক্তব্য কী—এ সম্পর্কে কোনো কোনো কৌতুহলী পাঠক জানতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে গৌহাটী থেকে প্রকাশিত 'সময়' সাহিত্যপত্রের একটি ভাষ্য তুলে দিয়ে আমাদের মনোভাব ব্যক্ত করছি : 'আপনি যদি বিটনিক কবিদের অন্ধ পূজারী হয়ে থাকেন অথবা বিট কবিতার বিদ্বেষী তাহলে দয়া করে 'সময়' (এ ক্ষেত্রে জোনাকি) আপনি পড়বেন না।' এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা অতিরিক্ত যা কিছু জুড়ে দিতে পারি তা হলো—১) সুস্থ মনের শিল্প সৃষ্টি আমাদের একান্ত কাম্য। ২) প্রাচীন সৃষ্টির প্রতি যথাযোগ্য আন্তরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে তার থেকে পৃথক অথচ নোতুন কিছু প্রকাশ করা। ৩) এই সময়ের বাংলা সাহিত্যের খ্যাতি এবং অল্পখ্যাত কবিদের সঙ্গে নোতুন কবিদের পরিচয়-প্রসঙ্গ স্থাপন করা এবং এই উদ্দেশ্যে আমাদের কাগজকে বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরার কবিদের মিলনতীর্থ বলে মনে করি। ৪) সম্ভাবনা রয়েছে অথচ সুযোগ নেই এমন তরুণ কবিদের রচনাকে পাঠক-সমাজে পরিচিত করা। ৫) কোনো দলগত বিভেদকে প্রশ্রয় দিতে আমরা উৎসাহী নই; বলা যায় এমত ধারণার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহী। কারণ এটা স্বীকৃত সত্য যে, এ জাতীয় মনোভাব যথার্থ শিল্প সৃষ্টির পক্ষে এক বিরাট অন্তরায় বিশেষ।

● ● ◖ Standard-এর দোহাই দিয়ে কবিতা নির্বাচনে নির্মম হতে অনেকেই উপদেশ দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি সবিনয় নিবেদন, যে কোনো কাব্যশিল্পীর সাহিত্য জীবনের শুরুতে তথাকথিত Standard রচনা আশা করা কি খুবই সঙ্গত? আর Standard-এর প্রাচীর তুলে যদি সমালোচকদের প্রশংসালাভে পুলকিত হতে হয় তবে একটা বিরাট অবিচার করা হবে আগামী দিনের কবিদের প্রতি—যাঁদের রচনা আপাত অপরিণত অথচ পরিণতি লাভের সম্ভাবনায় যথেষ্ট প্রোজ্জ্বল।

শরৎ পর্য্যায় আশ্বিন তেরশ পঁচাত্তর—কবিতা কবিতা কবিতাপত্র

জোনাকি

আমি জোনাকি বলছি—

মহাশয়,
আমি কি? আমি কেন?
আমি অনিয়মিত কবিতা সংকলন।
আমি আপনার জন্য—আমি কবিতা প্রেমিকদের জন্য।

কবিতা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—

কবিতা কবির মানস জগতের এক
নৈষ্ঠিক ও একক ধ্বনি।
কোনো কৃত্রিম ভাবধারা এবং প্রকাশ
ভঙ্গিকে আমি মনেপ্রাণে অস্বীকার করি।
অস্বীকার করি অতীতের প্রথাবদ্ধ ফর্ম ও
বিষয়বস্তু এবং একমাত্র যৌনতাসর্বস্ব
অহংকারী চিৎকার।
আমার দৃষ্টি এক অপরিচিত এবং ভিন্নতর
জগতের কবিতার প্রতি। এ'শপথ আমার
আগামী দিনের
কোনো চিরাচরিত ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি
আমার নেই বলেই কোনো পাঠককে
প্রথাবদ্ধ গ্রাহক করার মূলত কোনো নীতি
আমি গ্রহণ করিনি। তবে আমার
অস্তিত্বরক্ষার অর্থকরী প্রয়োজনে আপনার
সপ্রীতি সহযোগিতা কামনা করি।

নমস্কার
জোনাকি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

... ... মনীষার নিজস্ব পথিক।

দিন নেই রাত নেই আমি শুধু একটি পাথর
এ-হাত ও-হাত করি
পা বাড়াই যে-হাতে পাথর
যেন সে-ই দূরদৃষ্টি, ভবিষ্যৎ
আমার কাপ্তেন
যে দিকে যাবেন, যাবো
আমি অবান্তর বই দাঁতে কেটে উঁইয়েব মতন
অক্ষম, পারি না যেতে
আমি শুধু চালকের চলা
যন্ত্র আমি, যন্ত্রের মতন
মনীষার নিজস্ব পথিক।

শংকর চট্টোপাধ্যায়
দীপেন রায়
শক্তিপদ ব্রহ্মচারী
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়
সুবন্ধু ভট্টাচার্য
মানিক চক্রবর্তী
শিশির সামন্ত
শীতাংশু পাল
বিজন চৌধুরী
স্বপন সেনগুপ্ত
দিলীপ কুমার বসু

পরেশ মণ্ডল
সুধীরেন্দ্র চক্রবর্তী
কাজল পুরকায়স্থ
প্রদীপ বিকাশ রায়
বিনোদ বেরা
রবীন সুর
বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য
জনেশ চাক্‌মা
জিতেন নাগ
বিমল দেব
পীযূষ রাউত
অরবিন্দ ভট্টাচার্য

শারদীয় জোনাকি

কবিতাপত্র

সংকলন : সাত।। আশ্বিন, তেরোশ পঁচাত্তর
সম্পাদক : পীযূষ রাউত
সহ-সম্পাদক : মানিক চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ (ব্লকসহ) ও অঙ্গসজ্জা : শিল্পী বিমল দেব

আমাদের কথা

জোনাকির একটি বিশেষ শুভ কামনা :

আসন্ন দুর্গোৎসবের নির্ভেজাল আনন্দ সমস্ত বিপন্নতা এবং বিষণ্ণতার জগৎ থেকে আপনাকে নির্বাসিত করুক। এবং সেই সঙ্গে সত্যিকারের সুখী ব্যক্তির গুণাবলীতে আপনাকে সে অন্বিত করুক।
জোনাকির অনিয়মিত প্রকাশ একদম অস্বাভাবিক নয় বলে দুঃখ করার কোনো মানে নেই। আর এই রকম দুঃখ প্রকাশ বিলাস ছাড়া অন্য কিছু না। তবে কবিতার পৃথিবীতে তুলকালাম কোনো কাণ্ড না ঘটালেও জোনাকি তার সুস্থ অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন। সুতরাং নিশ্চিত প্রতিজ্ঞা : জোনাকি বেরিয়েছিল, বেরোচ্ছে এবং বেরোবে।

জোনাকির অন্যতম সহ-সম্পাদক, কবি প্রদীপ বিকাশ রায় হঠাৎ করে বদলি নিয়ে তেলিয়ামুড়া চলে যাওয়াতে জোনাকি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ফলত, এমন দিনে তাঁর কথা খুব বেশী করে মনে পড়ছে।

জোনাকির অন্যতম একনিষ্ঠ কবি বিমল দেব সুদীর্ঘ পাঁচ বছর পর কোলকাতা সরকারী আর্টকলেজ থেকে কমার্শিয়াল আর্টে ডিপ্লোমা নিয়ে জোনাকির রাজ্যে আবার ফিরে এসেছেন বলে আমরা বিশেষভাবে আনন্দিত এবং তার এই কৃতিত্ব এখানে, এই কৈলাসহরে সম্পূর্ণ একক বলে আমরা গৌরব বোধ করছি।

শংকর চট্টোপাধ্যায়

সম্মোহন ⚫

তোমাকে যে ঘৃণা করব এমন ভালোবাসা কোথায়?
অথচ প্রত্যহ এক ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে
যেন পুরানো কোনো ঝর্ণা
কিন্তু নদী নয়
খুব গভীর থেকে গভীরে যাচ্ছে আমার ক্ষতবিক্ষত হাত
ছাই উড়িয়ে দেখছে
কাঁটা ঝোপের ভেতর।
উড়ছে বিজয় পতাকা তোমার।
যদি আমায় প্রশ্ন করো : তুমি কোথাকার কে হে,
ভালোবাসার কথা বলতে এসেছ?
তাহলে আমি তখন আমার মায়ের বিবাহের যৌতুকে পাওযা
ভাঙা তোরঙ্গটার কথা বলতে বাধ্য
আমি বলতে বাধ্য সেই ঝর্ণাটার কথা, স্থিরতা যাকে নদী হতে দেয়নি
আমার সেই দুঃখী ক্ষতস্থানটার কথা
সেই তিক্ত বিছানাটা, যেখানে আমি রোজ রাত্রে
একা শুয়ে থাকি
আমার মজবুত শরীরের সেই সব অকর্মণ্য
অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর কথা
আর যা তা তোমার না জানলেও ক্ষতি নেই।
তোমাকে যে ঘৃণা করব এমন ভালোবাসা কোথায়?
তুমি বললে; কোষ্ঠি বিচার করলে বলা যেতে পারত
ভেতরে ফাঁকি আছে কিনা?

পরেশ মণ্ডল

দক্ষিন্দরের মুখ ○

কাগজ ছিঁড়ে টুকরো
ভাঙা পাথরে পথ
বরফের গুঁড়ো বেয়ে সমুদ্র
বালির মধ্যে মরুভূমির মধ্যে ইতিহাস
কাজল অরণ্য গাছের রক্তে অমাবস্যা
পথিকের ছায়া মাড়ালে
একটুখানি চাতাল ছুঁয়ে
ত্রিভূজ মাপলে
আর মানচিত্র ফাঁকা রইল
কেউ ডাকল না
তাকাল না
পৃথিবীর নিচে চাপা পড়ল
দক্ষিন্দরের মুখ।

দীপেন রায়

কর্ণের লক্ষ্যভেদ ○

স্তবকে সাজানো ফুল আর সেই মহিলার মুখ
নিজস্ব নিভৃতে যাকে ইচ্ছা হলে পাওয়া যেত আজো।
কবিতার সমস্ত পংক্তিতে ভালোবাসা নিবেদন করে
ফেরা যেত এইখানে, যখন যেখানে খুশী।
ওই মহিলার জন্য কিছু রজনীগন্ধা কিনে ফিরে যেতে
সহসা বিমুখ ইচ্ছা, দ্রুত পায় পিছনের বিস্তৃত সিঁড়িতে,
অথচ তখন আমি একসঙ্গে হাজার ফুলের ভীড়
মনে মনে কল্পনা করেছি যেন সাজানো বাসর
উৎসবের শাড়ি পরে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত
অম্লান আলোর নীচে শায়িত রয়েছে।

মনে হ'ল কিছুমুখ ধারালো বিক্ষিপ্ত বড় ... ...
অজ্ঞাত কারণবশত কেউ ফিরে যেতে পারেনি সংসারে
অথচ প্রত্যেক পুরুষ-ইচ্ছা চেয়েছিল ফুলের স্তবক
নিজস্ব নিকটতর মহিলার জন্য কিছু সুস্থ ভালোবাসা।

ডব্লিউ. বি. ইয়েটস্

তার বলা উপত্যকা চোখ ভরেছিল সুন্দরীরা ●

আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম
এক উপত্যকায় ... ...
দীর্ঘশ্বাসের হাওয়ায় হাওয়ায়।
কারণ, জোড়া জোড়া দুই জোড়া সুখী প্রেমিক-প্রেমিকারা
চলে গেল
আমার পাশ দিয়ে,
এবং স্বপ্নে আমার হারানো ভালোবাসা চুপি চুপি দেখা দিল
সেই বনে,
সে যেন এলো আমার স্বপ্নজড়িত নিমীলিত চোখের 'পর
তার মেঘ-বিবর্ণ চোখের পাতা ফেলে।
আমি স্বপ্নে চীৎকার করে উঠলাম এই বলে—
নারী, তোমাদের হাঁটুর 'পর যুবকদের
মাথা রাখবার এতটুকু ঠাঁই দাও—তোমাদের কুন্তলে
তাদের চোখ পথভ্রান্ত হোক (ডুবে যাক)
অথবা তাদের (নারীদের) স্মরণ রেখে তারা
কোনো চারুমুখ দেখবে না
যতক্ষণ পৃথিবীর সব উপত্যকাগুলো শুকিয়ে গেছে।

*('He Tells of a Valley full of Lovers' কবিতার অনুবাদ।।
অনুবাদক : সুধীরেন্দ্র চক্রবর্তী)*

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

মেয়েমানুষের জন্য কয়েক লাইন ০

কোনো কোনো মেয়ে নাকি আঁতালেকচুয়েল
শাঁসেজলে পরিপুষ্ট, বস্তুত সে ঝুনো-নারিকেল
অন্তরে গর্ভিনী সে-ও, দাঁড়েবদ্ধ অসম্ভব পাখা
সিঁদুরে সন্তানে সতী, মণিবন্ধে সোহাগের শাঁখা
বৃথাই নাচালি সখি, বিনামদে তুমিও মাতাল
হাইকোর্ট দেখাবে বলে কতবার সেজেছি বাঙাল
মেয়েরা তো ছেলে নয়, নিতান্তই ওরা মেয়েছেলে
অলস মধ্যাহ্নে সখা পেটিকোটে দাগ রেখে গেলে।
সামান্য গৃহস্থকন্যা উদার আলস্যে ডেকে বলে,
'এসো, চাবি হয়ে থাকো, বেঁধে রেখে ঘোরাবো আঁচলে'.
নারিকেলবৃন্ত থেকে ঘুরে আসি চাবির গোছায
প্রতিটি ঘুমের শেষে দিনেকের পরমায়ু চুরি হয়ে যায়
সব তুচ্ছ হয়ে পড়ে চাবির সাম্রাজ্যে বনি রাজা
নারিকেল খসে গেলে রামার দোকানে টানি গাঁজা।

কাজল পুরকায়স্থ

অপেক্ষিত ০

উঠোনের একপাশে ভোরের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকা
শীত শীত কিছুটা আড়ষ্ট সময়।
লেপের ভেতরে ঢুকে শব্দগুলো অপেক্ষিত অনেকদিন,
একবার গভীর করে চিনে নেওয়া
ছেলেবেলা পড়ে আসা ঋতুগুলো
শীতের উঠোনেই দাঁড়িয়ে কে যেন বলেছিল
আগামী ঋতুতেই
নিকানো উঠোনে বাসর হবে।
সেই থেকে অপেক্ষিত, কিছুটা লালফুল
চুলের খোঁপায় গেঁথে দেওয়ার একান্ত বাসনা।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

উচিত ছিলনা ●

গৌতম, আমি এনেছি তোমার জন্য নতুন
তমসার রীতি; জ্যোতির্ময় তো অনেক বলা
হলো, এসো আজ পাখির ভাষায় কথা বলি। শুধু
ধ্বনি শুধু প্রিয় পৃথিবীতে এসে বেড়িয়ে, ফেরার
আগে জেনে আর জানিয়ে যাওয়া যে ভাষা যথেষ্ট
নয়; গৌতম তুমিতো অনেক জানো, তুমি একা
বোধির খেয়ানে দ্রুমমূলে স্থির বসে থেকে দ্রুত
ভ্রমণ করেছো জন্মান্তর, তিন শূন্যের
যা কিছু পুণ্য; তবু কি শিখালে? কি শিখেছে ওই
মর্ত মানুষ। খাঁটি যৌবনে যুবা ও যুবতী
আধ ঘণ্টার নর্ম আঁধারে একটি কথাও
না বলে কেবল বিপরীত মেরু প্রবাস যাপনে
যা পেয়েছে তাকি জনমের মতো নতুন মৃত্যু,
ভালবাসা নয়? নির্বাণহীন শুদ্ধশরণ
ভাষা খোঁজা নয়? কি জানি কে জানে এই লাখ লাখ
শব্দশতক, মানুষের এই লেখা খেলা শেখা
কিসের জন্য? ঠিক কোন প্রিয় প্রয়োজনে আজো
বারবার পাখি রোদ গাছপালা মানুষের কাছে
ধর্মের মতো চলে আসে, আর আমরা পাখির
রোদের, গাছের কোনো সঙ্কেত চিনতে না পেরে
লিখি—যা লেখার নয়, যেন ঠিক
উচিত ছিলনা প্রকাশ্যে লেখা তমসার এই
গৌণ স্ফুরণ, ভালবাসা লেখা উচিত ছিলনা।

প্রদীপ বিকাশ রায়

আমি যাই ০

গাড়িটা সান্টিং করছে
একটুকু ফাঁক
কি যেন ফেলে এসেছি
আমি যাই।

মা'র কাছে যেতে
মা'র পায়ে আলতা নেই বলে
মা'কে ঠিক মা-মা লাগছে না।
বাবার ফেলে যাওয়া
গড়গড়িটা দেখিয়ে
মা আমার কি যেন বললে
আমি বুঝলাম না।

লাল গাইটাকে
অবেলায় গোয়ালে যেতে দেখে
বোঝা গেল বৃষ্টি হবে।

মা'র চোখ ভরা মেঘ
বাইরে টুপ্‌টাপ্‌ বৃষ্টি
চোখ মুছতে রুমালের জন্য
পকেটে হাত দিতেই
টিকিট উঠে আসে মা
আমি যাই ... ...

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টির পরে কোনো গোলাপের প্রতি ০

করুণ জলের মতো স্পষ্ট জলরেখা তোর চোখে
কেনরে গোলাপ? তুই কেঁদেছিস কার কথা ভেবে?
কার ছল ভালোবাসা যন্ত্রণা দিয়েছে তোর মনে?

চঞ্চল প্রণয় পাখি কিছুক্ষণ ডালে বসে দোলা
দেবে আর উড়ে যাবে—সেই তার বিখ্যাত স্বভাব;
তবে কেন অভিমানে জীবন বিষণ্ণ করে তোলা?
পুরোনো স্মৃতির দিকে পথ চেয়ে নেই কোনো লাভ!

চোখের সমস্ত জল মুছে ফেলে, রূপালী আলোকে
তাকিয়ে এখন দ্যাখ, কে আবার অন্য দোলা দেবে!
হৃদয় বিস্মিত হবে দ্বিতীয় নতুন শিহরণে!

বিনোদ বেরা

জন্ম ও প্রণয়

বারংবার জন্ম দেয় তোমার প্রণয়, বারংবার
শৈশবের কুঁড়ি থেকে যৌবনের বিকশিত ফুলে
নবীন আনন্দে আমি খুশিভরে উঠি মৃদুদুলে
অবশেষে ঝরে যাই আরক্তিম ঔদাস্যে তোমার।
সবুজ কোরকে বৃন্তে ফুটে ওঠা প্রার্থিত আমার
প্রতি নক্ষত্রে ও তৃণে ওরূপ বিম্বিত করে তুলি,
যাবতীয় অন্ধকার দিগন্তগুলিকে যাই ভুলি
বাজে রক্তে উতরোল অবিরল ঝর্ণার ঝংকার।

বারংবার জন্মবটে শাখায় পল্লবে, কুসুমের
আয়োজন অভ্যর্থনা করে আনে নবীন ফাল্গুন,
ব্যক্ত হয় পৃথিবীর ভালোবাসা—রূপের আগুন:
জাগরণ ঘটে প্রাণে টুটে যায় মৌতাত ঘুমের।
তোমার প্রণয় জানি পারম্পর্যবিহীন স্বপ্ন না,
সুখী রূপান্তর, গাঢ় আনন্দিত জন্মের যন্ত্রণা।

সুবন্ধু ভট্টাচার্য

আলো-আঁধারি ○

ঘরের মাঝে ঠিকরে পড়ে আলো
পায়রা-ডাকা ঘুলঘুলিটা দিয়ে;
দরজা বন্ধ জানালা বন্ধ তবু
আলো নাচছে সাদা দেয়াল জুড়ে।
সারা দুপুর হেলায় ফেলায় কাটে;
তোমার দু'টি চক্ষু, মুখের আদল
মানসপটে হঠাৎ ভেসে ওঠে;
টুকরো ভাঙা কথাও মনে পড়ে।
দরজা বন্ধ জানলা বন্ধ থাক;
নইলে যে ঘর আলোয় ভরে যাবে;
তাহলে এই আবছা আলো-আঁধার
মনের মাঝে ধন্দ জাগাবেনা।
সব কিছু কি প্রকট হওয়া ভালো?
তোমারই সব কিছু কি ভালোলাগে?

রবীন সুর

সম্প্রতি ○

অপ্রেমের ইতিহাস নক্ষত্রের স্থিরতা পেয়েছে।
একদা শায়কবিদ্ধ মৃত সব পাখির ক্রন্দন,
অপমৃত প্রতিভার চিতাভস্মে সমস্ত যৌবন,
আলোর পালকে আজ ক্লান্তিকর স্মৃতির বৃশ্চিক।

যেহেতু হিতৈষী বন্ধু ব্যক্তিগত বিলাপ বিরোধী
ফিকির সেজেছে সিংহ, উদ্যোগের পরিণাম ঘৃণা;
শিষ্টাচার, নিষ্ঠা-প্রেম, করুণার সান্দ্র আলোড়ন
সহজে প্রচ্ছদ জেনে ভোলা যায় যন্ত্রণার বীণা।

অফিস যাবার ট্রেনে পার্শ্ববর্তী মহিলার মুখে
সহজাত প্রসন্নতা প্রেরণার মত কোনোদিন
চৈত্রের আকাশ তুমি কৃষ্ণচূড়া পলাশ শিমুলে;
নীলিমা প্লাবিত রৌদ্রে ঘুরে মরে মায়াবী মারীচ!

অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার অনুবর্তী আক্ষেপের মত
অন্ধকার চেতনায় অন্ধকার জাগে ক্রমাগত।

মানিক চক্রবর্তী

ঠিকানা জানতে চাই ০

ভেবেছিলাম মৃগয়া করতে গিয়ে
পানের গ্লাসে বনের গন্ধ
পান করবো আমি।
অকস্মাৎ দেখি সামনে আমার
বনের প্রান্তে রয়েছে লেখা
'বনে হরিণ নেই'—কথাটা শুধু
দুয়ো দিচ্ছে আমায়
'তোমার রাজ্যের ঠিকানা কি হে বাপু?'

অপমানিত দু'চোখ ভরা প্রত্যাশা আমার
ফিরে এলো তাই,
হৃদয়ের কাছে প্রশ্ন নিয়ে
দাঁড়িয়ে আছি আমি
আমার রাজ্যের ঠিকানা জানতে চাই।

বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

হারানো চাবির জন্য ●

জানি জ্যোৎস্নার মত তুমি জ্যোৎস্নায় ভিজে ভিজে উন্মোচিত
শঙ্খের মতো বুকে আমাকে ডাক দিয়ে গেছ,
তবু এখনো তুমি সম্পূর্ণ অপরিচিত,
রেলগাড়ির মত লোকগুলোর সাথে আমি পরিমিত মূল্যের কথা বলি,
তাদের কাছেও আমি অপরিচিত। এপাশ কিংবা ওপাশের
একটা দরজা যদি খোলা যেত তবে কি সুপুরি গাছের মতো
বৃষ্টি আর জ্যোৎস্নায়
সমানভাবে ভিজতাম, তবে কি মানুষের মতো চেহারার
লোকগুলোর সাথে আমার টিকিট থাকত না?

ডুবোজাহাজ ছাড়াও কিছু কিছু জাহাজ আজকাল ডুবে ডুবে চলতে পারে,
মানুষ ছাড়াও কিছু কিছু মানুষ যখন আশেপাশে
পাতা সাজিয়ে তোলে তখন নিঃসঙ্গ অতীত নিয়ে
সুপুরিগাছের মতো অপেক্ষায় সমান্তরাল যদি কেউ উঠে আসে
শেষ পতাকাটি সম্ভবত মেলে ধরা যাবে।

হাড়গিলা পাখিটার কথা তোমাকে বলা হয়নি, জেগে থাকা প্রতিটি
মুহূর্ত নিয়ে তাকে আমি দুশ্চিন্তায় জলাজমির পাশে
পায়চারি করতে দেখেছি, পৃথিবীর সবচেয়ে কুশ্রী পাখিটা
চিন্তাশীল পদক্ষেপে হারানো চাবির জন্য, বারবার
দীর্ঘ ঠোঁট মাটির কাছে নিয়ে গেছে, সে যেন বাউলের পোশাক পরা
বৃদ্ধের মতো চিন্তায় আত্মস্থ হয়েছিল।

এখন থেকে বৃষ্টি এবং জ্যোৎস্নায় সুপুরিগাছের মতো
দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই
কারণ উন্মোচিত শঙ্খের মতো বুকে
তুমি নাকি জ্যোৎস্নায় ডাক দিয়ে যাবে।

শিশির সামন্ত

মহাশয় আপনি বলুন ○

মহাশয় আপনি বলুন; মানুষ কি হয়ে যাচ্ছে
সবাই নিহত আজ মানবীর নামে!
মহাশয় আপনি বলুন;
উত্তর-চল্লিশে এসে আড়চোখে কেন আজ বিড়ি ফুঁকে
সম্মুখেতে যদি থাকে বেশ্যালয়; সেদিকে তাকান!
কোনো কোনো বেশ্যা জানি লোকালয় হতে ভালো, মিশে থাকে
হাটবাজারেতে, তেলের লাইনে কিংবা হকার্স কর্ণারে।
অনুযোগে নাকছাবি খুলে ফেলে কখনো গৃহিনী
গা ঘেঁষে দাঁড়াবে; তবে মহাশয় আপনি বলুন
কেন আজ ছিপ্ ফেলে কচি নাতনির বুকে রাঘব বোয়াল
ধরতে চান, মহাশয় আপনি বলুন
সঙ্গমকালীন কোনো নারীর মুখের মতো অমন প্রতিমা
দেখেছেন কিনা; শুধুমাত্র আপনিই এ বিষয়ে কোনো
প্রমাণ পারেন দিতে, পবিত্রতা, তারও উর্দ্ধে পবিত্রতা
এবং নারীর দেহ যেন বা দেবায়তন।
মহাশয় আপনি বলুন; সশরীরে ঘুরে এসে নিরুদ্দেশ
নৌবিহারে বেটাল টালমাটাল, বিছানা বালিশ, শেষে
চাদরে গড়ায় এই প্রতিমার ধ্বজাচূড়া, ছিন্ন চাঁদমালা,
গিলে-হাতা, কোস্তাপাড়, আপাতত চাদর ঝাড়ুন
মহাশয় এবার বলুন
সবাই নিহত আজ হয় নাকি মানবীর নামে।

জনেশ চাকমা

শৈশব মানেই নীল টেরিকটের পকেট ◎

হাত খুলে মার হিজিবিজি মুখ, কবোষ্ণ হৃদয় একদা হারিয়ে গিয়েছিলো
কোনো উপত্যকায় বাবার মুখ।
এখন মনে হয়,
বাল্যসাথী দীপা, সবুজ মারবেল ভগ্নপুতুলের পা
বর্ণবোধ ছবির পড়া
একদা ভালবাসার হারিয়ে যাওয়া নীল পাখিটা—
সমস্ত শৈশবটাই নিগূঢ় জলটুঙির মতো
তত্ত্বকথা দিয়ে ঢাকা।
এমন যেন চেনা নাবিক
নোঙরের করুণ ইমেজ; চিত্রার্পিত
নগর আলোক, বন্দর চলে যায়
কবোষ্ণ ভিলেন পুরস্কৃত নর্তকীর ড্রেনপাইপের
আড়ালে।
কোনো তরুণী নাবিক সহযোগে হেঁটে যায়
হেঁটে যায় এক পেয়ালা রোদ ওদের মুখে।
অথচ :
ঈশ্বর মানে ঠাকুমা'র অবধারিত দেবতার ঘর।

শীতাংশু পাল

মগ্ন অনুভবে ◎

আমার অবিন্যস্ত ছিন্ন অনুভবগুলি তাসের মতো
রাজারাণী মিল করে সাজাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে গেছি।
কেবল খুঁজছি কোনো কৃষ্ণাক্ষি নদীর জলে
ভ্রাম্যমান ভালবাসা আছে।

রাজকন্যার বয়সের মতো তাড়াতাড়ি দিন চলে যায়
আকাশকে ফাঁকি দিয়ে দিন যায় দিন।
সদ্য মুকুলিত মানুষের মিলিত উৎসবে
মমতার মতো হৃদয়ের বহু কাছাকাছি দ্রুত তালে
পদ্মগন্ধী কোমল শরীরে লীন হওয়া যায়
মগ্ন অনুভবে নিদ্রার গভীরে গিয়ে
পাখিদের গান শোনা যায়।

জিতেন নাগ

কবিতা তোমাকে দেওয়া হলোনা ●

কথা দিয়েছিলাম চাঁদের আলোয় কিছু স্বীকারোক্তি
টগবগে নিভৃত সংলাপ, কিছু ভয়ংকর কবিতার
উত্তরাধিকার তোমাকে দিয়ে যাবো।
দানপত্র স্বাক্ষরিত ছিল।
কিন্তু তুমি বন্ধ্যা দুঃসময়ের মতো নিষ্ফলা
বাচাল যুবতী।
তুমি বলছো আমার প্রতিশ্রুতি, হাঁটুজলে আমার শপথ,
আমার কবিতা।
আসলে আমি এবং আমার মতো যারা প্রতিশ্রুতি খেলাপ করে
বাড়ি ফিরেই আবার প্রতিশ্রুত হয়।
আসলে প্রতিশ্রুতি মানে কি প্রেম?
মানে শরীর নিয়ে খেলা? আমি জানিনা।
আমি কবিতা ছাড়া কারো কাছে প্রতিশ্রুত বলে মনে পড়েনা।
দুঃখ করোনা তুমি বন্ধ্যা, তুমি নিষ্ফলা।
দুঃখ করোনা কবিতা তোমাকে দেওয়া হলোনা।

পল ভালেরি

আরণ্যক ○

আমরা দু'জনে পবিত্র কোনো প্রসঙ্গ
ভেবে ভেবে পথ দিয়ে পাশাপাশি
হাতে হাত ধরে হাঁটছিলাম, স্তব্ধ
নির্বাক।... ... চারদিকে প্রগাঢ় ফুলেরা।
নবীন বাগদত্ত
যুগলের মতো একাকী আমরা
হেঁটে বেড়াচিছলাম সবুজ রাত্রির
মাঠে আর পাড়ছিলাম দু'জনে
কল্পলোকের মায়াফল জ্যোৎস্নামাতাল
রাতের বনে বনে।
আর তারপর দু'জনে শ্যাওলায়
শুয়ে শবের মতো পাথর।
অতিদূর, মর্মরিত অরণ্যের
অন্তরঙ্গ নির্জন নম্র ছায়া, ছড়ানো
শিয়রে।
শীর্ষাকাশে অঢেল আলো, আলো;
হঠাৎ আবিষ্কৃত হলাম,
অশ্রুলিপ্ত দু'জনেই প্রিয় আমার নির্জনতার
সখা!

'Le Bois Amical' *-এর সি.এফ. ম্যাকইন্টায়ার ও জেমস্ লাফ্লিন-কৃত অনুবাদ* 'The friendly wood' *-এর অনুবাদ।*
অনুবাদক : বিজন চৌধুরী

বিমল দেব

শরতের এক শেফালীফুল রাত ●

আমি চেয়েছিলুম—
শরতের এক শেফালীফুল-রাত।

শিশু-পৃথিবী চৌরংগীতে
কোন অতলান্ত ইচ্ছায়
ভাসতে ভাসতে
বহুদিন আমি
ভাসতে ভাসতে
আপিসের ট্রামযাত্রীর মতো
যে কোন অপমৃত্যুর সুতোয়
ঝুলতে ঝুলতে
বড়ো ব্যাকুলতায়
আমি চেয়েছিলুম—
শরতের এক শেফালীফুল-রাত।

কতোদিন
রাত্রির নরম আঁচলে শুয়ে
আকাশে আকাশে আমি
এমব্রয়ডারী করেছি
গ্রহ-তারা-নক্ষত্র।
রিক্শ'র শেষ টুন্টুন্ থেমে গেলে
উজ্জ্বল জানালাগুলো নিভে গেলে
থেমে গেলে
নিভে গেলে
আর লেবুতলা পার্ক নয়,
আমি চেয়েছিলুম—
শরতের এক শেফালী-ফুল রাত।

স্বপন সেনগুপ্ত

এক একদিন ০

এক একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে
অনেক কথা মনে পড়ে যায়,
মনে পড়ে :
প্রবাসী বন্ধুর চিঠি ডাকবাক্সে
ফেলা হয়নি, কোথায় যাবার কথা ছিল,
কোথায় কোন মহিয়সী নারী
নেমন্তন্ন করেছিল কিনা!
পাপোষটা রোদে দিয়ে আনা হয়নি
সারারাত মাখামাখি শিশির শীতলে
কে যেন আসবে বলে আসেনি দুপুরে
ঘুমিয়ে গেলে জাগাতে আমায়
বারণ করেছি বলে পর্দার জঠরে কেউ
রাখেনি শীতল হাত

এক একদিন ঘুমুতে পারিনে মাঝরাতে
চারপাশে গভীর ফাটল, পোড়াবালি, নুন—
জলধারা দেখিনি বহুদিন হাওয়ার হোটেল খুলে
দারুণ পিপাসা! তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও
তখন
কারো শীতল হাত পর্দার জঠর ঠেলে
জাগাবে না জলধারা

ম্যাজিকটা আসলে ট্রাংক থেকে বেরিয়ে আসার
ম্যাজিক। সেন্টের শিশিটা টপহ্যাট-এ ছুঁইয়ে নেওয়া।
কত বড় একটা ভোজসভার নিমন্ত্রণ।

What about your job? about your result?

হাত পেতে দিয়ো বর্ষায়
দিতে পারি কিছু দৈন্য,
দুর্গের লোহা-দুয়ারে
পাবে বাসনার সৈন্য।

যেমন বর্ষা পুরাতন,
নাগকেশরেরা তেন্নি।
দুর্গই শুধু উড়ন্ত,
সৈন্যরা বাড়ে সংখ্যায়।

বর্ষায় ফোটে পুষ্প
উদ্যানে ফোটে পুষ্প
বাসনায় ফোটে পুষ্প
উদ্যানে ফোটে দুর্গ

ছন্দ, পুষ্প, লৌহ
এরা সব ছিল বাল্য,
এরা ছিল গতকল্য
এখন দেখেছি যুদ্ধ
উরুর পুলিশ বিদ্রূপ পায়ে নিতান্ত দেখে যুগান্ত,
দুর্গই শুধু মর্গে মর্গে ঘুমন্ত।
সৈন্যরা বাড়ে সংখ্যায়
সৈন্যরা বাড়ে সংখ্যায়।

আলোচনা—অরবিন্দ ভট্টাচার্য

কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ○

প্রতিচ্ছবি : সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বমন্দির প্রকাশনী। সাহেবান বাগিচা, কলিকাতা-২৮। মূল্য-একটাকা।
অনুভূতি-নক্ষত্র-শিশির : সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃতি।
৪৭, কাঁকুড়গাছি রোড, কলিকাতা-৫৪, মূল্য · ২টাকা।
স্মৃতি প্রতিমার মুখ : তাপস শীল, নান্দীমুখ প্রকাশনী।
ধলেশ্বর আগরতলা, ত্রিপুরা। মূল্য : তিনটাকা।
'প্রতিচ্ছবি' সনৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'অনুভূতি-নক্ষত্র-শিশির' দ্বিতীয়। রুচিসম্পন্ন দু'খানি সার্থক কাব্যগ্রন্থে লেখকের স্পর্শকাতর মন, শব্দচয়ন, রচনাকৌশল ও ছন্দ-বিন্যাস সার্থকভাবে ধরা পড়েছে। 'প্রতিচ্ছবি'র সঙ্গে তুলনায় 'অনুভূতি-নক্ষত্র-শিশির'-এর কভার ও ছাপা অধিকতর পরিচ্ছন্ন।
তাপস শীলের 'স্মৃতি প্রতিমার মুখ' সম্ভবত কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। কাব্যগ্রন্থটি কবিব স্বকীয় ভঙ্গিমায় সার্থকভাবে উপস্থিত হয়েছে। কবিতাগুলিব বচনাকাল ১৯৬৭। কোনো কোনো কবিতায় কবির উৎকট আধুনিকতা ভালো লাগেনি এ৬'়া ছাপা এবং প্রচ্ছদ প্রশংসার দাবি রাখে।

কয়েকটি পত্রপত্রিকা ○

হাংরি জেনারেশন/ক্ষুধিত প্রজন্ম নং ৯৯।। সম্পাদক : মলয় রায়চৌধুরী। দরিয়াপুর, বাঁকিপুব, পাটনা। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

হাংরি জেনারেশনের সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গিমায় কাগজখানি মৌলিকত্বের দাবি করতে পারে। কতিপয় পাঠকসমাজে তার আবেদন দস্তুরমতো সাড়া জাগাবে। কবিদের মধ্যে রয়েছেন—মলয় রায়চৌধুরী, সুবিমল বসাক, প্রদীপ চৌধুরী, দেবী রায়, বাসুদেব দাসগুপ্ত ও অন্যান্য।

Letters/Letters, Edited by Tridib Mitra.
এ-ধরণে পত্র-সংকলন সম্পূর্ণ অভিনব। মলয় রায়চৌধুরীর উদ্দেশ্যে পত্রগুলো রচিত। লিখেছেন—Allen Ginsberg, Robert Kelly, Howard Mccord প্রমুখ শিল্পীরা।

বুজ : সম্পাদক : শম্ভু রক্ষিত। ১১, ঠাকুরদাস দত্ত প্রথম লেন। হাওড়া-১। মূল্য : ২৫ পয়সা।

বুজ কাগজটি নির্ভেজাল হাংরি কাগজ নয়। কেননা, মলয় রায়চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, দেবী রায়, সুবিমল বসাকের নামের পাশে শুদ্ধসত্ত্ব বসু, নচিকেতা ভরদ্বাজ, শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরাও উপস্থিত। কাগজটির গ্যাট-আপ মোটামুটি মন্দ নয়।

দিলীপ কুমার বসু

কবিতার আত্মা ০

কবিতার আত্মা কবিতার আত্মা কবিতার আত্মা কবিতার—সহস্রবার চেষ্টা হয়েছে। তবু কবিতার সংজ্ঞা নিরূপণ সম্ভব হয়নি। কবিতার কয়েকটা বড় মুশকিল আছে। প্রথম, কবিতায় একটা ধ্বনির দিক রয়েছে। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ আর ধ্বনি প্রায়শই দুই ভিন্ন দিকে আমাদেরকে টানাটানি করে।

দ্বিতীয়ত, কবিতায় ছবির দিকটা নিয়েও সমস্যা। এখন, কবিতায়, অর্থাৎ শব্দে, দু'ভাবে ছবির উদ্ভব হয়। শব্দের আড়ালে একটা ছবি আছে। বইয়ের পাতায় ছাপা শব্দটাও একটা ছবি। 'উটের গ্রীবার মত নিস্তব্ধতা' বা 'সেই পুকুরটা' বললে পরেই যেমন মনে মনে একটা ছবি ভেসে ওঠে, তেমনি ঐ পংক্তিগুলোয় যে সব শব্দ রয়েছে, তা সবই কাগজের ওপর কালি দিয়ে আঁকা। এই দ্বিতীয় অর্থে শব্দের 'ছবি'কে ইদানিং বেশ ব্যবহারও করা হয়েছে কবিতায়। কামিংস খুব করেছেন। কিম্বা, ধরুন, 'নদী ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর' এপারে যাওয়া ওপারে আসা।'

কবিতার ছবি আর অর্থও লড়াই লাগিয়ে দিতে পারে।

কবিতা শুধু ধ্বনি অর্থাৎ সঙ্গীত হয়ে না পারে থাকতে, না পারে চরিতার্থ হতে। অর্থবহ শব্দ সাজিয়ে কবিতা।

কবিতা শুধু কালির রেখা বা আলপনা নয়।

কবিতা শুধু ছবি তৈরী করে না পারে থাকতে, না পারে চরিতার্থ হতে। অর্থবহ শব্দ সাজিয়ে কবিতা।

তাহলে কবিতা কি? কবিতার প্রাণ কি রয়েছে ধ্বনি, রেখা, চিত্রকল্প আর অর্থের চতুরঙ্গ সমাহার দ্বন্দ্বে? তা মনে হতে পারে।

তবু এটা নিতান্তই শরীরতত্ত্বের কথা হল।

অন্য কয়কটা জিনিস আলোচনা করা যাক্।

যেমন, শব্দ ব্যাপারটা কি?

চারভাবে শব্দ বাঁচে। উক্ত শব্দ, শ্রুত শব্দ, লিখিত শব্দ ও পঠিত শব্দ। উচ্চারণ এবং শ্রবণ, হস্তাক্ষর ও দৃষ্টি সবসময় এবং সকলের এক নয়। কবিতা আবৃত্তির সময়ও কবিতা, শ্রোতার কাছেও তাই; লিখছি যখন তখনও, পাঠকেরাও কবিতাই পড়েন।

কবিদেরকে অনুরোধ, বাদ দিন তাহলে আলপনা আঁকা, পাইকারপরে স্মল পাইকা সাজিয়ে নদীকে ক্ষীণতর করার চেষ্টাটা শুধুমাত্র চাতুরী, দায়িত্ব এড়ানো। আবৃত্তিকার আর শ্রোতার কাছে এর ফাঁকিটুকু ধরা পড়বে। শব্দের দৃষ্টিগ্রাহ্য ছবি কবিতার প্রাণের অঙ্গীভূত নয়।

মাঝে ফাঁকের ব্যবহার তো দেখি বাদ দেওয়াই যাবে না। তাহলে কবিতায় স্তবক, পংক্তি কিছুই থাকেনা। একটানা কতকগুলো শব্দই হতে হয় তাহলে কবিতাকে। কেউ বলতে পারেন বিশুদ্ধ কবিতার তাতে ক্ষতি হ'ল না। এমন কবিতাও তো লেখা হয়েছে যাতে স্তবক, পংক্তি, যতি, অর্ধযতি কিছুই নেই। সঙ্গীতের অনধিকার প্রবেশ বন্ধ হোক কবিতায়। মুছে যাক অনুপ্রাস।

এমন মনে হ'লে এবারে খেয়াল করতে হবে যে, শব্দের অর্থ দুই ধরণের, বাচ্যার্থ ও ভাবার্থ, অভিধা ও ব্যঞ্জনা। বিরামবিহীন ধ্বনিবিযুক্ত শব্দের পর শব্দ না তৈরী করে বাক্যের অভিধা, না ডেকে আনে ব্যঞ্জনা।

চিত্রলতার কারণে নয়, সঙ্গীতময়তার জন্যই থাক ফাঁক, যতি, পংক্তি অনুপ্রাস। আর সঙ্গীতই ডেকে আনে ব্যঞ্জনাকে, শুধু অভিধার সসীমতার অভিশাপ থেকে ব্যঞ্জনার অসীমে দেয় মুক্তি। মাত্র যুক্তির ভাষাকে নিশ্চয়ই কবিতা বলব না।

আরো মনে রাখতে হবে, শব্দে শব্দে ফাঁককে অন্তত অস্বীকার করা চলে না। শব্দ নিয়েই যখন কবিতা লেখা, তখন ফাঁক এড়ানো গোড়া থেকেই অসম্ভব। প্রতিটি শব্দের যদি আলাদা অর্থ থাকে, ফাঁকেরও অর্থ আছে, ফাঁক অর্থবহ। স্তবক ইতাদি অর্থবহ।

বলা বা শোনা, লেখা বা দেখা যাই হোক, ফাঁক অসুবিধার সৃষ্টি করেনা।

ছবির কথাটা এখানে ধরা যাক্। প্রতিটি শব্দের গোড়ায় রয়েছে অভিজ্ঞতা। প্রতিটি শব্দের আড়ালে একটি ছবি থাকবেই, ব্যক্তিগত বা বস্তুগত। শব্দ থাকলে ছবি থাকাও অনিবার্য। 'রজনীগন্ধার আড়ালে কি যেন কাঁপে/কি যেন কাঁপে পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতায়।'

অর্থাৎ,

ছবি আঁকা কবিতায় অনিবার্য, কিন্তু ছবি আঁকা কবিতার লক্ষ্য নয়। ধ্বনি কবিতার থাকবেই, কিন্তু সংগীত হওয়া কবিতার লক্ষ্য নয়। বিশেষ করে হাতেলেখা-চোখেদেখা কবিতার ধ্বনি নেই। সেই একই কবিতা, কিন্তু আলপনা সেখানে এক কাজ করছে যা

অন্যসময় ধ্বনি করছিল।

ছবি আর ধ্বনি তা'হলে কবিতায় আছে, যা আছে তা আছেই। আলপনা আর ধ্বনি আছে উপায় হয়ে। উদ্দেশ্য অন্য।

শব্দের ফলে যে ছবি, চিত্রকল্প, তা অন্তত উদ্দেশ্য নয়। যেহেতু এ ছবির রঙগুলো কখনোই প্রত্যক্ষ নয়, রঙ-এর নাম দেয়া থাকলেও (অনেক কমলা রঙের রোদ) নয়, ছবি এখানে ভাবনার পথের বাহন।

কবিতার উদ্দেশ্য কি? সঙ্গীত আর ছবির কতকগুলো গুণ অবলম্বন করে এগোলে পরে বাচ্যার্থে শেষ হওয়া যায়না। বাচ্যার্থ সঙ্গীত আর ছবিকে দূরে সরিয়ে রাখে।

বাকী রইল ব্যঞ্জনা। ভাবলোকে পৌছে যেতে হবে।

কবিতার শরীরের ব্যাখ্যা শেষ অবধি কবিতাকে ব্যাখ্যা করেনা। শব্দবন্ধের সঙ্গে জড়িত ধ্বনি, চিত্র ইত্যাদি। এবং অর্থ।

কোনোটাই কবিতার লক্ষ্য নয। শব্দে কবিতা নেই। শব্দের ফলে কবিতা। 'হেথা নয, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।'

ছাপা হ'ল যে কবিতাটা তা গাইড। সেটাকে তাজমহল ভাবলে ভুল করব। শেষ বিচারে শব্দ নিয়ে কবিতা নয়। শব্দ দিযে কবিতা।

ব্রাউনিং-এর 'Last Ride Together'-ই হোক্ বা কীটস্ এর 'Ode to the Nightingale' ই হোক্ বা রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'—সবই আমাদেরকে একই জাযগায পৌছে দেয—'পরম, নির্বিশেষ' কাব্যে।

● শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ● নিতাই আচার্য ● মনোরমা সিংহরায় ● পূরবী রাউত ● কালীপদ কোঙার
● কমল রায়চৌধুরী ● বিমল দেব ● দিলীপ কুমার বসু ● রবীন সুর ● অমর নাথ বসু
● হরিশংকর প্রামাণিক ● মানিক চক্রবর্তী ● বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য ● স্বপন সেনগুপ্ত
● অরবিন্দ ভট্টাচার্য ● প্রদীপ বিকাশ রায় ● আদিনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ● পীযূষ রাউত

কবিতা সংকলন '৭৬ বাং

কবিতা-পত্র—জোনাকি

সংকলন—আট
আত্মপ্রকাশ—জানুয়ারী : ১৯৭০
পরিকল্পক, প্রকাশক এবং সম্পাদক—পীযূষ রাউত
পূর্ববর্তী ঠিকানা : পূর্ব গোবিন্দপুর, কৈলাসহর, ত্রিপুরা
বর্তমান ঠিকানা : কল্যাণপুর খোয়াই, ত্রিপুরা
প্রচ্ছদ এবং ব্লক—শিল্পী বিমল দেব
দেখাশোনা—প্রশান্ত ধর
ছেপেছেন—রীণা প্রিন্‌টিং ওয়ার্কস্‌, আগরতলা, ত্রিপুরা
মূল্য—পঁচাত্তর পয়সা।

পরিচিতি

বক্তব্য

জোনাকি এই নিয়ে আট সংখ্যা বেরুলো ... ... একদা ত্রৈমাসিক বলে উল্লেখিত হলেও মুখ্যত অনিয়মিত সংখ্যারূপেই এর আত্মপ্রকাশ ... বলা বাহুল্য জোনাকিই ত্রিপুরার সর্বপ্রথম কবিতার কাগজ এবং যেটা আজ অব্দি বহাল তবিয়তে টিকে আছে ... প্রথম আত্মপ্রকাশ—১৯৬৩-র মে মাস .... সম্পাদকের ঠিকানাবদল মানেই জোনাকিরও ঠিকানাবদল .... ঠিকানা অধুনাখ্যাত কল্যাণপুর ... ডাকঘর কল্যাণপুর ... খোয়াই ... ত্রিপুরা ... সহযোগী সম্পাদক মানিক চক্রবর্তী এখান থেকে বহুদূরে ... ফলত প্রত্যক্ষ যোগাযোগের একান্ত অভাব ... সুতরাং সহযোগী সম্পাদকের পদটি খামোকা খামোকা রাখার কোনো মানে নেই .... তবে জোনাকি পূর্ববর্তী সহসম্পাদক প্রদীপ বিকাশ রায় ... মানিক চক্রবর্তী ... এবং অন্যান্য সতীর্থের নিকট ঋণী ... . জোনাকির শরীর গঠনে ওদের পরিশ্রম আকাশছোঁয়া ... খুবই আশা করা যাচ্ছে জোনাকি মাসিক কবিতার কাগজ ছাপ এঁটে শীগ্‌গিরই বেরুবে ... কবিতা সম্পর্কে কড়া নির্বাচন হবে ... নির্দ্বিধায় বলা যায়, কবিতা ভালো না হলে প্রকাশিত হবেনা ... তবে নোতুন কবিদের (এখনো যারা সাধারণ মানের কবিতা লেখেন) জন্য বিশেষ সংখ্যা মাঝে মধ্যে প্রকাশিত হবে ... পূর্ব পাকিস্তানের কবিদের সংগে যোগাযোগের প্রস্তুতি চলছে ... কারণ রাজনীতির বাইরে আমরা বস্তুত একই ভাষাভাষীর কবি ... আ-মরি বাংলা ভাষাই আমাদের প্রকাশ-মাধ্যম ... জোনাকি-গোষ্ঠীর মানিক চক্রবর্তী ... বিমল দেব ... অরবিন্দ ভট্টাচার্য কৈলাসহর থেকে 'ত্রিভুজ' বার করছেন ... প্রয়াস সু-সার্থক ... উল্লেখ করা দরকার ... জোনাকি স্রেফ কবিতার কাগজ ... ত্রিভুজ গল্প-কবিতার ... উভয় উভয়ের সহযোগী ... যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং যাঁরা সহযোগী তাঁদেরকেও ... ... ।

কবিতাকবিতাকবিতাকবিতাকবিতা

জোনাকি

জানুয়ারী উনিশশো সত্তর

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

শূন্যতায় সে বিষম ফাঁকি

কে তুমি? উত্তর নেই। শব্দ ছুঁড়ি তোমার উদ্দেশ্যে
ফুলের বিকল্পে শব্দ, আরাধনা শেষে কতদিন
তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারিনি ... ...
কেবল স্বদেশে
পরিতাপহীন শোক, হাঁটু গেড়ে যত প্রদক্ষিণ
পূর্ণ হয়, থুতনি বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম
পরিশুদ্ধ করতলে বৃত হও ...
কি তোমার, কি তোমার নাম?
স্বয়ম্ভু প্রাসাদমালা ভেঙে দিতে পেরেছি একাকী
পূর্ণতোয়া নদী, গ্রাম, উত্তরের নক্ষত্র মেধাবী
সব ভেসে যায় রক্তে, শূন্যতায় ... ...
সে বিষম ফাঁকি
তোমার সহেনা, তুমি ছুঁড়ে দাও প্রাসাদের চাবি
পরিশুদ্ধ প্রসন্নতা, আরাধনা শেষে কতদিন
কে তুমি? উত্তর নেই, শব্দমালা করে প্রদক্ষিণ।

নিতাই আচার্য

যে লোকটি

যে লোকটি কাল-রাতে নেশা করে
স্বতঃস্ফূর্ত নির্ঝরিণী
ক্ষোভ-কামনা-হিংস্রতার মুখর প্রতীক—
দিনের আলোয় সে মৃত।
অথচ,—লোকটা মন্দ ছিলোনা
চেনা-অচেনা ভীড়ে উৎকৃষ্ট উপমা
পিতার গর্বের, মাতার চোখের মণি।
অথচ,—পাহাড়ের কোল বেয়ে চলতে চলতে
সমতলে হঠাৎই একটা বাঁক—
দেখো ভানুমতীর খেল।
কর্মফল একেই নাকি বলে!
অথচ,—কোন্ এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে
যে লোকটি কাল রাতে নেশা করে
স্বতঃস্ফূর্ত নির্ঝরিণী—
ক্ষোভ-কামনা-হিংস্রতার মূর্ত প্রতীক—
দিনের আলোয় সে মৃত।
অথচ ... ...।

মনোরমা সিংহ রায়

মাটির কাছাকাছি

দু'মুঠো জোনাকি নিয়ে ছড়িয়ে দিলাম আমি ঘাসের ভিতরে।
একপাশে গোলাপের বন, একরাশি ফুল সেথা প্রস্ফুটিত
আপন বিলাসে। ম্লান জ্যোৎস্না সেখানে পড়েছে, আমার শরীরে
তার কিছু মায়া। নভোচারিতার সুখ কখনো হবেনা তাই
হে তারা, দূর থেকে দেখি আর মুগ্ধ হয়ে প্রণাম জানাই।
জোনাকি আমার কাছে। তারা যে আপন এ মাটির, ভীত
নয়, স্ফীত নয় অহংকারে। দু'মুঠো জোনাকি ধরি আর ধীরে
ছেড়ে দিই। মাটির সুন্দর গন্ধ পাই, গন্ধ পাই বনজ লতার,
মনে হয় জ্যোৎস্না ধোয়া ঘাস হয়ে থাকি। হে তারকা, শোনো, শোনো,
দূর থেকে রূপশ্রী খণ্ডিত নীলাকাশ কী সুন্দর মনে হয়,
তারো চেয়ে এ আমার মাটির পৃথিবী আরো প্রিয় মনোহরা।
ভালোবাসি পৃথিবীকে সুখে দুঃখে এ আমার সকল ভোলানো।

পূরবী রাউত

পর্দার আড়ালে

আমি চঞ্চল। লিখতে গেলেও পারিনা।
ভারী পর্দার আড়ালে আমি লুক্কায়িত অন্ধকারে;
আলোর ছোঁয়া একটুও নেই।
বেরিয়ে যেতে চাই ঝকঝকে আলোতে।
অথচ, ভারী পর্দা; টেনে নিলেও সরেনা।
আড়াল, শুধু আড়াল। নজরে পড়েনা কিছু।
একদিন হয়তো হালকা বাতাসে পর্দা
উড়ে চলে যাবে—আড়ালে থাকবে না।
আর কিছু; আমি শান্ত হয়ে যাবো,
খুলে যাবে পর্দার দ্বার লেখার আড়ালে।

কালীপদ কোঙার

সেই অবস্থা

সেই অবস্থায় নিজেকে সুখী এবং
অপরকে দুঃখী বলে ভাবতে পারা যায়,
নিজে এরোপ্লেনের মতো
শূন্যে ইচ্ছেমতো ভাসতে পারা মন্দ কি।

সেই অবস্থায় নিজেকে সর্বশক্তিমান অথবা
ভীষণ দুর্বল বলে ভাবতে পারা যায়,
বিধি নিষেধের জানলার রেলিং গলে
স্বেচ্ছামতো এদিক-ওদিক যাওয়া যায়।

সেই অবস্থায় পৃথিবীর সবরকম
ভালো ভালো ভাবনা ভাবতে ইচ্ছে করে,
অথবা ভয়ানক নিষ্ঠুরতা অশ্বের হ্রেষার মতো
হাওয়ায় হাওয়ায় তীব্র আস্ফালন করে।

কেবলমাত্র সেই চরম অবস্থা পেলেই
মামুলি মানুষ শাহান শা' হয়ে যায়।

কমল রায়চৌধুরী

তুমি সম্পর্কিত

অবিকল ঝাপসা হয়ে গেছো
ঠাকুরঘরের মতো ঠাণ্ডা তোমার মুখে
বোশেখের সে উত্তাপ নেই।

তোমার শব্দগুলো বিষাদের রুগ্ন
কবে যেনো—
কবে যেনো—নিজস্ব আকাশ,
আত্মীয় মেঘেরাও তার হদিশ দিলো না।

তোমার নিটোল রূপ
কোনো দরদী গানের ভাঙা রেকর্ড যেন কবে।

পৃথিবীর সব ফুল, সব কাব্য, সব গান
সব শব্দ, সব কান্না
তোমার উত্তর খুঁজে হঠাৎ কখন
হাঁফ ছেড়ে দিলো।

কবে যেনো চলে গেছো—
আমার অন্ধকার পিছে ফেলে।

বিমল দেব

দুরারোগ্য ব্যাধি

জানেন ডাক্তারবাবু,
বুকটা একবার একস্-রে করে দেখুন
বোধ হয় কোন দুরারোগ্য ব্যাধি।

সারারাত অরণ্য আর রাত্রির গন্ধ নিয়ে
আউট সিগন্যালে থেমে গেছে
দূরাগত মেলট্রেন—অদূরে স্টেশন।
চোখের মণিতে নীল শহর
ক্রমাগত ক্লান্তিতে ধূসর
প্রতীক্ষায় অবসন্ন জিরাফের শরীর,
দিদিমার ফ্রেস্কো দেখি
মা'র অজন্তার মুখে।
সব রং ফিঁকে করে
স্টেশনের লোকালয় দূরে সরে গেলে
আপনজন ক্রমাগত শূন্যতে মিলায়—
মেঘের পাহাড়ে জাগে আদিবাসী-মুখ।

অথচ আমি সমুদ্র হতে গিয়ে
ক্রমে হ্রদ হয়ে গেছি।

দিলীপ কুমার বসু

অনুভব

অনুভব করি আয়নার মধ্যে আমি বিচলিত।
ধীর অগুন্‌তি মহিষের মিছিলের তলায়
আমি পিষ্ট ও আহত হচ্ছি। মাঝে মাঝে
ভেংচাই নিজেকে। পয়সা দিয়ে বাজারে
কেনা যায় রাজহাঁস। কিন্তু সারা গড়িয়াহাট জুড়ে
রকমারি প্রিন্‌টেড শাড়ি ও পাউডারের
গন্ধের মধ্যে আমার চেনা নিজস্ব ছবিটা
বিদীর্ণ হলুদ শালিখের মতো ঝোলে ও
শটিবন। কোনো মেয়ের শরীরের গন্ধ আমি
পাইনা। ঘাসের রসের মত যার স্বেদ সে'ই বা
কোথায়?

রবীন সুর

জন্মদিনে মৃত্যুদিন মৃত্যুদিনে জন্মদিন

জন্মদিনে মৃত্যুদিন মৃত্যুদিনে জন্মদিন আবহমানের
কেন মৃত্যু
কয়েকটি প্রজন্ম ঘুরে দূরে দূরে মহাজাগতিক
পরিমণ্ডলের সব গোচর চিন্তার ধ্রুব উজ্জীবনে
মৃত্যুকে বাঁচায় কেউ
অন্যজন্ম জন্মান্তর গ্রহ উপগ্রহে
কি রকম জন্মদিনে
মৃত্যুদিন রত্নেশ্বর জানে
আমি তার কবিতায় একবার আরব্ধ দর্শনে
চিরায়ত সত্যটিকে উপভোগ করার ঋণের
কৃতজ্ঞতা জানাবার সময়ের তীক্ষ্ণ আবিষ্কার
বারংবার উদ্ধৃতির
অন্বেষণে কোথাও না-গিয়ে
কতবার জেনে যাই লোকায়ত
প্রতিটি জন্মই মৃত্যু
প্রতিবার অনিবার্য মৃত্যুর ভিতর
লোকোত্তর জন্মের আবহ
মরণের গুপ্ত ভ্রূণে
বনস্পতি ব্যাপ্ত ডালপালা
শ্যাম সমারোহ
আবহমানের মৃত্যু জন্ম ক্রমাগত রৌদ্রে রৌদ্রে প্রাণের উৎসব।

অমরনাথ বসু

নিজস্ব সংলাপ

আমি একজন কবি, আমার নিজস্ব সত্তার অনুভূতি বল এক এবং অবিনশ্বর
আমার হৃৎপিণ্ডে গিঁথে আছে জ্বলন্ত পাথরের টুকরো
আমি প্রথম আদিম এবং পৃথিবীর শেষ কবি।
আমার মেরুদাঁড়ায় চেপে ধরে আছে দীর্ঘতম ঝড় বিদ্যুৎ
ভয়ংকর ঐশ্বরিক রণোন্মাদনা আমার রক্তে রক্তে ক্ষুধার সামগ্রী
এই দেখ্ ভালবাসার নিষ্ঠুর প্রহসন আমার হাতের মুঠোয়
আমিই ঈশ্বরের প্রতীক; আমার কবিতা প্রতিটি মানুষের
এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি। আমি আকাশের এক প্রান্ত থেকে
অপর প্রান্তে ছুটে চলি আর সামনের অবশিষ্ট যা কিছু
পায়ের তলায় মিশিয়ে দিই। আমি এখন কাউকেই বিশ্বাস করিনা,
বিশ্বাস আমার পাপ বিশ্বাস আমার ফুস্‌ফুসের অসুস্থ জ্বালা
তাছাড়া পৃথিবীর প্রতিটি পুরুষ মানুষই এখন কুকুরের সামিল
আর নারীরা এখন গর্তের কেউটে; সময় সময় গর্জন তোলে
আসলে আমি সব চীজকেই জেনে গেছি,
এখন শুধু এক দীর্ঘতম প্রতীক্ষার অপেক্ষায় আছি
আমার আত্মার একটা কুঁচো টুকরো আজও কোনো কাজ পাইনি।

হরিশংকর প্রামাণিক

চলমান পা দু'টো

মনে পড়ে সমুদ্রসৈকতে পা ফেলে ফেলে
বালিতে বালিতে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে
সেই ঝুলন্ত বিকেলে।
ঢেউ এর 'পরে ঢেউ—একটানা ঢেউ—
আলোড়ন, আর্তনাদ, বিহ্বলতা
পায়ের তলায় অনেক ঝিনুক মুক্তোর ওলট-পালট
আর, সর্বনাশা চঞ্চলতা।
আজকের যাত্রায় তাহলে বিদায়।
আজ আর সমুদ্র-স্নান করবো না, জোয়ারের
বিস্তারও দেখব না। অদূরেই
এক মহুয়ার রাতের কথা ভাবি ... ...
কেননা, মন অঙ্গীকারে আবদ্ধ
হাত ছেড়ে একটু ঘুমাই তা'হলে।
ঘুম ভেঙে না হয় দেখব—
এই ঢেউ, চঞ্চলতা নিয়েই দেখব
বিপরীত ঢেউয়ে ভেঙেছে পাড়,
আলোকিত পথে অজানা অন্ধকার, আর তার ভিতর
তোমার পা দু'টো ঠিক তেমনি চলমান।

মানিক চক্রবর্তী

চিড়িয়াখানায় সতীরা ধূসর

ছেলেবেলায় রাত্রির আকাশ থেকে
একটুকরো তারাকে খসে পড়তে দেখলে
মা আমাদের পঞ্চসতীর নাম নিতে বলতেন
আমরা সুবোধ ছেলেরা সব মনে মনে তাই করে যেতাম।
অধুনা আমরা আর তারা পড়াকে তারা পড়া বলিনা
উল্কাপাতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়
পঞ্চসতী আর মায়ের চোখ
কেমন যেন ঘোলাটে দেখায়।
ভিড়ের চাপে নেতিয়ে যাওয়া
ঘাম জবজবে বাস থেকে
আদর্শ সতীরা এখন দূরেতে ধূসর
কিংবা ফিউজ কেটে নিভে যাওয়া নিয়ন আলোয়
চায়ের বিরাট পেয়ালা এখন
শূন্যগর্ভ ফ্যাকাশে দেখায়।

পান্‌সে মুখে দেখি
মায়ের বলা সতীরা তাই
বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে ঝিমোয়।
ন্যাপথালিনের গন্ধ ওঠা বাক্‌স-পেটরা নিয়ে
বসে থাকেন মা
অথচ আমাদের কিছু বলেন না এখন।

তারা আর সতীদের কাছে যাবার
মহাকাশের বেলুন আমাদের ফেটে গেছে
চুপ্‌সে গিয়ে তা পড়ে আছে
বিরাট এক চিড়িয়াখানায়।
লোহার জালের বেড়া দেওয়া
লাঞ্ছিত ঘাসের বাগানে
আমরা জিরাফের মতো
আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে
শুধু শুকনো ঘাস নির্বিকার চিবোই।

মায়ের কোল থেকে ছেলেবেলা আমাদের
হাততালি দিয়ে বলে
দেখো, মা দেখো, কী সুন্দর জিরাফ!

বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

ছইয়ের ভেতর কি গুপ্তধন

একটা কিছু আঁকড়ে ধরার আগ্রহটাই দিক্‌বিদিকে,
'ডুবছে নাও, ডুবিয়ে যাও'—এমন ছোঁয়াছুঁয়ির খেলায়
কে দেখল আর কে দেখল না, কথাটা থাক,
জেনে গেলেও বলেনা কেউ, অভ্যাসে সব সভ্য এখন।
বুকের ভেতর লুকালে মুখ, তেমনি ভীষণ শক্ত মাটি
আটকে যাবে, ফসল ফলার দিনেও খুঁজি কোথায় জল
আর কোথায় নিশান।
বিস্তারিত ব্যবহারের তথ্য চাইলে মনে থাকেনা,
মনে থাকেনা কারণ সেও তো আমারই এক জীবনযাপন।
দেখা পেলে মাঝিকে কি ডেকে বলতাম, 'নৌকো ভিড়াও,
উসকে দাও আলোর ফিতা, ছইয়ের ভেতর কি গুপ্তধন?'

স্বপন সেনগুপ্ত

চারপাশে একা

আমার চারপাশে চারটে মস্ত
দেয়াল ঘড়ি; পায়ের নীচে
প্রলম্বিত ছায়া
একটু শুধু ঝলকানি চাই—
হাওয়া
আমি যাতে আমায় ভুলে থাকি।

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

অনেক রাত্রি অনেক আলো

প্রায়শ—
চিড়িয়াখানার একফালি আকাশে
বুনো হাঁস সাদা পায়রা দেখা দেয়,
রূপালী ঢেউ তুলে
নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের বুকে।
তারপর হঠাৎ এক শিকারী আসে,
চৌরঙ্গীর বাতিগুলি নিভে যায়,
শ্মশানের স্তব্ধতা নামে
ফুটপাতের অলিতে গলিতে।

প্রায়শ—
বর্ষাতির নীচে
আমার অস্তিত্বটা চিৎকার করে,
নানা বর্ণের অজস্র মুখ,
প্রিয়ার লোভনীয় ঠোঁট,
ক্লেদাক্ত পিচ্ছিল বেগে ছুটে আসে
চারদিক থেকে।

আর এক দার্শনিকের শূন্যতায় দাঁড়িয়ে দেখি—
আমার অজন্তা-ইলোরার ছবিগুলি
সাদা হয়ে গেছে,
অফিসের কোলাহল,
শহরের জনাকীর্ণ রাজপথ,
নিঃশেষে হারিয়ে গেছে
ঘনকালো কুয়াশার স্তরে।

এবং প্রায়শ—
আয়নায় তাকিয়ে
আমার রক্তে রক্তে চঞ্চলতা জাগে—
ছুটে যাবে,
সামনে দাঁড়ানো এই সমুদ্রের তলে,
অনু-পরমাণুগুলি ঘেঁটে পাড়ি দেবে
গভীরে—আরও গভীরে
সেই নির্মম উৎসের সন্ধানে।

প্রদীপবিকাশ রায়

আমি

বাইরে 'আমি' গভীরভাবে বক-বৈরাগী ধ্যানে রত
জলার ধারে নিবিড়তম মন্ত্র খুঁজি, মন্ত্রগুলি মাছের মতো।
ভেতর 'আমি' জ্বলন্ত ধূপ, ধোঁয়ার ভেতর
একলা আমি কাকে খুঁজি ঘোলা দু'চোখ মেলে
চোখের জলে সোনালী মাছ
ভীরু ভীরু শব্দবিহীন কানামাছি খেলে।
বুকের মতো বুক মেলেনা, শুঁকে নেব মিহি গন্ধ
গন্ধ থেকে রাজহংস যদি শব্দ তুলে আনে
সেইতো আমার পরম মন্ত্র
শুনতে পাব দু'টি কানে।
সে রকম বুক-উল্টোদিকে
উদোম পিঠে ছড়ানো চুল, চুলের ভেতর
বোশেখ শেষে লুকিয়ে থাকি গুপ্তঘাতক ঝড়।
বাইরে তার রূপোর তালায় বন্দী আমি তাই তো ভাবি
ভেতরে তার ভুলে রাখা 'আমি' আমার সোনার চাবি।

আদিনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

মৃত্যুর অধিকার

পেয়ালায় টুং টাং সিম্ফনি।
শব্দবৃক্ষ নিরন্ধ্র অন্ধকার।
গলিত অগ্নিস্রোতে প্রজ্জ্বলিত
বুকের কলিজা।
অশ্রুত শব্দ চেতনায়
আমি হারিয়ে যাই—
গভীর অন্ধকারে,
তীব্র আলোকের অন্তরালে।
অনুভূতির তীব্রতাব দ্রুত স্পন্দনে
জেগে উঠে দেখি পূতিগন্ধময়তায়
ভরে গিয়েছে রঙীন পেয়ালা।
একটি সত্যই মূর্ত হয়ে ওঠে;
সব হারিয়েছি। আছে শুধু
মৃত্যুর অধিকার।

একগুচ্ছ কবিতা

পীযূষ রাউত

দিন যদি ঐরকমই

দিন যদি এইরকমই
হাতের তোমার রঙীন বেলুন, বাতাস উড়ে,
হারিয়ে যায়—যাক্‌না।
রাত্রি যখন অন্ধকারে—
কীর্তনিয়ার মিলনচক্র, গভীর গাঁয়ে,
হারিয়ে যায়—যাক্‌না।।

কবুতর

১.

একদা জনৈক জ্যোতিষী বলেছিলেন—তোমার ভাগ্য নিতান্তই মন্দহে।
বিমল জানিস্‌তো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।
তারপর
নেপথ্যে টুকরো সংলাপ : কেমন আছো?
দিগ্‌বিদিকে ভারতবর্ষ শান্তির বাণী পাঠিয়েছে। শান্তি মানেই তো
কবুতর। সিলেট শাহ্‌জালালের দরগায় প্রচুর কবুতর দেখেছিলাম।
আমি তখন খুব ছোট। দেখেছিলাম, সুর্মা নদীর ব্রীজে কবুতর।
আমি তখন খুবই ছোট।
বিমল জানিস্‌তো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।
কবুতর মানেই তো পায়রা। তক্ষুণি মনে পড়ে মায়ামৃগের গানটা—
ও বক্ বকুম বকুম পায়রা। নেপথ্যে গ্রামোফোনে আহ্
কবুতরের মাংসে আমাদের দারুণ লোভ; চক্‌চকে জিহ্বার মধ্যে
জল জমে ওঠে। কবুতর। সাতলক্ষ কবুতর।

বিমল জানিস্‌তো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।
ইদানিং ঐসব কবুতর কঙ্কাল সম্বল করে যাদুঘরে, কাঁচের
টেবিলে সুদূর অতীত। ম্লান গন্ধের মধ্যে সুদূর অতীত। কিন্তু
ইনক্লাব, জিন্দাবাদ ঐ কিসের শব্দ? কারা সব
যাদুঘরের গেটে ভীড় করে আছে?

২.

তারা কি শান্তির জন্য ভগ্নদূত অথবা নিতান্ত দর্শক?
বিমল জানিস্‌তো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।
অথচ
কী অসহ্য প্রহসন দ্যাখ, আমার পূজনীয় পিতার রক্তে
করতলে দারুণ ঘৃণা। মনে পড়ে,
একদা জনৈক জ্যোতিষী বলেছিলেন—তোমার ভাগ্য নিতান্তই মন্দহে।
ঘৃণা শব্দের সঙ্গে ঔরংজেবের কী একটা নিবিড় সম্পর্ক—যেমন
আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার—আমি অনুভব করি;
হে ঔরংজেব,
এই রক্তের মধ্যে জিঘাংসার আগুন জ্বেলে তুমি কি পায়চারি করছ?
বারান্দায় ঝুঁকে পড়ে ইতিহাস—বধ্যভূমির অট্টহাসি,
প্রজাবৃন্দের তৎপরতা—যে যেদিকে পারো ছোটো।
বিমল জানিস্‌তো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।
অথচ কী অসহ্য সুখের মধ্যে কবুতরের মতো বিমান যখন
প্রচণ্ড গতির মধ্যে আকাশে উড্ডীন—হ্যাণ্ডস্‌ আপ, ক্যাপটেন্‌!
ইদানিং কল্যাণপুরে দারুণ সব পাপপুণ্যের খেলায়
ঘটনাপ্রবাহে
কত কত স্মৃতির মধ্যে ভুলে যাই, একদিন কারা সব বন্ধু ছিলো।

৩.

প্রিয় বইগুলো কখন যে চুরি গেছে—কিছুই জানিনা।
শুধু ট্র্যাজিক দৃশ্যের মধ্যে হো-চি-মিন কাঁচের পানে
কবরে গেলেন।
বিমল জানিস্‌তো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।
অথচ এই ১৯৬৯ দু'চোখে প্রবল ঘৃণা; নগ্ননখর দৃশ্যে
কবুতর ফসিলমাত্র। ধর্মঘটে ভাঙা শঙ্খের শব্দ নিছক
শব্দের জন্য এবং অবশেষে ফলশ্রুতি কিছু? ইদানিং

সমুদ্রের ঝড়ে ঝড়ে টালমাটাল নৌকোর মতো সাতলক্ষ

৪.

কবুতর; টালমাটাল দেহ—উঠছে, পড়ছে ছত্রাকার
সুরম্য মিছিল।
স্বপ্নের হিমেল হাসির মতো স্থলভাগ, পাগল সমুদ্রে
প্লাস্টিক নারীর মুখ শোকেসে বহুমূল্য মিথ্যাহাসি,
সাদর আহ্বান—এইখানে আসুন।
স্থলভাগ, বিন্যস্ত কবুতর। বস্তুত প্রশান্ত জীবন
বহুদূরে—প্রবল ঝড়ের মধ্যে নির্বাসিত অন্ধকার দ্বীপ।

বিমল জানিস্‌তো, নেহেরু শান্তির জন্য কবুতর ওড়াতেন।

•

যুদ্ধযাত্রা

যখন সম্পূর্ণ একলা নিত্যানন্দর চায়ের দোকানে বসে সিগারেটের পর সিগারেট কয়েক কাপ চা উজাড় হতে হতে ক্রমে
সিগারেট ও চায়ের প্রতি বিস্বাদ অনুভূত হলো এবং একটা অদ্ভুত বিষণ্ণতায় ডুবে গেলাম তখন বাইরে রাস্তার
নীচু গর্তগুলোতে ভিজে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে মেঘগুলো দ্রুত পালাচ্ছে এদিক ওদিক তখনি মনে হলো
অন্তত একটা বন্ধুও যদি আমার পাগল ইচ্ছার সঙ্গে যে কোনো দুর্যোগে বলতে পারতো চল্‌ তোর সঙ্গে যে কোনো
জাহান্নমে নিত্যানন্দর জানলাবিহীন কেবিন থেকে যে কোনো মহিলার বাড়িতে চাই কি মদের দোকানে এবং ব্রথেল্‌সেও
ঠিক ঐ সময় আমার প্রিয় বন্ধুরা খাঁটি সৈনিকের মতো সশস্ত্র
ছুটে এসে আমাকে বললে—আমরা প্রস্তুত! সমস্ত ঘরময় প্রতিধ্বনিত হলো আমরা প্রস্তুত আমরা প্রস্তুত আমরা প্রস্তুত
আমিও ছুটে এসে ওদের হাত থেকে আমার জন্য সংগৃহীত পোশাক ও অস্ত্র নিয়ে হুঙ্কার দিলাম—এসো এই
ভাল্‌গার পৃথিবীর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করি

আমার সিদ্ধান্ত অতঃপর সমর্থিত হয়ে গেলে বাইরের ভিজে জ্যোৎস্নায়
এই
ছোট্ট শহরের বাড়িতে বাড়িতে আমাদের যুদ্ধযাত্রার খবর আকাশবাণীর সংবাদের মতো
ছড়িয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণের
মধ্যেই আমি ও আমার সৈনিক বন্ধুরা যুগপৎ দেখতে পেলাম মার্টিনবার্নের আঠারোতলার
ছাদ থেকে আমরা ক্রমে
ক্রমে লাফিয়ে পড়ছি আর যুদ্ধক্ষেত্রের বিউগল ও হিংস্র আর্তহাহাকারে ঘন ঘন কেঁপে
উঠছে চতুর্দিক।

পোস্টার পোস্টার

পোস্টার পোস্টার
ওহে সুব্রত মিত্র, পোস্টারের চওড়া পথ ধরে
হন্‌হনিয়ে যাচ্ছেন কোথায়?
ও মশাই শুনছেন, এই পথই কি
শেরশাহ্ বানিয়েছিল?
কী নাম বললেন—গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড?
পোস্টার পোস্টার
অতঃপর, পোস্টারের মধ্যে
সুব্রত মিত্রকে দেখলাম।
রক্তাক্ত বীভৎস বিজয়ীর মতো
বুকের উপর
টাটা মার্সিডিজ দাঁড়িয়ে।

মা তুমি একদিন

মা তুমি একদিন, একদিন
হৈমন্তিক নদীর মতো অরণ্যের স্নেহ, আর সূর্যের
হাজার আলোকবিন্দু,
মা তুমি একদিন একদিন
তোমার বুকের মধ্যে সবুজ রেলগাড়ি, শ্রীহট্ট,
হাসনরাজা এবং
বুঝিনা-বুঝিনা এমন জীবন শুধু,
মা তুমি একদিন, একদিন
সন্ধেবেলা বলেছিলে—'জানিস্ খোকন, এক

রাজপুত্তুর ছিল,
অবিকল তোর মতন, দীঘির মতন চোখ, কোঁকড়ানো
চুর আর, আরো যেন কত সব ... ...'
মা আজ, আমি এখন, অন্ধ রাজপুত্তুর,
কখন যে
দিনের আলোক শেষ, রাত্রি নামে
আমাদের গলিপথে—
নির্জন ঘুমের মধ্যে ফেরারী জ্যোৎস্না, ঘরে ফেরা
মানুষের মুখে কী যেন নেই, মা এইসব
কল্পনার মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা,
মা, তোমার হাসি কেমন ঠিকঠাক মনে নেই,
মা, আমি অন্ধ রাজপুত্তুর, সারাদিন
শুয়ে বসে
গাড়ির শব্দগুলি এই আসে, হঠাৎ পালায়,
মা তুমি একদিন, একদিন
যদি দেখো, পুষি বেড়ালটা
আমার বুকের কাছে সারাদিন টুকটাক্ খেলা করে,
মা আমি যদি ঐ বেড়ালটার মতো ... ...,
মা আমার ভীষণ কষ্ট,
আমি রাজপুত্তুরও নই, বেড়ালছানাও নই,
মা আমি যে কী আমি,
মা তুমি একদিন, একদিন
যদি স্পষ্ট করে বলো—'খোকন তুই রাজপুত্তুর,
খোকন তুই ... ...।।'

প্রেম বিষয়ক কবিতা

শুধু একটা খালি ট্রামের জন্য
তোমাকে আরো দশ মিনিট এখানে আটকে রাখবো।
শীত নেই গ্রীষ্ম নেই কেমন একটা
উজ্জ্বল আবহাওয়া দ্যাখো, সিনেমার বিজ্ঞাপনে
দুর্গার মুখ।
দ্যাখো, কেমন একটা উজ্জ্বল পারিপার্শ্বিক।

একটা উপমা দিতে ভারি ইচ্ছে করছে,
কলকাতা-আগরতলা-আকশ থেকে কখনো
মেঘ দেখেছো?
বহু নীচে পথ
কিংবা নদী কিংবা
ঠিক ঐ রকমই বেলা-অবেলা ঠিক নেই এমন একটা
উজ্জ্বল পারিপার্শ্বিক।
শুধু একটা খালি ট্রামের জন্য
রাসবিহারীর মোড়ে
এক মিনিট দুই মিনিট তিন মিনিট শুধু তুমি
তুমি তুমি। তুমি কি এই ট্রামেই যাবে?
—না, এটা ৩১ নম্বর।
ঐ পরের টা?
—চেনা-জানা যদি কেউ! ঐ দূরেরটা?
—কি জানি, যদি অ্যাকসিডেন্ট করে!
বরং এসো, একটা সুস্থ ট্রামের জন্য,
একটা খালি ট্রামের জন্য আরো কিছুক্ষণ
দাঁড়িয়ে থাকি।

গল্প : পীযুষ রাউত

বুনোহরিণের চিৎকার

[২৭ জুলাই ১৯৬৩-র লেখা এই ছোটগল্পটি পুরোনো ফাইল ঘাঁটতে[২] হঠাৎ চোখে পড়ল। তোমার পর[২] লেখা দুটো চিঠির আন্তরিক তাগিদে এক্ষুণি লেখা না পাঠিয়ে পারলাম না। পরিসরে ছোট এমন গল্প এইসময়ে হাতের কাছে না থাকাতে এই গল্পটি পাঠালাম। সুদীর্ঘ ৭ বছর পর আজ ৩০ অক্টোবর সন্ধ্যায় এই গল্পটি পড়ে গল্পের একক চরিত্র অসিতবন্ধুকে খুব আপনজন বলে মনে হলো। অসিতবন্ধুর মুখের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে দারুণ চমকে উঠলাম।]

তখন আকাশে কালো ভয়ংকর মেঘ জমছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ঘন ঘন। অসিতবন্ধু জানালার ফাঁক দিয়ে ছিটকে পড়া আলোকের বিদীর্ণ রেখাগুলোকে দেখতে পাচ্ছিলেন। আর পরক্ষণেই এক-একটা ভয়ংকর শব্দের জন্য উন্মুখ অপেক্ষা করছিলেন। বজ্রপাতের শব্দ এতো মুহুর্মুহু হচ্ছিল, তিনি ভাবছিলেন, এই বিশাল জীর্ণ বাড়িটার উপরই বুঝিবা আকাশটা ভেঙে পড়বে। আশ্চর্য, অসিতবন্ধুর মনে এতোটুকু ভীতিসঞ্চার হচ্ছিল না। প্রাণের প্রতি কোনো মায়াই তিনি অনুভব করতে পারছিলেন না। প্রাণীর স্বভাববিরুদ্ধ এই মানসিকতা তাকে নির্বিকার তরে তুলছিল। তার এবংবিধ নিস্পৃহতার পশ্চাতে সম্ভবত তার দায়িত্বহীনতাই কাজ করছিল। কারণ তার আর কোনো দায়িত্ব বাকি ছিলনা। সংসার করেছিলেন। সে সংসার আজ পরিপূর্ণ। নৈমিত্তিক হাসিকান্নার কোলাহল তাকে এখন এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করছিল, আমরা জগতের রীতিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে থাকি। তুমি আমাদের পিতা। পথ-প্রদর্শক। কিন্তু পথ যেহেতু আমাদের নিকট আর অপরিচিত না, লক্ষ্য আমাদের মুঠোর ভিতর, সেহেতু তোমার প্রয়োজনের এখানেই ইতি।

নির্বিকার অসিতবন্ধু সকম্প জীর্ণ হাত দিয়ে তার অনেকগুলো ডায়েরীর কোনো একখানা তুলে নিলেন। খালিচোখে এখন আর স্পষ্ট কিছু দেখা যায়না। পড়াও যায়না। ফলত তেজি পাওয়ারের চশমার গ্লাসের মধ্যে অভ্যস্ত দৃষ্টিকে মেলে ধরেন। তার মনে হল, কাল সবকিছু মুছে দেয়। লেখা অক্ষরগুলোর রঙও কেমন বিবর্ণ, পাংশু হয়ে গেছে। হয়তো এমন দিনও অনাগত যেদিন অধিকতর তীব্র পাওয়ারের চশমা দিয়েও তাকে বোঝা যাবেনা। অসিতবন্ধুর আরো মনে হল, লেখাগুলো কেমন যেন থিতিয়ে পড়েছে। নিজেরই দেহের মতো। মনের মতো।

অসিতবন্ধু চল্লিশ বছর আগের লেখা থেকে শুরু করে দশবছর আগের থেমে যাওয়া লেখাগুলো এখনো আগ্রহসহকারে পড়েন। তার স্মৃতির দর্পণে ভিড় করে অসংখ্য বিচিত্র মুখ। বিপরীতধর্মী অনেক চিন্তার অভিব্যক্তি তিনি আজও প্রত্যক্ষ করেন এই সব মুখে। এছাড়া অজস্র শহর, গ্রাম, নদী, গাছ পাখী। এই পঞ্চাশ বছরের সজ্ঞান জীবনে যা কিছু তার মনে দাগ কেটেছে, যা কিছু তিনি এই ডায়েরীর পৃষ্ঠায় জড়ো করেছেন, তার রূপ দেখেই তার দিন কাটে। সাম্প্রতিক দিনযাপন।

অসিতবন্ধু অকস্মাৎ একসময় লক্ষ্য করলেন, এখন আর জানালার বুক চিরে আলো প্রবেশ করছে না। আগেকার সেই বিদ্যুতের আলো। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে জানালা খুলে সামনের খোলা মাঠে চোখ রাখলেন। কেমন ম্লান, বিষণ্ণ আলো ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। বিয়েবাড়ির শেষরাত্রের মতো এক আচ্ছন্ন পরিবেশ এক অদ্ভুত জটিলতা সৃষ্টি করছিল। অথচ আশ্চর্য অসিতবন্ধুর মনে কোনো প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করছিল না এইসব। অসিতবন্ধুর এইটুকু শুধু ভাবতে ইচ্ছা করল—আমি আমার মৃতশরীর, মন নিয়ে এক অব্যক্ত দুঃখে কিংবা দুঃখহীনতায় বেঁচে আছি।

এই সময় নিস্তব্ধ মাঠে অদূরে কোথাও বুনোহরিণ ভীত-কণ্ঠস্বরে চীৎকার করে ডেকে উঠলো।

কবিতাপত্র—বিশেষ সংকলন—
জোনাকি জোনাকি
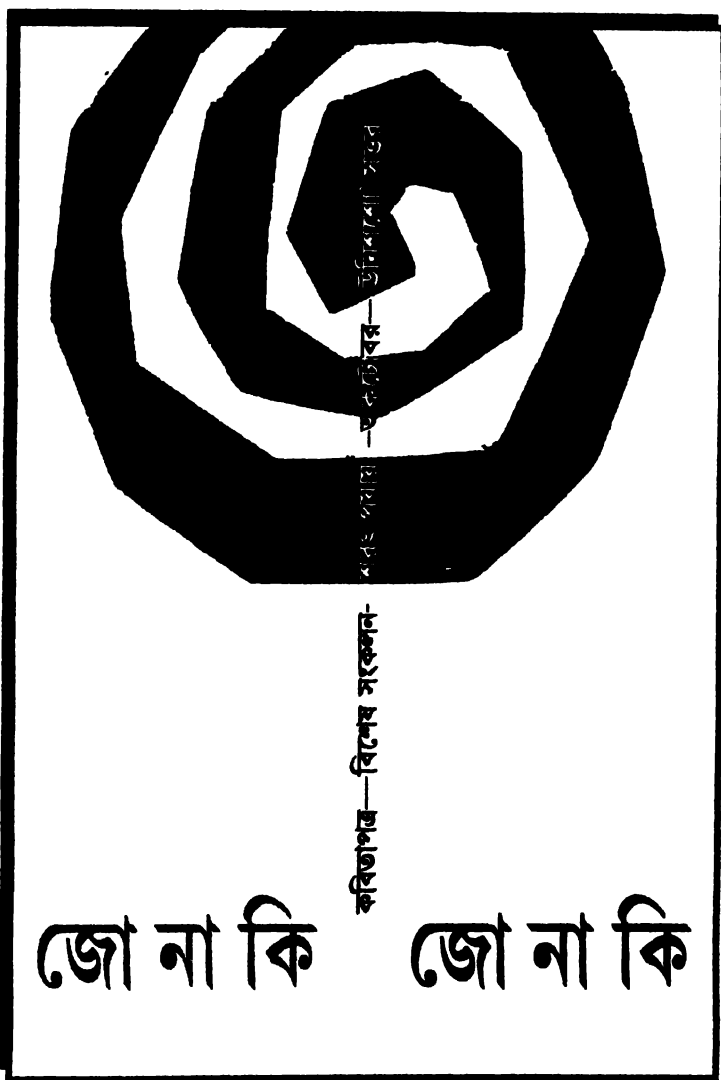
বিশেষ সংকলন ● শরৎ পর্যায় ● অক্টোবর ১৯৭০ **জোনাকি**

(কবিতাপত্র)

পূর্বাঞ্চলের ১১ জন শ্রেষ্ঠ কবির পরিচিতি এবং সাক্ষাৎকারসহ
১টি করে কবিতা

শিলচর তথা কাছাড় থেকে—
শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ● বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য
রণজিৎ দাস ● মনোতোষ চক্রবর্তী
জিতেন নাগ ● শীতাংশু পাল

ত্রিপুরা থেকে—
স্বপন সেনগুপ্ত ● প্রদীপ বিকাশ রায়
বিমল দেব
মানিক চক্রবর্তী ● পীযূষ রাউত

জোনাকি—কবিতাপত্র

শরৎ পর্যায়—

(শারদীয় সংখ্যা)

সংকলন—নয়

আত্মপ্রকাশ—অক্টোবর ১৯৭০

পরিকল্পক এবং সম্পাদক—পীযূষ রাউত

প্রকাশক—সৈকত রাউত

প্রধান কার্যালয়—পূর্ব গোবিন্দপুর ● কৈলাসহর ● উত্তর ত্রিপুরা

যোগাযোগের ঠিকানা—ডাকঘর . কল্যাণপুর ● খোয়াই ● পশ্চিম ত্রিপুরা

প্রচ্ছদ ও ব্লক—শিল্পী বিমল দেব

ছেপেছেন—রীণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

মূল্য—এক টাকা

সম্পাদকের বক্তব্য

জোনাকি শরৎ পর্যায়ের (১৯৭০) যে পরিকল্পনা দীর্ঘদিন আগে মনে মনে নিয়েছিলাম, তা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত আকারে বর্তমান সংখ্যায় আভাসিত। অনেকের অসহযোগিতায় সংখ্যাটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে পারিনি। যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। ব্যক্তিগত অসুবিধার কারণে পত্রিকা প্রকাশে কিছুটা দেরী হলো। তবে শরৎ হেমন্তকে এক ঋতু ধরলে এই অপূর্ণতাটুকু থাকবেনা বলেই মনে করি। এই সংকলন, বলা দরকার, পূর্বাঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

কবিদের যে সব প্রশ্ন করা হয়েছিল সেগুলো এই রকম—

১) বিশেষ কোনো মতাদর্শ কিংবা তাৎক্ষণিক অনুভূতির প্রকাশ—এ দুটোর কোন্‌টাকে কবিতায় প্রকাশ করতে আপনি উৎসুক এবং কেন?

২) কবিতায় আঞ্চলিক জীবনের প্রতিফলন কি একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন?

৩) কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবিতা এবং ছোটগল্পকে ইদানিং আলাদা করে চেনা যায় না—এটা সত্যি হলে এর পরিণতি কি?

৪) সাধারণ পাঠকের একটা বহুল প্রচলিত অভিযোগ, কবিরা ইচ্ছে করেই কবিতাকে দুর্বোধ্য করেন; একজন কবি হিসাবে এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

৫) আচ্ছা, আপনার কি মাঝে মাঝে মনে হয়, কবিতা লেখার কোনো মানেই হয় না অথবা যা লিখছেন তা' আসলে কবিতাই হচ্ছে না?

৬) সক্রিয় রাজনীতি কি কবি ও কবিতার শত্রু?

প্রশ্নগুলো বারংবার ছাপানো সম্ভব নয় বলেই প্রত্যেক কবির কবিতার আগে শুধু প্রশ্নের নম্বরগুলোই উল্লিখিত করা হয়েছে। প্রশ্নগুলো পাঠকদের এই স্তম্ভ থেকেই দেখে নিতে হবে। এই পরিশ্রম ও হাঙ্গামার জন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

কবি পরিচিতি

● **শক্তিপদ ব্রহ্মচারী :**

জন্মসাল ১৯৩৭ (২০ এপ্রিল, মঙ্গলবার)। জন্মস্থান . শ্রীহট্টের সুনাইতা গ্রামে (হবিগঞ্জ মহকুমা), পেশা : শিক্ষকতা। পড়াশোনা : এম.এ (বাংলা), কবিতা লেখার শুরু : 'খাতায় কবিতা লেখা শুরু করেছি ১৯৪৬ থেকে। অবশ্য এরও আগে আমার ৭/৮ বৎসর বয়সে আমার এক পিসতুতো ছোটবোনকে ক্ষেপানোর জন্য ছড়া বানিয়েছিলাম। তা লেখা হয়নি। একই সময়ে আমাদের বাড়িতে মনসাপূজার বলির জন্য ক্রীত একটি পাঁঠার আসন্ন মৃত্যু কল্পনায় দুঃখিত হয়ে আপনমনে গাওয়ার জন্য একটি গানও রচনা করেছিলাম। অবশ্য এগুলোর কোনোটাই কবিতার পর্যায়ে পড়ে না। তবে পদ্য লেখার একটা প্রবণতা হয়তো তখন থেকেই আমার মনে ক্রিয়াশীল হয়েছিল, এই জন্যই এ তুচ্ছ তথ্যের উল্লেখ করলাম।' রচিত ও প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা—সব লেখা সংগ্রহ করলে শ' পাঁচেক হওয়া অসম্ভব নয়। প্রকাশিত একশো'র কিছু উপর। প্রকাশিত কবিতার বই নেই। একটা বই প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ঠিকানা—কাছাড়া হাইস্কুল, মালুগ্রাম। ডাকঘর : শিলচর, কাছাড়, আসাম।

● **বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য :**

১৯৩৯ সাল/কায়স্থগ্রাম, করিমগঞ্জ/অধ্যাপনা/এম.এস.সি (পদার্থবিদ্যা)/১৯৬৬-র ডিসেম্বর/হিসেব দিতে পারব না—সম্ভবত বছরে ১০/১২টির বেশী নয়/আগামী শীতে বই বেরুবে, নাম ঠিক হয়নি, সম্পাদিত বই—'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' : আসামের সাম্প্রতিক কবিতার সংকলন/এস. এস. কলেজ। ডাকঘর-হাইলাকান্দি, কাছাড়। আসাম।

● **শীতাংশু পাল :**

১৯৪০ ফেব্রুয়ারী মাস/দত্তপুর, শ্রীহট্ট/কন্ট্রাকটারী/স্নাতকশ্রেণী/১৯৫৮ ইং থেকে/শান্তির জন্য রচিত ২৫১টি কবিতা/প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা ১৮৩টি/বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়/ডাকঘর-ছোটজালেঙ্গা। কাছাড় : আসাম।

● **প্রদীপ বিকাশ রায় :**

১৯৪০/চাতলাপাড়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা জেলা/ব্যাঙ্কের চাকরী/১৯৫৯/প্রায় আড়াই শ'/প্রকাশিত ৫০/নেই/তেলিয়ামুড়া কো. অ. ব্যাঙ্ক/ডাকঘর তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা।

● **মানিক চক্রবর্তী :**

'আমার জন্ম ১৯৪০ ইং সনের ১লা জুলাই। বুকে হাত দিয়ে বলছি—এটা আমার সার্টিফিকেট এজ নয়। এ দিনটিতে ত্রিপুরা রাজ্যের কৈলাসহরের মাটি-আলো-হাওয়া আমি প্রথম দেখেছি। আমাদের আদি নিবাস পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলা। তবে আমার জন্মের আগে থেকেই সেই বাড়ীর সঙ্গে আমাদের পরিবারগত যোগাযোগের সূত্রটা অনেকটা আলগা হয়ে গেছল। আমি ত্রিপুরার (ভারত) মাটিতেই বড় হয়ে উঠেছি। এখানে এই কৈলাসহরেই আমি শিক্ষকতা করছি। এবং এভাবেই এম.এ (বাংলা) বি.টি. ডিগ্রিকে কাজে লাগিয়ে কোনোরকমে বেঁচে আছি। ছেলেবেলা থেকেই গল্প কবিতা লেখার কিছু কিছু অভ্যেস ছিল। তবে ১৯৬৫ থেকেই আনুষ্ঠানিক ভাবে গল্প কবিতা লেখার শুরু/কয়েকশো মাত্র/প্রকাশিত কবিতার সংখ্যা খুবই কম নেই/মায়া ভাণ্ডার, ডাকঘর-কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা।

● **জিতেন নাগ :**

১৯৪০, ১লা অক্টোবর/সদর শ্রীহট্ট/ইংরাজী স্কুলে শিক্ষকতা/এম.এ (বাংলা), শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরীক্ষার প্রশংসাপত্র/কৈশোর থেকে/কবিতার সংখ্যা বলা মুশকিল/রচনা এবং প্রকাশনা প্রায় সমপরিমাণ/'রীতি ও বিরতি' বেরুচ্ছে এই বসন্তে/ঠিকানা : প্রযত্নে অশোকা, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর-১, কাছাড়, আসাম।

● **পীযূষ রাউত :**

১৯৪০ ইং ১০ নভেম্বর/শ্রীহট্টের ঢাকাদক্ষিণ/শিক্ষকতা/বাংলায় এম.এ এবং বি.টি./কবিতা লেখার শুরু ১৯৫৯-এর মাঝামাঝি/রচিত কবিতার সংখ্যা ১৮০০ প্রায়/প্রকাশিত ২০০ প্রায়/নেই/প্রযত্নে : কল্যাণপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডাকঘর-কল্যাণপুর, খোয়াই, ত্রিপুরা।

● **বিমল দেব :**

১৯৪১ইং। কৈলাসহর, ত্রিপুরা/শিল্প-শিক্ষক/কলকাতা সরকারী আর্ট ও ক্র্যাফট্

কলেজের ৫ বছরের কমার্শিয়াল আর্টে ডিপ্লোমা/হিসাব রাখিনি/নেই/খোয়াই উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ডাকঘর-খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা।

● **স্বপন সেনগুপ্ত :**

১৯৪৫ ইং, ২রা ডিসেম্বর/ ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পূর্ববঙ্গে/শিক্ষকতা/ বি.এ/ শৈশবে/ প্রকাশিত ২০০/রচিত হিসেব রাখিনি/'এক আকাশ পাখী' কাব্যগ্রন্থ/প্রযত্নে : ঋষ্যমুখ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডাকঘর-ঋষ্যমুখ, বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা।

● **রণজিৎ দাশ :**

১৯৪৯/করিমগঞ্জ, কাছাড়/লোকঠকানো/থার্ডইয়ার বি.এস.সি পড়ুয়া/শুরু ১৯৬৭-তে/ হিসেব রাখিনি/প্রথম বই বেরুচ্ছে ৭১ এপ্রিলে/প্রযত্নে : গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস, হাসপাতাল রোড, শিলচর-৫, কাছাড়, আসাম।

● **মনোতোষ চক্রবর্তী :**

১৯৫১ ইং/বিন্নাকান্দি চা-বাগান, কাছাড় জেলা/শিলচর গুরুচরণ কলেজে স্নাতক, দ্বিতীয় বর্ষের ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র/'প্রথম কবিতা লেখা শুরু স্কুলজীবনে। এই শুরুর পেছনে একটা ছোট্ট ঘটনা আছে। কোনো কারণে বাবার হাতে প্রচণ্ড শাস্তির ফলস্বরূপ আমার আত্মহত্যার ইচ্ছে হয়। আশ্চর্যজনকভাবে তখন আমি অকস্মাৎ একটি কবিতা রচনা করি। জীবনের প্রতি মমত্ববোধই এই রচনার বিষয় ছিল। এই-ই প্রথম। এর কিছুকাল পর আমার কাছে 'অতন্দ্র' পত্রিকার একটি সংখ্যা পৌঁছায়। আমি খুব উৎসাহিত বোধ করি। ১৯৬৫ ইংরেজীতে আমি শিলচর এসে কাছাড় হাইস্কুলে ভর্তি হবার পর কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর সাথে পরিচয় হয় এবং আমার কবিতা লেখার প্রকৃত হাতেখড়ি হয় তখনই, তাঁর কাছে। আমি যখন স্কুলজীবনের শেষধাপে, তখন 'অতন্দ্র'-এ আমার কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়।' কবিতার সংখ্যা অল্প। কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি/প্রযত্নে : গুরুচরণ কলেজ, শিলচর, কাছাড়। আসাম।

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

১) যেহেতু আমার নিজের বিশেষ কোনো মতাদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস নেই, এ জন্য কবিতা লেখক হিসেবে মতাদর্শ অপেক্ষা তাৎক্ষণিক অনুভূতির প্রকাশই আমার কবিতায় বেশী করে হয়। অবশ্য আমার মনে হয়, সকল কবিতা লেখকেরই—তা তিনি বিশেষ কোনো মতাদর্শে বিশ্বাসী হোন বা না হোন, তাৎক্ষণিক অনুভূতি থেকেই কবিতা লেখেন। বিশেষ কোনো মতাদর্শে বিশ্বাসী হলে তার খণ্ড ও তাৎক্ষণিক অনুভূতিগুলো ও মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হবে, সেটা বলাই বাহুল্য।

২) আজকাল বাংলাদেশের বাইরে এমনকি কলকাতার বাইরে থেকেও যারা কবিতা লিখছেন, তাদের কবিতা আলোচনার সময়ে কলকাতার কোনো কোনো সাহিত্য-সমালোচক আঞ্চলিকতার স্বাদ-গন্ধ প্রভৃতির প্রতুলতা অপ্রতুলতার উপর খুব বেশী জোর দিচ্ছেন। কোনো কোনো সমালোচকের লেখা পড়ে, মনে হতে পারে, কলকাতার বাইরে বাস করে কবিতা লেখার যে অপরাধ সেটা মার্জনা করা হবে, যদি তুমি আঞ্চলিকতার তৎকর্তৃক আরোপিত শর্তগুলো যথাযথ পালন কর। আমার তো কোনো কোনো সময়ে মনে হয় 'মফঃস্বলী' (কথাটার মধ্যে অবশ্যই যথেষ্ট তাচ্ছিল্যের ভাব আছে) শব্দটার বিকল্পে ওদের কেউ কেউ 'আঞ্চলিক' শব্দটা ব্যবহার করছেন। এখন আপনার মূল প্রশ্নে আসা যাক। ত্রিপুরা বা কাছাড়ের কবিদের কবিতা পড়ে ঝট্‌পট্‌ ঐ রাজ্যগুলোর ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে ফেলবেন, এমন মূঢ় প্রত্যাশা যদি কোনো পাঠক করে থাকেন, সেটা হাস্যকর। আমি যে অঞ্চলে বাস করি, সে অঞ্চলের প্রকৃতি বা লোকায়ত জীবন আমার কবিতার বিষয়বস্তু হতে পারে, নাও হতে পারে। ধরুণ, নারী সম্পর্কে আমার কৌতুহল অদম্য। এই কৌতুহলটা যদি আমার কবিতার ব্যাপার হয়, এবং এই ব্যাপারটা এত বেশী স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষে যে, আঞ্চলিক জ্ঞানের অভাবে কোনো পাঠকেরই তার মর্মোদ্ধার বা রসোদ্ধার করার বাধা থাকতে পারে না। সাহিত্যের

ক্ষেত্রে এমন হাজারটা ব্যাপার আছে (প্রেম, হিংসা, ক্ষমা, তিতিক্ষা, উপচিকীর্ষা, লোভ, সঙ্গম ... এমনি হাজার লক্ষ কোটি), যেখানে আঞ্চলিকতার অনুসন্ধান করার অর্থ হবে ধানের ক্ষেতে বেগুন খোঁজার সামিল। আমার কবিতায় নারীই যদি প্রধান স্থান অধিকার করে, তাতে আপত্তিটা কেন আসবে? আমার অনুভব আমি কবিতায় ভাষা আবিষ্কার করে প্রকাশ করতে পারছি কি না, সেটাই আসল কথা। বরাকের তীরে বাস করেও, কোথাও যদি বরাকের প্রভাব আমার কবিতায় না পড়ে, তাতে আমি 'অনাঞ্চলিক' হতে পারি, কিন্তু কবি হওয়ার পথে এটা মোটেই বাধা নয়। অথচ সবাই জানেন, প্রতিটি কবিতা লেখক শুধু কবিতাই লিখতে চান।

৩) কবিতা ও ছোটগল্পকে ইদানিং আলাদা করে চেনা যায় না—আজকালকার সাহিত্য আলোচনায় এ কথাটা মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। এ সম্পর্কে আমার মত?

মানুষের পরিধেয় বস্ত্রের ফ্যাশন অনবরত বদলে যাচ্ছে। শুনেছি কোনো এক সময়ে বাঙালী নারী ও পুরুষের পরিধেয় বস্ত্রের পাড় বদলাতে বদলাতে এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছিল, একজোড়া কাপড় কিনে দু'ভাগ করে স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পরতে পারতেন। পুরুষের কাপড়ের পাড় সূক্ষ্ম থেকে মোটা হতে হতে, এবং নারীর কাপড়ে পাড় মোটা থেকে সূক্ষ্ম হতে হতে, যখন দু'পক্ষই এক ইঙ্গিতে এসে আত্মসপর্মণ করে তখনই এ বিপর্যয়টা হয়েছিল। কিন্তু তা বলে তা চিরদিনের জন্য এক হয়ে থাকেনি। আধুনিক কালে এ দুটোই প্রকটভাবে আলাদা।

কবিতা ও ছোটগল্পের এই একীকরণ যদি হয়েও থাকে, সেটা নিতান্তই বহিরঙ্গের ব্যাপার এবং একান্তই সাময়িক।

৪) মহাকাব্যের জন-তোষণের পথ ছেড়ে, কবিতা যেদিন থেকে গীতি ও কবিতার যুগে প্রবেশ করেছে, সেদিন থেকেই কবিতা দুর্বোধ্য (দুরূহ?) হয়ে পড়েছে। আধুনিক কালে কবিতার আপাত-দুর্বোধ্যতা অনেক বেড়ে গেছে, এটাই স্বাভাবিক। কবিতার যথার্থ ভাষা আবিষ্কারের জন্য প্রতিটি কবি এককভাবে সংগ্রাম করছেন। এই সংগ্রামের গতি প্রকৃতি যারা বুঝবেন না, তাদের উপরই মাঝে মাঝে কবিতার শব-ব্যবচ্ছেদের ভার পড়ে যায়। নিয়তির এই দুর্বোধ্য খামখেয়ালেপনার বিরুদ্ধে আসুন, একযোগে জেহাদ ঘোষণা করি।

৫) হ্যাঁ, হয় বৈ কি। কিন্তু একমাত্র কবিতা লেখা ছাড়া আমার আর কিছুই তেমন তীব্রভাবে করণীয় নেই, এটাই আরো বেশী করে বুঝে ফেলেছি। আমার বিশ্বাস, কোনো কবি কোনোদিনই কোনো চরম সম্পূর্ণ কবিতা লিখতে পারবেন না। অথচ নিয়মিত কবিতা লেখার পেছনে এই ইচ্ছাটাও ক্রিয়াশীল। এই করে করেই আমি একদিন পূর্ণতাকে পাব। আর একটা উদাহরণের লোভ এসে পড়ল। যেমন গণিতশাস্ত্রে আছে : .৯ (দশমিক নয় পৌনঃপুনিক) = .৯/৯ = ১ = পূর্ণতা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে .৯ = ৯৯৯.... এই অবস্থা থেকে দেখা যায় ৯-এর সংখ্যা যতই বাড়ান না কেন, তা ক্রমশ একের নিকটতর হতে থাকলেও কোনোদিনই তা ১ কে স্পর্শ

করতে পারবে না।

আমার ধর্ম বিশ্বাস ও কবিতা-বিশ্বাস এই .৯-এর নিয়তির সঙ্গে জড়িত।

৬) না, কবিতার কোনো শত্রু নেই। সক্রিয় রাজনীতিও না। উদাহরণ দেব কি? রাজনীতিবিদ কবি বাংলাদেশেও আছেন, বাইরেও আছেন।

কবির শত্রু একজন আছেন। সেটা কবিমনস্কতা। আসল কবিতা, প্রকৃত নির্মোহতা থেকেই হতে পারে। সক্রিয় রাজনীতিবিদও যখন কবিতা লিখেন, তখন তিনি নির্মোহ। নির্মোহ হতে না পারলে তার লেখা, কবিতা না হয়ে শ্লোগান হয়ে যায়।

বলো কোন্ দিকে যাই

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

আমি কোন্ পথে যাবো, কোন্ পথ জ্যা-যুক্ত ছিলার লক্ষ্যে নেই
বড় ভয়, ডর লাগে সুধন্বা তোমাকে বড় ভয় ... ...
জটিল জালের গ্রন্থি ভেদ করে চলে যাবো সোনার হরিণ
আরো বেঁচে থাকতে চাই, বেঁচে-বর্তে থাকতে চাই আরো
নাভিকুণ্ডলীর থেকে পিণ্ডগোলা উঠে আসে মারীচ, মারীচ'

বলো কোন্ দিকে যাই, কোন্ ভূমি ত্রিপাদ ভূমির
সীমানা শাসিত নয়, সেখানেই ধূল্যাবলুণ্ঠিত
শিয়রে শালীন বাহু রেখে ঘুম শত্রু হননের
জ্বালা নেই, প্রসূতি ও মুদ্দাফরাসের
প্রেমে হাততালি দিয়ে গেয়ে উঠব অনাক্রান্ত বলি

যখন নদীর দিকে যাই, সে-ও বলে তর্জনী শাসনে
দ্যাখ্, কীর্তিনাশা হতে পারি এ মুহূর্তে অকূল-প্লাবিনী
আমি কোন্ পথে যাবো, কোন্ পথ সমস্ত বৃক্ষের
ছায়া রাখে, কোল জুড়ে শিশুর চোখের মতো ইতি-উতি রোদ
স্মৃতি উঠে আসে প্রিয় নির্বিকার সোপান পেরিয়ে।

বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

১) কোনো কবির একটি কবিতা তার অন্যান্য কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো আলাদা ব্যাপার নয়, শুরু থেকে কেবলই এক নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ব্যক্তিত্বের স্পষ্ট প্রকাশের পথ ধরে পরিণত হতে হতে ক্রমঅগ্রসরণ—উন্নীত চৈতন্যের জগতে ভিতর থেকে ভিতরে যাত্রা। কবিতা এক ধরণের আত্মিক উত্তরণের অভিজ্ঞান। কবির স্বতন্ত্র জীবন যাপনেই তার অনলস প্রস্তুতি ও নিয়মিত পারাপার। কোনো বিশেষ শব্দ কিংবা তাৎক্ষণিক ঘটনা অথবা চিত্র হঠাৎ ঝলকানি দিয়ে কবিতা লেখায় সত্য, কিন্তু সেই তাৎক্ষণিক ব্যাপারের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব দ্রুত মিলেমিশে যায় ভিন্ন প্রবাহে—যেমন কোনো বিকেলের একটি ছোট্ট ঘটনা চেতনা-অবচেতনায় পারাপার ঘটিয়ে জন্ম দিতে পারে স্বপ্নের—মৌল জীবনবোধের গভীরতায় যার স্বাভাবিক একাত্মতা।

২) কবিতায় আঞ্চলিক জীবনের প্রতিফলন একান্ত প্রয়োজন—এ ধরণের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনোদিন কবিতা লিখিনি জন্মের পর থেকে যে পারিপার্শ্বিক অস্তিত্বের মধ্যে মানুষ নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিত্বের কাঠামো রচনায় তার দাবী অনস্বীকার্য। কৃত্রিমভাবে আঞ্চলিকতা নিয়ে ভাববার অবকাশ কোথায়? যা স্বাভাবিক ভাবে কবিতায় আসে তাকে যেমন এড়ানো যায় না, তেমনি তার অতিরিক্ত কিছু বানিয়ে বসানোও কাজের কাজ নয়।

৩) কৈ, তেমন কোনো রচনা তো আমার চোখে পড়েনি, এবং সম্ভবত কোনোদিন পড়বে না।

৪) কবিতার ভাষা সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকলে কবিতা পড়া নিরর্থক। আর সে ভাষা ক'জন বোঝে? সকলেই কবিতার পাঠক নয়, কেউ কেউ কবিতার পাঠক।

৫) লেখা শেষ হওয়ার পর নিজের লেখা সম্পর্কে একটা অতৃপ্তি আমার থেকে যায়—যেমন

লিখতে চাই তেমন হচ্ছে না—তাই লেখা ছাড়ার কথা না ভেবে কি ভাবে আবার লিখব তা-ই ভাবি।

৬) কবিকে কেবল কবিই হতে হয় বলে আমার ধারণা, বাদবাকী কাজ অভ্যাসে করে যাওয়া। সেই একাধিক কলসী মাথায় নিয়ে নাচের মত।

যখন সাঁতার কাটে ধান

বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

বছরে একবার, আমি জানি প্রতিটি ঘরের কাছে নৌকো যাবে
যখন সাঁতার কাটে ধান, আমি ছপাছপ্ দাঁড় টানি,
তোমাকে বলেছি এলে হঠাৎ কখন, পথঘাট বন্ধ হতে পারে।
তার চেয়ে আদিগন্ত চায়ের বাগানে চেয়ে দেখ সাঁওতাল যুবতী
কেমন নিপুণ হাতে কুঁড়ি ভাঙে, তুমি জীপগাড়ি নিয়ে
আনাচে-কানাচে যেতে পারো—মাঝে মাঝে অকারণ হেসে
সুদর্শন যুবকের বুকে ভেঙে পড়ো, সেও ভাল, রঙিন
আলোর নীচে সমস্ত দিনের স্মৃতি সযত্নে সাজানো থাক্।

বছরে একবার আমি তোমাদেরও ঘরে যেতে পারি,
নৌকো অভ্যস্ত হয়ে গেলে জল-মাটি সকলই সমান নাব্য।
তুমি যা দেখনি—ঐ সাঁওতাল যুবতী কেবলই সাঁতার কেটে ঘরে আসে
তারা ভালবাসে সব ধান চাষীদেরে, তবু আকাশে মেলে না হাত
ছোট নৌকো ভেসে এলে বলে : ভাল আছি। শিসের ওপরে স্পর্শ,
পারস্পরিক এক বিশ্বাসের পাঠ নেয় ভিতরে ভিতরে, আমি জানি
যখন সাঁতার কাটে ধান, প্রতিটি ঘরের কাছে তখনই নৌকো চলে যাবে।

শীতাংশু পাল

১) তাৎক্ষণিক অনুভূতির প্রকাশই কবিতায় প্রকাশ করতে উৎসুক, কারণ, অনুভূতি দ্বারা প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি কবিতায় পরিস্ফুট হয়।

২) আঞ্চলিক জীবনের গভীরতম উপলব্ধি ও সভ্যতার প্রাণচাঞ্চল্যের প্রতিফলন কবিতায় প্রয়োজনীয় মনে করি।

৩) ছোটগল্প—অব্যক্ত পাঠককে ভাবায়। কবিতা সৎ শিল্প মনে করি। Form বা গঠন যদি অনাবশ্যক কুব্জপৃষ্ঠ না হয় তবে পাঠককে কবিতার কাছে আসতেই হবে—নতুবা ঐ সব কবিতার স্থান হবে যাদুঘরে।

৪) দেখুন, কবিতার রীতিগত পরিবর্তন প্রাকৃতিক ঋতু পরিবর্তনের মতই অনিবার্য এবং এ'কারণেই কবিতায় একটু জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা আসবে তা যদি আকস্মিক ও স্বেচ্ছাসৃষ্ট না হয় তবে পাঠকের পক্ষে অনতিক্রম্য হবে না। সমাজের প্রতিকূল পরিবেশের প্রতি যদি অভিমানের অবচেতন প্রতিক্রিয়ায় দুর্বোধ্যাক্তি করি যা সহৃদয় উৎসাহপূর্ণ প্রচেষ্টাতে বোধগম্য না হয়, তবে তা আত্মহত্যারই নামান্তর। কারণ বইয়ের পাতায় নয়, পাঠকের হৃদয়েই কবির অমরতা।

৫) যথার্থ জিজ্ঞাসাবোধ ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে পরিচিত কবিতা লিখলে তার মানে আছে—আর যা লিখছি তা' আসলে কবিতাই।

৬) হ্যাঁ শক্র।

আত্মহত্যা

শীতাংশু পাল

সমস্ত অরণ্য তোলপাড় করে ভেঙে দিয়ে অসীম উত্তেজনায়
ঈশ্বর ঈশ্বরীর উপর থুথু ফেলে আলোকবর্ষ হতে দূরে গিয়ে
কেউ যদি আত্মহত্যা
অকূল প্রত্যাশায় আত্মহত্যা করে
তবে পাপ পুণ্যের বিচারে কৃত্রিম সোহাগে
অন্ধকার অন্তিম যাত্রায়
অস্থির উপকূলে এসে
গুহার সুদীর্ঘ পথে শেষ যামে আলো দেখাবে কি!

ওরে ও সোহাগী মায়াবী ঈশ্বর ঈশ্বরী
মানুষকে আত্মহত্যা করতে দাও
উদার কণ্ঠে বল ওরা সব জাহান্নামে যাক্।

প্রদীপ বিকাশ রায়

১) তাৎক্ষণিক অনুভূতির যে আনন্দঘন প্রেমঘন ব্যাপ্তি কবিতায় তারই প্রকাশ। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যে বৈচিত্রে মূর্ত হয়ে ওঠে কবিতা তারই ছন্দোময় চিত্র অনন্তের সামনে মেলে ধরে। তবে, যদি কোনো মহৎ আদর্শ কবিতায় দিতে পারে চেতনাদীপ্ত নতুন কোনো ধ্বনি ও ব্যঞ্জনার প্রেরণা, মুক্তির ছন্দ এনে দিতে পারে পায়ে তাহলে সেই আদর্শের বাহন হতে কবিতার কোনো সঙ্কোচ নেই।

২) আঞ্চলিক জীবনের প্রতিফলন পড়তে পারে কবিতায়, তা বলে কবিতা কোনো আঞ্চলিক সীমারেখায় বন্দী থাকবে না। কবিতা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। জীবনাশ্রয়ী কবিতা সকল মানুষের সার্বিক অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ।

৩) কবিতা ও ছোটগল্প কোনো সময় পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেও এটা তাদের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক হতে পারে না। নিত্যনতুন বৈচিত্র্য নিয়ে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে তারা পাশাপাশি চলবে। কেউ কারও নিজস্ব সত্ত্বা হারাতে চাইবে না কোনোদিন।

৪) পৃথিবীর অনেক সহজ কথাই আমরা অনেক সময় ঠিক ঠিক বুঝতে পারি না। একজন যোগীর কাছে যে কথা যত সহজ, একজন বৈজ্ঞানিকের কাছে যে কথা যত সহজ, সাধারণ মানুষের কাছে তা ততো সহজ নয়। কবি মাঝে মাঝে জীবনের এত গভীরে প্রবেশ করেন যে সেখানকার ভাষা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নাও হতে পারে। এতে দুঃখ করার কিছু নেই। মানুষ যখন একদিন সেই গভীরে পৌছবে. তখন কবির সেই ভাষা আর তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকবে না।

৫) না, আমার তা মনে হয় না। আমি কবিতা লিখব যতদিন না আমার শেষ কবিতাটি লেখা হয়। মাঝে মাঝে গতি মন্থর হতে পারে কিন্তু থেমে যাবে না একেবারে। যখন মনের কথাগুলো ঠিক ঠিক গুছিয়ে লিখতে পারি না, তখন নিজের কাছেই বাজে লাগে, তাকে কবিতার খাতায় তুলি না।

৬) কবিতা ও রাজনীতি পরস্পর বিরোধী। কবিতা বড় উদার। কিন্তু রাজনীতির পরিসর

খুবই সীমিত। আর্থচিন্তায় সর্বদাই উত্তেজিত, হিংস্র। রাজনীতির যদি কোনো মহত্ত্ব থাকে তবে তাও খুব প্রসারিত নয়। কোনো দল বা দেশের কথাই সাম্প্রদায়িক ভাবে চিন্তা করে রাজনীতি। কিন্তু কবিতা এত ব্যাপক যে, দেশ, মানুষ, জাতীয় সীমা মানে না। যদি সক্রিয় রাজনীতি করে কোনো কবি, তবে বুঝব তার কবিসত্তার মৃত্যু হয়েছে।

কোন প্রান্তে তুমি থাক

প্রদীপ বিকাশ রায়

অনেকদিন পার হয়েছি এই নদী, নদীর উপর সাঁকো
অনেকদিন হেঁটে গেছি এই পথ, পথের পরে পথ
তার কোন্ প্রান্তে তুমি থাক।
অনেকদিন রোববার দুপুরে, দুপুরের রোদে, দূরে
অনেক দূরে তাকিয়ে দেখেছি :
অনেক দূরের দেবদারু গাছ, গাছের পাতায় ঢেউ
গাছের নীচে স্তুপাকৃত ছায়া, ছায়া নয় পাতার মমতা ঝরে
মমতা কুড়াতে আসে যদি কেউ।
ঝিলমিল রোদ, রোদের আঙুল গাঙ্চিলের পাখায় যখন
সেতার বাজায় নরম আমেজী সুর, আমি কান পেতে থেকেছি
রোদের সেই মিহি সুরে যদি তুমি ডাক।
অনেকদিন তোমার রোদের্-পরাগ-মাখা মুখ দেখিনি
অনেকদিন হাত বুলাইনি মুখে
অনেকদিন আসনি দেবদারু তলে, অনেকদিন পাইনি কাছে
দুঃখে কিংবা সুখে।
অনেকদিন এই নদী পার হয়ে ভেবেছি, এই সাঁকো
ভেঙে গেলে বুঝি ভালো হয়
ফিরি না আর, ঐ পারেই ঘর বাঁধি, ঘরের কাছে ঘর
এপারে আর নয়।
অথচ কতবার ভেঙেছে এই সাঁকো, তবুতো ফিরে এসেছি
আবার এপার, নৌকো কিংবা সাঁতারে এই নদী পারাপার
আমি কোন্ পার ভালোবেসেছি?
অনেকদিন পার হয়েছি এই নদী, নদীর উপর সাঁকো
অনেকদিন হেঁটে গেছি এই পথ, পথের পরে পথ
তার কোন্ প্রান্তে তুমি থাক।

মানিক চক্রবর্তী

১) বিশেষ কোনো মত-টত-এর পেছনে কবিতা ইনিয়ে-বিনিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে—এসব দেখলে কবিতাকে আমার তথাকথ্য শহুরে ভদ্রমহিলার মতো মনে হয়। আমার মতে সার্থক কবিতা তীব্র কোনো তাৎক্ষণিক অনুভূতির জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়। কবিতায় আনন্দের অনুভূতিগুলো হয় তীব্রতর।

২) কবিতায় আঞ্চলিক জীবনের প্রতিফলন হতে পারে, এটা অস্বাভাবিক নয়। তবে তাই বলে আঞ্চলিক জীবনের উপাদান দিয়েই কবিতা শুধু কবিতা হয়ে ওঠে না। এটার প্রভাব হয়তো প্রয়োজন ভিত্তিক।

৩) সম্প্রতি কবিতা নিয়ে মাতামাতির অন্ত নেই। গল্প নিয়ে হয়তো এতোটা হচ্ছে না। কবিতার আকারে-প্রকারে নানা প্রকারের বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা চলছে। কারো কারো হাতে এভাবে সৃষ্টি হচ্ছে এক ধরণের 'গল্প-কবিতা'। এগুলো না কবিতা, না গল্প—অভিনব ধরণের কিছু। আমার মনে হয় এগুলোর সৃষ্টি সব ক্ষেত্রে প্রকৃত কবির হাতে নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর পেছনে রয়েছে 'কবিতা-লেখক'-এর হাত। তবে কবি যদি গল্প লেখেন (রবীন্দ্রনাথ) তাহলে সেই গল্পের ভেতর কিছুটা কবিতার অনুপ্রবেশ অস্বাভাবিক নয়।

৪) নানা কারণেই কবিতা দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে। শব্দ বিষয়বস্তু প্রভৃতির জন্যে কবিতা দুরূহ ঠেকতে পারে। এজন্যে পাঠকের পক্ষেও কিছুটা ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি। কিছুটা অনুশীলন দরকার। কবি ইচ্ছে করলেই কবিতাকে 'সহজ পাঠ্য' করে দিতে পারেন না। আবার ইচ্ছে করেই তাকে কঠিন করে তোলেন না।

৫) বাজার-হাট করার মতো বা সকালে খালিপেটে একগ্লাস জল খাওয়ার মতো কবিতা লেখার বিশেষ কোনো মানে নেই। ভালো লাগে বলে লিখি। আনন্দ পাই বলে লিখি। কবিতা লেখার দিন কয়েক পরেই ওগুলোর অনেক দুর্বলতা দেখতে পাই। খুব কষ্ট হয় তখন।

নিজের উপরেই তখন খুব রাগ হয়। তবু চেষ্টা করে দেখছি অন্তত একটাও ভালো কবিতা লিখে সুখী হতে পারি কিনা!

৬) রাজনীতির আমি কিছুই জানি না। দল-গোষ্ঠী এবং সক্রিয় রাজনীতি—এ ধরণের বড়ো কিছুর জন্যে কবিতার বিশেষ কোনো দায়িত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। সক্রিয় রাজনীতি কবি ও কবিতার স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতা বিনষ্ট করে।

সামিয়ানার ভেতর থেকে বাইরে

মানিক চক্রবর্তী

আমরা দু'জন মুখোমুখি বসে আছি অনেকক্ষণ
চোখের সামনে চোখ রেখে আমরা বসে আছি
বসে আছি আমরা সব।
শূন্য পেয়ালা-পিরিচ থেকে থেকে হয়রান
ক্রমশ না দেখা ধূসরে বিলীন।
টুং টাং কোনো শব্দ নেই। রাত্রির মতো সীমাহীন মগ্নতায়
আমি বসে আছি তুমি বসে আছ
হয়তো বসে আছে রাম শ্যাম যদু মধু
কিংবা আরো অনেকেই।
মাথার ওপরে শুধু আপন রমণীয় মগ্নতায়
এক চিলতে ছোট সামিয়ানা অকলঙ্ক নীলাভ গভীর।

আচমকা বোমার শব্দে রাজপথে প্রচণ্ড রুক্ষতা
কালো গাড়ি ধোঁয়া এদিক ওদিক দাপাদাপি করে
চারদিকে বন্যার মতো শুধু কোলাহল।

আমাদের নিজস্ব সামিয়ানা অসহায় ঝুলে আছে
যেন লাশকাটা ঘরে মৃত কোনো তরুণীর হাত।
আমি বসে নেই তুমি বসে নেই আমরা কেউ না।
আমাদের আপন আসনগুলো শুধু
কিছু ঘটে যাওয়া ইতিহাসের সীমানা বাড়ায়।
আমাদের প্রিয় সেই ঘনিষ্ঠ সময়
এখন শুধু স্নিগ্ধ বৃষ্টির মতো বুকের ভেতর
রমণীয় সেই অবসর।

এখন বাইরে শুধু চোখের মণিতে ব্যস্ত কম্পিউটার
এদিক ওদিক ছড়ানো ছিটানো রয়েছে হাজার হাজার!

জিতেন নাগ

১) দেখুন, আমার মতে ক্ষণিক অনুভবই কবিতা। চৈতন্যের গভীরে যে তাৎক্ষণিক উজ্জ্বল আলোড়ন তার সময়সীমা ক্ষুদ্র হলেও বিস্তার অনেকখানি, আর কবিতায় সুরের এই দীর্ঘ সন্তরণই আসল কথা। মতাদর্শ নিয়ে কবিতা লেখার দায় না নেওয়াই কবির পক্ষে মঙ্গলজনক। আমি এমন কথা বলছি না যে কোনো বিশেষ বোধ নিয়ে কবিতা লেখা যাবে না, তবে এই বোধের প্রকাশে প্রায়শই বক্তাকে দেখেছি কবিকে পাইনি।

২) আঞ্চলিকতা-ফাঞ্চলিকতা বলে কোনো বস্তু অন্তত কবিতায় আমি বিশ্বেস করিনে। ফলতঃ কবির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় যা তা হচ্ছে; কবিতা। কবিতা হল কি না সেটি দেখা, কোনো বিশেষ কিছুর প্রতিফলন-টলন নয়।

৩) কবিতা এবং ছোটগল্প কোনোকালেই এক হয়ে যাবে বলে আমার মনে হয় না। শিল্প দু'টি জাতধর্মের দিক থেকে অনেকটা কাছাকাছি তো বটেই, তবু এদের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক রয়েছে তা অস্বীকার করা যাবে কি? পরিশেষে বলি সাহিত্যে এই দু'টি জিনিস এক হয়ে যাওয়ার দিন বিলম্বিত হোক।

৪) কবি হিসেবে আমার ধারণা হচ্ছে কবি কোনো কবিতাকে ইচ্ছেমতো সুবোধ্য বা দুর্বোধ্য করতে পারেন না। অবশ্য অ-কবির ব্যাপার আলাদা। তাছাড়া সাধারণ্যে কবিতা পাঠক ক'জন? সুতরাং সৎ কবি তাঁদের বোধ এবং বুদ্ধির উপর ভরসা করতে পারেন কি?

৫) আমি চিরকালই মনে করি কবিতা লেখার কোনো মানে হয় না। আসলে ব্যাপারটি স্রেফ্ পাগলামি এবং প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগত। যেদিন বুঝবো যা লিখছি তা কবিতা হচ্ছে না, সেদিন কবিতা লেখার ল্যাটা কি চুকে যাবে না?

৬) রাজনীতি ব্যাপারটা আমি বুঝিনে, অতএব সেটা সক্রিয় হোক কিংবা নিষ্ক্রিয়

হোক—পরধর্ম ভয়াবহঃ!

এসো আমরা নত হই প্রকৃতির কাছে

জিতেন নাগ

এই দীর্ঘ উপত্যকা নির্জনে ফসলের মাঠ এখানে
সকল দুঃখ চাপা পড়ে আছে এসো আমরা নত
হই প্রকৃতির কাছে। প্রকৃতি সেও তো নারী!
সেও তুমি কিংবা তোমারই প্রচ্ছায়া, তবু তার
তার কাছে সরল স্বীকারোক্তি মন্দ নয়, এসো
নত হও।

মধ্যরাতে নির্ভুল খেলায় সকলেই স্বেচ্ছাচারী
নিজেদের পথ বেছে নিই, কে আর এসব কথা
মনে রাখে, পড়ন্ত বেলায় আমরা উদার হই।
অথচ দারুণ সন্দেহে তুমি চিরকাল অভিমানী
এ কোনো কাজের কথা নয়।

এখন এখানে কেউ নেই সহজ বাউল শুধু
গেয়ে যায় মাঠের ওপারে—এসো আমরা নত হই
শিল্পের কাছে, পরস্পর গাঢ়কণ্ঠে বলি আমাদের
কোনো পাপ নেই।

পীযূষ রাউত

১) গতকাল যে মানুষটা প্রিয় ছিল আজ সে সহ্যের অতীত, আগামীকাল হয়তো এ বোধও পরিবর্তিত হবে—মনটা আমার এই রকম। সুতরাং আপাত আমার কোনো মতাদর্শ নেই। অনুভূতির তারে যখন যে শব্দ ধ্বনিত হয় সেটাই ধরে রাখতে চেষ্টা করি।

২) বিজিৎ এই প্রথম আগরতলায় এলো। বললে—এই অঞ্চলে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। ওর প্রশ্ন—এগুলো কেন এযাবৎকাল এড়িয়ে গেলাম? আসলে এইসবের কোনো নামই তো আমার অনুভূতির তারে নাড়া দিতে পারেনি। বরাক, কাছাড়ের নদী, সেটা পেরেছে। জাটিঙ্গা, পাহাড় লাইনের সহচরী—সেও পেরেছে। আসলে স্বাভাবিকভাবে দেখা/অদেখা যে কোনো অঞ্চলই কবিতায় এলে তাকে গ্রহণ করতে কার্পণ্য করি না। বলা বাহুল্য স্বাভাবিকতার ধর্ম লঙ্ঘন করলেই যতো বিপত্তি।

৩) মনে হয় না কোনোদিন এক হবে। তবু যদি অঘটন ঘটে আপত্তি কি!

৪) এই প্রশ্নটাই আসলে বিরক্তিকর। জীবনানন্দের সেই বিখ্যাত উক্তির (সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি) অনুকরণ করে কথাটা এইভাবে বলতে ইচ্ছে করে, সকলেই কবিতার পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক। বস্তুত, এই কতিপয়ের কোনো অভিযোগ নেই।

৫) না। এটা এই গেল ১০ বছরে একবারও মনে হয়নি। কিন্তু কখনো-সখনো একটা স্বল্পকালীন/দীর্ঘকালীন দুঃসময় আসে, যখন কোনো লেখাকেই কবিতা বলে মনে হয় না। এবং নিজের অক্ষমতার জন্য এই সময় খুব কষ্ট হয়।

৬) রাজনীতি—যা নিয়ত পরোক্ষ/প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে ব্যাহত করে, মনকে ছোট; তার প্রতি আমার দারুণ ভয়। বইয়ের না, জীবনের রাজনীতিতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। এটা অবশ্য মানিয়ে নিতে না পারার অক্ষমতা। সকলে সকল জিনিসে আকর্ষণ বোধ করে না, এই সত্যে

বিশ্বাসী বলে নিজেকে অপরাধী মনে করি না। কবিতা একান্ত নির্জনের শিল্প। ভিড়, হৈ চৈ, স্বার্থ, ঘৃণা, রক্তপাত এগুলোকে সে দূর থেকে ভীরু চোখে দেখে। সক্রিয় রাজনীতি, আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি ও কবিতার চরম শত্রু।

ছায়া, ছায়া থেকে ছায়া

পীযূষ রাউত

১— ছায়া, ছায়া থেকে ছায়া, ছায়া, ছায়া থেকে ছায়া, ছায়া
দীর্ঘতর মরুরেখা, বহুদূর ধূসর স্বপ্নে এক খোঁড়া ভিখিরি
কেমন অক্লেশে হেঁটে গেলে ছায়া, ছায়া থেকে ছায়া।

২— একদিন পৃথিবীতে মানুষের বদলে অন্যকিছু, অন্যকিছু
কার মতো ইন্দ্রিয়ের অতীত এক একটি মানুষ; অনুভূতির
মধ্যে সুখের মতো দুঃখের সমীপে হাতজোড় করে
এক বৃদ্ধ বলেছিলেন—'এইবার মুক্তি দাও।'

৩— কি জানি কি যে সমস্ত সকাল অর্থহীন শব্দের মতো এই মাঠ,
এই বনভূমি জ্বলে উঠে পলকেই এক একটি অদ্ভুত
আলোক; রোশনাই তুমি, তুমি কি এমন তির্যক?

৪— শহরে আজকাল একই দৃশ্য : নেপথ্যে আমারই
পোশাক, মন ভিন্নকোটি পেণ্ডুলাম এপার-ঐপার;
বস্তুত এক নিখুঁত যুবক সহজেই বলেছিলো—
'আমি যে কোনো মহিলাকে খুন করতে পারি।'

৫— আমি আমার সবুজ গামছার মতো প্রত্যেকদিন জল
এবং রৌদ্রে অর্থাৎ জল থেকে রৌদ্রে। এক নৃপতি
বলেছিলেন—'আমি ঈশ্বরের কোমরে দড়ি বেঁধে এইখানে
বন্দী করবো ছায়া থেকে রৌদ্রে, রৌদ্র থেকে ছায়ায়।'

৬— ছায়া, ছায়া থেকে ছায়া, ছায়া থেকে ছায়া, ছায়া
এক সংঘবদ্ধ প্রেম : এক শিশুর ভাষ্যে—ছায়ার মধ্যে
দৌড়ে গেলে মাও বকবে না, বাবাও না।

বিমল দেব

১) তাৎক্ষণিক অনুভূতিকে কবিতায় যথাযথভাবে প্রকাশ করবার ঔৎসুক্য বোধ করি এটা অনেকাংশেই সত্যি। কেননা, কোনো কোনো বিশেষ সময়ের অভিজ্ঞতা যখন অনুভূতিকে প্রসব-যন্ত্রণার মতো পীড়িত করে তোলে ঠিক তখনই কবিতা লিখে উপশম পাই। তবে পারিপার্শ্বিকতা থেকে লব্ধ চরম অভিজ্ঞতাগুলোর চাপে অনুভূতি একটা বিশেষ কোনো রঙের ফিল্টারের মতো হয়ে গেছে। এই ফিল্টারটির যা রঙ সে শুধু সেই রঙের অস্তিত্ব গ্রহণ করে অন্য রঙ ছেড়ে দেয়। বিশেষ কোনো মতাদর্শ বলতে যা মনে হয় তা হচ্ছে ঐ ফিল্টার। কাজেই কোনো বিশেষ সময়ের অভিজ্ঞতা স্বভাবতই ফিল্টারের ভেতর দিয়ে গিয়ে কবিতায় প্রকাশ পায়।

২) কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখায় কবিতাকে আবদ্ধ না রেখে (অধিকাংশ বাংলা কবিতা প্রায়ই দেখা যায় কোলকাতা কেন্দ্রিক) বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার মুক্তি যেমন উচিত ঠিক সে কারণেই কবিতায় আঞ্চলিক জীবনের ছবি একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

৩) কোনো ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর মানসিক প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ নিয়ে যে ছোটগল্প আজকাল লেখা হচ্ছে সেটা আপাত কবিতার কাছাকাছি চলে গেলেও শব্দ নির্বাচন; ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গিতে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যেতে পারে বলে আমার ধারণা।

৪) বর্তমান যুগধর্মে আমাদের মানসিকতা স্বভাবতই অত্যন্ত জটিল। সম্পূর্ণ অজান্তেই তার প্রভাব কবিতায় পড়ে। তবে কোনো কবি (?) যদি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে কবিতাকে দুর্বোধ্য করে তোলেন তার কথা বাদ দিলে পাঠকের এ অভিযোগ কবিতার প্রতি সহৃদয়হীনতার জন্যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

৫) কবিতা লেখার কোন মানে আছে কিনা অথবা যা লিখছি তা আদৌ কবিতা হচ্ছে কিনা এ'সব প্রশ্নের উর্দ্ধে যে একটি সত্যকে চরমভাবে উপলব্ধি করি তা হলো, কবিতা অথবা অকবিতা যা-ই হোক, কিছু লিখতে পারলে মানসিক যন্ত্রণার উপশম হয় তাই লিখি।

৬) সমাজ ও ব্যক্তিজীবন অধিকাংশই পরোক্ষভাবে কখনো বা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত। এবং এই রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত জীবনকে বাদ দিয়ে যেহেতু কবিতার

কথা চিন্তা করা যায় না, কাজেই কোনো কবিতা রাজনীতির প্রভাবমুক্ত নয়। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে কোনো কবি যদি সক্রিয় ভূমিকা নেন তাতে রাজনীতি ও কবিতা লেখা কোনোটাই, সুষ্ঠুভাবে হয় না।

ভাবীকাল

বিমল দেব

স্মৃতির আকাশ থেকে
উল্কাপাতের মতো খসে গেলে
কিছু খাজুরাহো-রাত্রি
ক্ষয়ে ক্ষয়ে কঠিন বিজ্ঞাপিত দিন
আবেগ প্রজাত ফসল জমে
কী দারুণ রহস্যে স্ফীত লজ্জার রূপ।

কোন জাফরানি রাত্রে ঘনীভূত স্বরে
কবি-বন্ধু বলেছিলো স্ত্রীকে;
'নবনীতা, তোমার এই
আদিম অলিন্দে মৌন
এক বর্ধিষ্ণু ভাবীকাল—'

অধিকারের জ্বালামুখ থেকে
অত্যুষ্ণ লাভাস্রোতে দুর্দাম বেগে
ভাসিয়ে নিলো—
প্রপিতামহের পবিত্র আশ্রম
ঠাকুর্দার বিশাল তোরঙ আর
পিতার নিষ্ঠুর অহংকার,
অথচ গর্বিত আমরা
'রেখে গেলুম কিছু অক্ষয় কীর্তি।'

ক্ষয়ে ক্ষয়ে কাল অর্পিত অরূপে;
অনিবার্য স্রোতে ভেসে ভেসে
আমরা অসহায় পিতামাতা
অক্লেশে ভিড়ে যাবো—
অদূরে প্রাচীন বন্দর।

স্বপন সেনগুপ্ত

১) কবিতায় মতাদর্শের প্রকাশ মানেই কবিতাকে সহজ পথে প্রকাশে বাধা সৃষ্টি। তার চেয়ে তাৎক্ষণিক অনুভূতির প্রতিই আমার লোভ। কেননা, কবিতা অনুভূতির উচ্চারণ বলেই আমি বিশ্বাস করি।

২) একান্ত প্রয়োজনীয় নয়। অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে গেলে কিংবা আন্তরিক অর্থে—আলাদা কথা।

৩) সাহিত্য শব্দটাই বড়। ক্লাসিফিকেশন গৌণ। মাথা ঘামানো বৃথা।

৪) জীবনের আঙ্গিক চর্চার দিকে তাকানো উচিৎ। এ প্রশ্ন নিতান্তই বাজে এবং ২০বছর আগের।

৫) না। প্রতিটি দুর্লভ সেকেণ্ডের জন্যেই বরং আমি অপেক্ষা করে থাকি। আমার প্রতিটি লেখাই আমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করে।

৬) মনে হয় না।

পাগ্‌লা বেলা

স্বপন সেনগুপ্ত

একদিন আমারও স্বপ্নের মতো বাড়িঘর নক্ষত্র এলাকা ছিল
নিলামে কেনা কিছু আতপ গগন সেখানে রাজার মতন
গোপন ও নকল সুখে মহারাজ বিগলিত কিছুকাল বিবাহের মতো।

গগন মিস্ত্রী বলেছিল, রাজা দুর্গ গড়ে ফেলো।
তখন তখন চোখ খোলেনি, কানের ভেতর চোখ ছিলনা,
পেটের ভেতর বড়ি। বাদ সাধলো পোড়া কপাল
যুদ্ধ ফেরৎ বিশ্বকর্মা হাতের রেখা পায়ের পদ্ম একসাথে সব
লেবল; করছি। গণৎকারের লম্বা চিঠি খামের ভেতর গারদখানা
গোলাপজলে মুখ ধোয়া তাই আর হলোনা; বাইরে এলেম—

এতো আমার বাপের কেনা নয়, নিজের কেনা
আপশোষে তাই ঘুম ভেঙে যায় মধ্যরাতে। বাসস্থান কি
এতোই কাঁচা, যেমন খুশি পাক ঘোরালে
আকার নেবে বলের মতো?

অমন কোরে জব্দ হব, যুদ্ধ জাহাজ গভীর রাতে
দিক হারাবে, কে জানতো এই পাগ্‌লা বেলা?

রণজিৎ দাশ

১) 'আদর্শ' শব্দটিকে আমি বরাবরই আমার অভিধান থেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করি, সুতরাং মত + আদর্শ = মতাদর্শ—এই শব্দটি, তার প্রচলিতার্থে, আমার পদ্যচর্চার চৌহদ্দিতে বিশেষ আসে না, বিশেষত আজকের কবিতার ঝোঁক যখন একান্তই ব্যক্তিগত হওয়ার দিকে। আর, কবিতা অনুভূতির প্রকাশ তো বটেই, তবে 'তাৎক্ষণিক' বিশেষণটিতে আমার ঘোর আপত্তি। আশা করি এই আপত্তি একই সঙ্গে তার কারণবাহীও। যেহেতু আপনার প্রশ্নে আপনি 'উৎসুক' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেই হেতু, কিঞ্চিৎ ধৃষ্টতা মার্জনা কবলে বলি, এই প্রশ্নের দু'টি পিঠই কবিতার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ মাত্রা অতিক্রমের পর গৌণ—আমার তা-ই মনে হয়। আসলে কবিরা শব্দ ও ভাষার শরীরে সেই চূড়ান্ত হরিণশিশুটি খুঁজে বেড়ান, বহু বিচিত্র কৌশলে এবং অক্লান্ত ভাবে—অনেকটা নারীর শরীরে ভালোবাসা খোঁজার মতন—সেই পরম উন্মীলন, যাকে বলা হয়েছে 'অনির্বচনীয়'। প্রথম প্রশ্নের শেষ 'কেন'টির, ভেবে দেখবেন, বস্তুত কোনো উত্তর হয় না।

২) দ্বিতীয় প্রশ্নের অব্যবহিত পূর্বে আর একটি প্রশ্ন উহ্য থেকে যায়—আমি কবিতায় আদৌ কোনো কিছু প্রতিফলিত করতে চাই কিনা, অর্থাৎ 'প্রতিফলন' শব্দটির তাৎপর্য নিয়ে দ্বিধা জাগে। তবু সাধারণভাবে বলা যায় কবিতায় যদি কিছু অকপটভাবে প্রতিফলিত হয় তা হল নিজের জীবন এবং আমার জীবন কি আঞ্চলিক নয়? আমি কি শিলচরে বসে কখনো লিখবো 'শব্দ আমার ট্রামভাড়া দেয় ...'? এই নেতিবাচক অর্থেই আমার আঞ্চলিকতা, কারণ আমি যা লিখতে চাই তা হবে ব্যক্তিগত, পরিশুদ্ধ এবং নগ্ন, আঞ্চলিকতার ঘাঘরা ও ঘুঙুর পরিয়ে তাকে বাজারসই না করলে যাঁদের মন উঠবে না, তাঁদের তৃপ্তি বিধায় আমি বিনীত হাতে তাঁদের দিকে বাড়িয়ে ধরব কাছাড়ের সচিত্র ভূগোলখানি। সম্প্রতি এই প্রশ্নটি নিয়ে কাছাড়ের পত্রপত্রিকায় আমার চাইতে যোগ্যতর ব্যক্তিরা বিস্তৃত আলোচনা করছেন, আমি আর পুনরুক্তিতে যাচ্ছি না।

৩) বিলকুল প্রমাণাভাবে এই উপপাদ্যের সত্যতা আমি স্বীকার করি না।

৪) 'সাধারণ পাঠক' কবিতা সম্পর্কে কি বলে না বলে, সে বিষয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। খবরকাগজ পড়তে পারলেই কবিতা পড়ার এবং তৎসম্পর্কে রায়দানের অধিকার বর্তে যায়—এই গুরুতর ভুল ধারণাটির আশু উৎপাটন প্রয়োজন। আজকের কবিতা, আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে যা একপ্রকার ব্যক্তিত্বপ্রধান অ্যান্টি সায়েন্স-এর পর্যায়ে পড়ে, তার জগতে প্রবেশ করতে গেলে যে কোনো পাঠককেই সেইমতো শিক্ষিত ও হৃদয়শালী হতে হবে। সেদিক থেকে 'দুর্বোধ্যতা'কে ধন্যবাদ, কবিতার শুদ্ধতাকে সে প্রবলভাবে হীন জনপ্রিয়তার মারাত্মক ছোঁয়াচ থেকে বাঁচিয়ে রাখছে। অন্যভাবে, এক্ষেত্রে 'দুর্বোধ্যতা' শব্দটির একটি সঙ্গত প্রতিশব্দ ধরা যেতে পারে 'রহস্যময়তা'—যা চিরকালীন কবিতার প্রাণবস্তু। আমি বোধহয় আপনার প্রশ্নটি থেকে একটু দূরে সরে গেছি। কোনো সৎ কবি কখনো 'ইচ্ছে করে কবিতাকে দুর্বোধ্য করেন'—আমি তা মনে করি না।

৫) আমার তো মাঝে মাঝে এ'কথাও মনে হয় যে, বেঁচে থাকার-ই কোনো মানে হয় না—কিন্তু বেঁচে তো থাকছি! তবে, যা লিখছি তা আদৌ কবিতা হচ্ছে কি না—এই তীব্র সংশয় পরিপাটি চুলের নিচে গোপন খুস্কির মতো সারাক্ষণ সঙ্গেই ফিরছে।

৬) হ্যাঁ।

ব্যক্তিগত দিক্‌নির্দেশ

রণজিৎ দাস

তুই কি উত্তরে যাবি? দেখিস সেদিকে
কৃষিবিপ্লবের আগে দীর্ঘ ধানক্ষেত জুড়ে কলরোল, তাপ
অদূরে তরণী, সেথা ঠাঁই নাই তোর

তুই কি দক্ষিণে যাবি? দেখিস সেদিকে
সমাধিফলকে ভারি আভাঁ-গার্দ ছায়াচিত্র
অদূরে প্রহরী, অন্ধ অয়াদিপায়ুস

তুই কি পশ্চিমে যাবি? দেখিস সেদিকে
মৃত বাদুড়ের ঠোঁটে তোর প্রিয় ডাকনাম
রহিমপুরের পথে ফেলে আসা নীলিমার বৃষ্টিভেজা আলো
অদূরে সূর্যাস্ত, তোর শয্যাসঙ্গী নাই

অমৃতের পুত্র, তুই ভিখিরির মতো হেঁটে
সপ্রতিভ পূর্বদিকে কখনো যাবি না।

মনোতোষ চক্রবর্তী

১) বিশেষ কোনো মতাদর্শে আমার আস্থা নেই। বিশুদ্ধ এবং খাঁটি অর্থে আমি স্বতোৎসারিত কবিতার পক্ষপাতী।

২) এক শ্রেণীর পাঠক ভূগোল মিলিয়ে কবিতায় আঞ্চলিকতা খোঁজেন। এ বড়ো অসহনীয় মূর্খামি। কবিতায় বরাক নদী কিংবা মালিগাঁওয়ের রেলকলোনির উল্লেখ থাকলেই তা আঞ্চলিক আর সমসাময়িক জীবনবোধের প্রকাশ ঘটলেই কলকাতার প্রভাব—এর চেয়ে হাস্যকর আর কি হতে পারে?

৩) কবিতা ও গল্প দুই ভিন্ন রীতি। তাদের স্বাতন্ত্র্যের সীমা এখনও লঙ্ঘন করেনি বলেই আমার বিশ্বাস। অন্তত পড়ার পর গল্প ও কবিতা আলাদা চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

৪) ইচ্ছে করলেই কবিতাকে দুর্বোধ্য করা যায় না। আর, কোনো কবিতাই দুর্বোধ্য নয়—দুরূহ।

৫) যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে চাইছি, তাতে সফল হতে পারছি না বলেই মাঝে মাঝে মনে হয় যা লিখছি তার কোনো মানেই হয় না এবং সংশয় জাগে আসলে এগুলো আদৌ কবিতা হচ্ছে না। কিন্তু তবু আমি প্রচণ্ড আশাবাদী।

৬) বিশুদ্ধ শিল্পের জন্য যাদের নিরন্তর প্রয়াস তাঁরা রাজনীতি কেন, অন্য কোনো কিছুর সঙ্গেই অকৃত্রিম ও সৎভাবে লেগে থাকতে পারেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

আর কি আমি মুখ ফেরাতে পারি

মনোতোষ চক্রবর্তী

নারী,
আর কি আমি মুখ ফেরাতে পারি
তুমি—যখন যোজন দূরে
আগলে পথ দাঁড়াই ঘুরে
        প্রতিধ্বনি দাঁড়াও, দাঁড়াও
শূন্যে-জলে-স্থলে কাঁপে
অবিশ্বাসের পর্দা ঠেলে যাও।
        নিমজ্জমান পাপে—
আমি, আকণ্ঠ উন্মুখ
দুঃখে পোড়ে বুক
দেখি তোমায় যাই না কাছে আর
চতুর্দিকে কেবল-ই তিরস্কার।

নারী,
আর কি আমি মুখ ফেরাতে পারি
চতুর্দিকে জরা
কঠিন প্রহরা
মিথ্যা মায়া, আলোর ঝল্‌কানি
আকাশ-তারা-বাতাস-ঝিঁঝি পোকার কানাকানি
তুমি রক্ষে করো আমায়, তোমার নীরবতা
কাম্য আমার কঠিন সংগ্রামে
জড়িয়ে তোমায় আজকে পরিণামে

লাভ হলো এই তীব্র অপমান
বন্ধ করো সব পুরোনো গান
স্মৃতি—মুখ ফিরিয়ে হাসে
জটিল সর্বনাশে
মুখ পুড়েছে তার
বুকের ভেতর তবুও সংসার
হাতছানি দেয়, হাতছানি দেয়তারে
আহা-রে সুখ, সুখ পেলে না—দ্বারে—
ঝুলছে নোটিশ দারুণ অহংকারে
বিক্রি হবে নষ্ট স্মৃতি কোমল অন্ধকারে।

জোনাকি
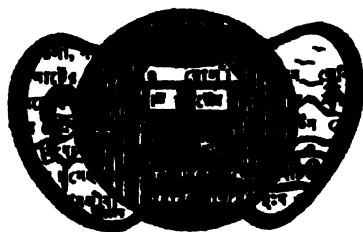
কবিতার কাগজ ● সংকলন—১০ ● শরৎ পর্যায়—১৮

জোনাকি

নবম বর্ষ ● দশম সংখ্যা ● শরৎ পর্যায় ১৯৭১

অনিয়মিত কবিতা পত্রিকা।।

সম্পাদক—পীযূষ রাউত।
প্রকাশক—সৈকত রাউত।
প্রকাশ স্থান—পূর্ব গোবিন্দপুর। কৈলাসহর। উত্তর ত্রিপুরা।
যোগাযোগের ঠিকানা—কল্যাণপুর। পশ্চিম ত্রিপুরা।

সম্পাদকের বক্তব্য—

● পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী পূর্বাঞ্চলের কয়েকজন কবির কবিতা লেখার গূঢ় ইতিহাসসহ নির্বাচিত কবিতার প্রকাশ পূর্ণাঙ্গরূপে এ সংখ্যায় দেয়া গেল না। দায়িত্ব সম্পাদকের নয়, কবিদেরই। যাঁদেরকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, খুবই দুঃখের ব্যাপার, তারা সহযোগিতা করেন নি।

● ছাপার অক্ষরে বহুল প্রচলিত নামের কয়েকজন কবি (!) অথবা যাঁরা পত্রিকায় প্রকাশ করার সময় হলেই লেখেন অথবা যাঁদের লেখার মান সম্পর্কে সম্পাদকের যথেষ্ট আস্থা নেই, দুঃখের ব্যাপার, তাঁদের কবিতা প্রকাশ করা গেলনা।

● কয়েকজন কবি, যাঁরা কবিতা পাঠিয়েছেন, অনিবার্য কারণে তাঁদের কবিতা বর্তমান সংখ্যায় দেয়া গেল না। পরবর্তী সংখ্যায় কবিতাগুলি প্রকাশিত হবে। ঐ সংখ্যা প্রকাশিত হবে ১লা জানুয়ারী, ৭২ তারিখে। লেখকরা হলেন—পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, শম্ভু রক্ষিত, অমরনাথ বসু, অজিত বাইরি, প্রদীপ দাশ শর্ম্মা, পান্নালাল রায় এবং বিজয় কুমার দেববর্মণ। এবং বাংলাদেশের কবি নৃপেন্দ্রলাল দাশ।

স্বপন সেনগুপ্ত

জুড়িগাড়ি ফিরে গেলে

বিধিহীন বিধাতার খাঁচা এখন রোদ্দুরে খালি।
স্বগত বিষাদের মতো নীল ঝুল মমতায় বোনা,
প্রতীক্ষা এখন শুধু রাত্রিশেষে জুড়িগাড়ি
অশব্দ চাকায় কখন দাঁড়াবে—
দেবদূত সযত্ন ঘৃণায় তুলে নেবে হাতে
ঝুলে-ঝালে ঢাকা দ্রাবিড় নিশান।

অলক্ষ্যে অজস্র প্রহরী এসে জড়ো হবে—
সভা হবে রাতে
বিষাদ প্রেয়সী কেন অনোটিশ
ফিরে গেলো, অপরাধ কতো গাঢ় কার!
নিমতলায় শেষবারের মতো কালো চাদর
তুলে নিতেই সমুদ্রের ফণা ভেঙে জন্ম নেবে
আফ্রেদিতি প্রণয়ের মগ্ন লাল সিঁড়ি।
নিমগ্ন লাল সমুদ্র থেকে মাস্তুলের শীষ
জেগে ওঠার আগেই অনেক পাখি ফিরে যাবে—
কাতর রাতের শোক
প্রলাপের মতো পাখায় পাখায়
কান্নার শব্দ করে ছুটে যাবে তোলপাড় সখেদ;
অথচ রাত্রিশেষ জুড়িগাড়ি চিহ্নহীন পথে ... ...

স্বপন সেনগুপ্ত ০

কবিতা লেখার সূত্রপাত বিষয়ক সংলাপ

কখন কিভাবে প্রথম কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম আজ আর মনে নেই। সে ঘটনা বা দুর্ঘটনা আজ থেকে কমপক্ষে ১৭/১৮ বছরের পুরানো। লেখার চেয়ে কবিতা পড়ায় আমার ঝোঁক এখনও আগের মতোই তৎপর। যখন বড় হলে বুঝতে পারি একমাত্র কাব্য চেষ্টাতেই আমার নিহিত অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবো তখন কবিতা পায় পায় আমার অনেক নিকটে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। তবে আমার চারপাশের তীব্র প্রতিকূলতায় ঘৃণায় আমি যখন বিষণ্ণ এবং রণক্লান্ত তখন যে আমার এই বোধ অর্থা কবিতা চর্চা লালনে অসীম সহযোগিতা করেছে, যার ঋণ আমি আজন্ম ভুলতে পারবো না—তার নাম বনপ্রভা সিন্‌হা। যদি বিশেষ কোনো কৃতিত্বের পরিচয় আমার কোথাও থেকে থাকে তবে সে কৃতিত্বের প্রথম দাবীদার নিঃসন্দেহে বনপ্রভা।

প্রদীপ বিকাশ রায় ●

প্রিয় আমি

নিজেব কাছ থেকে সরে দাঁড়ালেই নিজেকে চেনা যায়
নিজস্ব এক বিশেষ আয়নায়
চেনা যায়, আমারই ভেতর ভরে আছে শূন্য আকাশ
মগ্ন নিবিড়তায়
বুঝতে পারি, চরণতলের প্রতি ধূলিকণা
আমার কত প্রিয় কত আপন
বুঝতে পারি, আমারই মধ্যে 'প্রিয় আমি' ছিলাম সংগোপন।
নিজের ঘরে ছিলাম যখন সঙ্গীবিহীন মাথার উপর
অহংকারী ছাদ
বাইরে এসে আকাশতলে পেয়ে গেছি
গোপন হাওয়ার স্বাদ
ভূলুণ্ঠিত ভালোবাসা কে শেখালে প্রিয় নামে এমন
কাঙালপনা
আমি কি আর তেমন পথিক
সন্ধ্যা হলে চেনা ঘরটি নিজের বলে আর চেনব না।

প্রদীপ বিকাশ রায় ●

কবিতা লেখার গূঢ় ইতিহাস

ছাত্রজীবনে কখনো কবিতা লেখার চেষ্টা করেছি কি না মনে পড়ে না। বেকারজীবনে কূল পাবার আশায় মরিয়া হয়ে যখন চট্টগ্রাম শহরে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম, সেই সময় দারুণ একটা ঘটনা ঘটে গেল। সেদিন ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯ খৃঃ। সকাল থেকেই 'ভুলি নাই ভুলি নাই প্রিয়'—লাইনটা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছিল। কিসের যেন একটা আবেদন। একেই কি প্রেরণা বলে? হয়তো তাই, নইলে সেদিন দুপুরবেলা ঐ লাইনটাকে নিয়ে অমন ছন্দ মেলাবার খেলায় মেতে উঠলাম কেন? মগজের ভেতর যে কয়টা শব্দ বেজায় গজগজ করছিল সেগুলো একটার পর একটা সাজিয়ে ছন্দের পর ছন্দ মিলিয়ে এইভাবে প্রায় ত্রিশ লাইনের একটা কবিতা লিখে ফেললাম। কবিতাটার বিষয়বস্তু ছিল একজন জননেতার মৃত্যুদিবস উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন। বিষয়বস্তু যা-ই হোক না কেন, শ্রদ্ধা কতোটুকু প্রকাশ হয়েছিল তাও বিবেচ্য নয়, শুধু আবেগ আর উচ্ছ্বাসের স্রোতে এরকম একটা শব্দধারা রচনা করতে পারব কখনো ভাবিনি। নিজের কাণ্ড দেখে নিজেই অবাক হয়েছিলাম সেদিন। বন্ধুর মতো এক ভদ্রলোককে কবিতাটা দেখালে তিনি খুব তারিফ করলেন এবং কবিতাটা একটা পত্রিকায় দিতে বললেন। কি জানি, বোধহয় আমার মন রক্ষার জন্য ভদ্রলোক—ভদ্রলোক যা-ই বলুক, আমার প্রবল ইচ্ছাকে আমি ঠেকাতে পারিনি। সঙ্গে সঙ্গে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর অফিসে কবিতাটা দিয়ে এলাম। পরদিনই উক্ত জননেতার মৃত্যুদিবস উপলক্ষে আজাদীর বিশেষ সংখ্যায় আমার কবিতাটা দেখে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনায় ভরে উঠেছিল মন। জীবনের প্রথম কবিতা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ হওয়া কি কম কথা! ক'জন কবির ভাগ্যে এরকম ঘটে! কিন্তু এতোটা উৎসাহ

পাওয়া সত্ত্বেও তারপর প্রায় বছর দু-একের মধ্যে আর কবিতা লেখা হয়নি। দু'বছর পর আবার কবিতা লেখা শুরু করলাম ঢাকায় গিয়ে। একদিন কবিবন্ধু কামাল-বিন-মাহতাবকে দেখালাম আমার দু-তিনটে কবিতা। কামাল মন্তব্য করলেন, এ ধরণের কবিতা আজকাল একেবারে অচল। তিনি আমাকে কিছু আধুনিক কবিতা পড়ার পরামর্শ দিলেন। বস্তুত তখন থেকেই আমার সত্যিকারের কবিজীবনের সাধনা চলতে থাকে। তারপর একে একে 'মহিলা', দৈনিক সংবাদ' প্রভৃতি ঢাকার বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় আমার কবিতা উঠতে লাগল। ১৯৬৪-তে ত্রিপুরায় এসে কবিতা বিষয়ে গভীরতর চিন্তাভাবনা করতে শিখি কবি পীযূষ রাউতের প্রবল সান্নিধ্যে। এই ভাবেই আমার কবিজীবনেব সূত্রপাত হয় এবং এই ভাবেই টিম্‌টিম্ করে জ্বলতে থাকে এই ছোট্ট প্রদীপ।

নিতাই আচার্য্য ০

অনাগতের প্রতীক্ষা

সোনার হরিণ নাকি মায়ার হরিণ দেখে, তুমি বলেছিলে;–
এখন অযোধ্যার রাজা সেজে—মায়ার গলা টিপে
পঞ্চবটী জয় করবো, আর কী পরীক্ষা চাও, আমার
চারদিকে রাক্ষসের দল—ভয় পাই না আমি। একখণ্ড
আত্মবিশ্বাস কঠিন সমুদ্রের উপর তর্জনী রেখে অনায়াসে
লঙ্কা পৌঁছে যাব—লঙ্কা বহুদূর নয়, আমার
কাঙ্খিত বস্তু সোনার সিংহাসনে যদি বা—সিংহাসন
আমার হাতের পাঞ্জায়, দিন দুই অপেক্ষা করো,
সোনার হরিণ নাকি মায়ার হরিণ দেখে, তুমি বলেছিলে;–

নিতাই আচার্য্য ●

আমার কবিতা লেখার ইতিহাস

কবিতা লেখার চাইতে পড়ার ঝোঁক ছিল বেশী রকম। বস্তুত, ১৯৬৮ সালের আগে কবিতা লিখিনি—খাঁটি কথা। কবিতা লিখবো বা লিখতে পারবো এ রকম সাহস উল্লিখিত সালের পূর্ব পর্যন্ত ছিল না। তারপর শিক্ষকতা করতে গিয়ে কয়েকজন সতীর্থের (যাঁরা সাম্প্রতিক কালে কবিতা লিখছেন) পীড়াপীড়িতে কিছু সংখ্যক প্রেম ও কল্পনাশ্রয়ী কবিতা লিখলাম বিশেষত রাবীন্দ্রিক ঢঙে। খুব সহসাই ঢঙ পাল্টে লিখতে শুরু করলাম ওদেরই নির্দেশে। কিন্তু কথাটা না বললেই নয়, আমি নিজেও উপলব্ধি করলাম—এ যেন কবিতা হয়েও কবিতা হচ্ছে না। ক্রমে একটা প্রত্যয় জন্মেছিল—কবিতা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব।

কিছুকাল পর সৌভাগ্যবশত প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিক শ্রী পীযূষ রাউতের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পেলাম। ওরই ক্রমাগত উৎসাহ ও সক্রিয় সহায়তায় ইদানিং কবিতা লিখে যাচ্ছি। এ বড়ো কম লাভ নয়। তবে, বোধহয় এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল; অর্থাৎ কিনা সেলফ্ প্রপাগাণ্ডা; সাম্প্রতিক কালের গদ্যছন্দে কবিতা লিখতে গিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার প্রচেষ্টা বরাবরই আছে। অনুকরণ সবসময় খারাপ জিনিস নয়—তবুও কবিতার ব্যাপারে একে যথাসম্ভব বর্জন করলে মন্দ হয় না। আর একটি বক্তব্য রাখার ইচ্ছে আছে—বক্তব্য, আমার নেহাৎই দুর্বলতা। কবিতা প্রকাশ করতে আমার ভীষণ সংকোচ এবং ভয়। ভয়—পাছে অখাদ্য বিবেচিত হয়ে বিষক্রিয়া করে। এখন লেখার ব্যাপারে উত্তেজনা ও আনন্দ দুই'ই পাই—পড়তেও।

পীযূষ রাউত ●

গতিবিষয়ক কবিতা

আমি কোথায়
কোথায় আমি—আমার প্রশ্ন উদাসীন পর্বতমালায়
গর্জন তুললো—হেই, আমি কোথায়
কোথায় আমি?
আমার পায়ের নীচে এক বিষাক্ত কেঁচো। আমি চমকে উঠে ভয়ে লাফ দিয়েছি।
এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসভর্তি বেলুনের মতো শূন্যে উঠতে উঠতে আমি একসময়
সশব্দে ফেটে গেলে
আমার দেহ
নীচে পড়ছে তো পড়ছেই
পড়ছে তো পড়ছেই ... ...।
আমি কোথায়
কোথায় আমি—আমার প্রশ্ন উদাসীন পর্বতমালায়
গর্জন তুললো—হেই, আমি কোথায়
কোথায় আমি?
আমি একদিন সর্বজ্ঞ পণ্ডিত, দশহাজার শ্রোতৃমণ্ডলী পরিবৃত মঞ্চে আরোহণ করলাম।
এবং—আমার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ—এইমাত্র বলার

সঙ্গে সঙ্গেই আমার গলার উপর রুলার চেপে বসলো। কোন্ দুর্মুখ শ্রোতা আমার মুখের
উপর পচা ডিম ছুঁড়ে মারলো। সঙ্গে সঙ্গে
আমি তিন লাফে মঞ্চ ও হলঘর পেরিয়ে পথে নেমে যেই না থামতে গেছি,
দেখি, কে যেন আমার শরীরের মধ্যে ব্রেকহীন মোটরের ইঞ্জিন লাগিয়ে
দিয়েছে। ভীষণ জোরে আমি দৌড়ুচ্ছি। মাত্র কুড়ি হাত দূরে
কলকাতার খুনে রাজপথ। সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো পলকেই। অথচ
আমি দৌড়ুচ্ছি তো দৌড়ুচ্ছিই
দৌড়ুচ্ছি তো দৌড়ুচ্ছিই ... ...।
আমি কোথায়
কোথায় আমি—আমার প্রশ্ন উদাসীন পর্বতমালায়
গর্জন তুললো—হেই, আমি কোথায়
কোথায় আমি?
একদিন আমি আমার অপুষ্ট শিশু-শরীরকে আমার মায়ের কোলে দেখলাম
কি রকম খলখলিয়ে হাসছে। আর গাছ এবং রোদ্দুর এবং আকাশ দেখছে।
তারপর হঠাৎ একদিন
পৃথিবীতে কিরকম একটা ওলট পালোট হয়ে গেলে আমার মা আমাকে একটা
বিপন্ন নদীতীরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল। আমি তখন অনর্গল
চিৎকার করে কাঁদছি। এবং ওদিকে তখন নদীতে ক্রমশ
জল বাড়ছেতো বাড়ছেই
বাড়ছে তো বাড়ছেই ... ...।
আমি কোথায়
কোথায় আমি—আমার প্রশ্ন উদাসীন পর্বতমালায়
গর্জন তুললো—হেই, আমি কোথায়
কোথায় আমি?

এবং জল বাড়লো।

অথচ এ এক অদ্ভুত বিস্ময় আমি ডিউক ও পিনাকির মতো দাঁড়টানা
নৌকা বেয়ে ম্যান ও ওয়ার জেটি থেকে তীব্রস্রোত গঙ্গা অতিক্রম করে করে
এখন আমি পাহাড় পাহাড় ঢেউ সমুদ্রের মধ্যে।

আমি কোথায়
কোথায় আমি ... ... আমার আর্ত ও নিস্তেজ প্রশ্ন সমুদ্রের গর্জনের মধ্যে
হারিয়ে গেলে
এখন আমি স্পষ্ট মনে করতে পারি পোর্টব্লেয়ার দূরে নেই।

পীযূষ রাউত ●

কবিতা লেখার গূঢ় ইতিহাস

(১৯৫৭ সালে যখন স্কুলের উপরের ক্লাশের ছাত্র তখন সমবয়সী একটি মেয়ের উদ্দেশ্যে, যার চেহারা ছিল সিনেমার সন্ধ্যারাণীর মতো, কবিতা লিখে লাঞ্ছিত হই। কবিজীবনের শুরু এইভাবে। প্রথম লেখা এই কবিতাটির কোনো পাণ্ডুলিপিও নেই, একটা পংক্তিও আজ মনে করতে পারিনা।)

(পরের বছর শিলচর থেকে ১৫ মাইল দূরে গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। গ্রামের নাম ছোটজালেঙ্গা। গ্রামটিকে ঘিরে অজস্র ছোট ছোট চা বাগান। আমাকে এক ভিন্ন পৃথিবীর স্বাদ দিল এই নোতুন পরিবেশ। শহর থেকে এই গ্রামে চলে আসাটাই আমার জীবনে আশীর্বাদ নিয়ে এলো। এক নোতুন অনুভূতির সুখ ও যন্ত্রণা আমাকে সুখী করে তুলল। বলা দরকার এই বিশেষ গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে গ্রাম সম্পর্কে আমাদের যে প্রচলিত ধারণা তার কোনো মিল নেই।)

যে স্কুলে ভর্তি হলাম তার নাম প্যারিচাঁদ বড়জালেংগা হাইস্কুল। সেদিন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম, যেদিন আবিষ্কার করলাম আমাদেব ক্লাসের ২০ জন ছাত্রের মধ্যে অনেকেই গল্প-কবিতা লেখে। তারা এমন সব লেখকের লেখা পড়ে যাঁদের লেখা কোনোদিনই আমি পড়িনি। এই বিরল বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন হলেন সর্বশ্রী পরেশ দত্ত, রম্যেন্দু দে এবং রামানুজ ভট্টাচার্য। ওদের উষ্ণ সান্নিধ্য আমাকে কষ্ট দেয়, দুঃখিত করে তোলে, আমার ভীষণ লিখতে ইচ্ছে করে। হঠাৎ করে একদিন লিখেও ফেললাম। না, কবিতা নয়, ছোটগল্প। বন্ধুরা বাহবা দিল। এই শুরু।

এই নোতুন আবেষ্টনীতে যার প্রভাব আমাকে সবচেয়ে বেশী উদ্দীপিত করেছিল তিনি হলেন কবি শীতাংশু পাল। শিলচর গুরুচরণ কলেজের ছাত্র। প্রখ্যাত এবং অধুনা নেপথ্যচারী কবি শ্রী করুণাসিন্ধু দে এবং ত্রিদিব মালাকারের সহপাঠী। শীতাংশু পালের বাড়ি ঐ গ্রামেই। (কবি শীতাংশুর ইমেজ আমার মনের মধ্যে নায়কোচিত ছিল। কবিতার নায়ক। বলা বাহুল্য, শীতাংশুর নিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করত। মনে পড়ে অনেক জোছনা রাতে বাঁশঝাড়ের ঘন ঝোপের নীচে তার কেরোসিন টিনের চাল, বাঁশের বেড়ার ঘর, ঘরের ভেতর অমূল্য সাহিত্য সংগ্রহ এক দুর্দান্ত আকর্ষণে আমাকে টানত। শীতাংশু তার সংগ্রহ থেকে জীবনানন্দ, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্র দত্ত প্রমুখের কবিতা পড়ে শোনাতেন। একমাত্র শীতাংশুই না। কবিতা পড়তেন হৃষিদা (শ্রী হৃষীকেশ সেন), প্রমথেশ দা (শ্রী প্রমথেশ ভট্টাচার্য)। এইসব

অমূল্য অনুষ্ঠানে যাঁরা অংশগ্রহণ করতেন তারা সকলেই, হয় স্কুল, না-হয় কলেজের ছাত্র ছিলেন, কেউবা ছাত্রই ছিলেন না। তাঁদের আগ্রহ ও নিষ্ঠার মধ্যে কোনো ফাঁক বা ফাঁকি ছিলনা। যদিচ আজ সম্পূর্ণ একযুগ পরে স্বাভাবিক নিয়মেই কবিতার রাজ্য থেকে তাঁরা অনেকেই নির্বাসিত, তবু ব্যক্তিগতভাবে আমার জীবনে তাঁদের প্রভাব অপরিসীম। এই সুযোগে আমার বন্ধুদের নাম স্মরণ না করে পারছি না। উপরি-উল্লিখিত বন্ধুরা ছাড়া আর যারা সক্রিয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী নীরদবরণ চক্রবর্তী (তনুদা), সুভাষ চৌধুরী, জয়ন্ত ভট্টাচার্য, নিশীথ চক্রবর্তী, পৃথ্বীশ সেন ছিলেন প্রধান। এঁদের মধ্যে কবি হিসেবে যাঁদের মধ্যে সম্ভাবনা দারুণ ছিল তাঁরা হলেন—হৃষীকেশ সেন, প্রমথেশ ভট্টাচার্য এবং সুভাষ চৌধুরী। গল্প লেখার চমৎকার হাত ছিল পরেশ দত্ত, নীরদ বরণ চক্রবর্তী এবং এবং রম্যেন্দু দেবের। উপযুক্ত নিষ্ঠা থাকলে সকলেই, বিশেষ করে পরেশ দত্ত সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। হৃষীকেশ সেন মনেপ্রাণে কবি হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক আইডিয়ার প্রাবল্যে এবং ফর্মের ব্যাপারে একদম মনোযোগী না হওয়াতে অগ্রসর হতে পারলেন না। শীতাংশু পাল সেই জাতের কবি যিনি ভালো লিখেও উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন নি। ইদানিং তাঁর লেখা খুব কম চোখে পড়ে এবং তাঁর কবিতা পড়ে মনে হয় তিনি যেন একই বিন্দুতে দীর্ঘকাল একই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রমথেশ ভট্টাচার্যের সাহিত্য-সম্পর্কিত যুক্তিনিষ্ঠ ধারণা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে বরাবরই প্রচণ্ড আকর্ষণ করেছে। কিন্তু তীক্ষ্ণধী এই সাহিত্য-সমালোচক কেন জানি একদিন হঠাৎ করে এই জগৎ থেকে সরে দাঁড়ালেন। এঁদের সম্পর্কে অতো সব লেখার উদ্দেশ্য এই যে, ১২বছর ধরে আমার একটানা সাহিত্যচর্চার পেছনে তাঁদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী। ১৯৫৯ সালে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে একটা ব্যাপারে আমি খুব দমে গিয়েছিলাম। যে পরিবেশকে পেছনে ফেলে এসেছি তার জন্য যে দুঃখবোধ তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখবোধ আমাকে অসহায় করে তুললো। দেখলাম সাহিত্যচর্চার কোনো পরিবেশই সেখানে গড়ে ওঠেনি। যে দু-একজন লেখালেখি করতেন, তাঁদের সাহিত্য সম্পর্কিত বিশ্বাস, ধারণা এবং চর্চা রবীন্দ্রযুগেই প্রবেশ করতে পারেনি। তবে কিছু একটা করার প্রবল বাসনা আমাকে তখন পেয়ে বসলো। বন্ধু সুধীরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী এবং শ্রীকান্ত ভট্টাচার্যের আন্তরিক সহযোগিতা এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক দেবব্রত সেনের প্রেরণায় আমরা গড়ে তুললাম 'কৈলাসহর সাহিত্য আলোচনা চক্র'। প্রতি সপ্তাহে আমরা কয়েকজন একত্র হতাম। নিজেদের লেখা পড়তাম, দোষগুণ আলোচনা করতাম। ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত আমরা প্রায় ৩০০ অধিবেশন করেছি। আমার নিজের দিক থেকে এটাব সুফল এইটুকুই যে, লেখালেখির অভ্যাস চেতনার সঙ্গে এক হয়ে গেছলো। আজ দু'বছব পর অনেকটা ঝিমিয়ে পড়লেও একদম থেমে যায়নি। তার কারণ এটাই। অন্যান্যরা যে কতোটুকু লাভবান হয়েছেন সেটা বলার যোগ্যতা আমার নেই। কৈলাসহরের ঐ দীর্ঘ ১০ বছরে মাত্র দু'জন ব্যক্তির কথা স্মরণ করবো যাঁরা আমাকে সর্বক্ষণ প্রেরণা দিয়েছেন। আমার অনেক অস্বচ্ছ ধারণাকে ঘষে ঘষে স্বচ্ছ করেছেন। প্রথমজন আমার প্রিয় অধ্যাপক রমেন রায়। তাঁকে

শিক্ষক ও সুহৃদ রূপে না পেলে আমি অন্তত পাঁচ বছর পেছনে পড়ে থাকতাম। সেই ১৯৬১ সালেই তরুণ গল্পকার দেবেশ রায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রতন ভট্টাচার্য ওদের গল্পের সঙ্গে স্যার আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। উনার সাহচর্য বেশীদিন পাইনি। মুর্শিদাবাদের কান্দিরাজ কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়ে তিনি কিছুদিন পরেই চলে যান। দ্বিতীয় জন আমার বন্ধু দিলীপ কুমার বসু। উনিও কৈলাসহর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আমার সমবয়সী এই বন্ধুর পাণ্ডিত্য আমাকে অবাক করতো। ১৯৬৮ সালে দিলীপের সঙ্গে আমার পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা। ১৯৬৯ সালেই বিচ্ছেদ। আমি বদলী হয়ে কৈলাসহর ত্যাগ করি। দিলীপ বসু নিউদিল্লির একটি কলেজে চাকুরী পেয়ে কৈলাসহর ত্যাগ করেন। মাত্র ১ বছরের সান্নিধ্যে দিলীপের কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি তার কোনো তুলনা হয় না। আর যাঁদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি, প্রেরণা পেয়েছি তাঁরা হলেন সর্বশ্রী বিমানবিহারী মজুমদার, মানিকলাল চক্রবর্তী, বিমল দেব, প্রদীপবিকাশ রায়, নিতাই আচার্য এবং আরো অনেক।

বলতে ভুলে গেছি শীতাংশু পালের 'চাতলা ভ্যালি সাহিত্যচক্র' (১৯৫৮-৫৯ সালে কাছাড়ের বড়জালেংগা স্কুলে ১ মাস অন্তর অন্তর এই সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হতো) আমার কবি-জীবনের গোড়ার দিকে সাহিত্যের প্রতি আমার আকর্ষণকে খুব তীব্র করে তুলেছিল।

এটা বোধহয় খুব সত্যি কথা, যে কোনো লেখকই তার লেখা প্রকাশিত না হলে ঠিক ঠিক প্রেরণা লাভ করেন না। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। সুতরাং লেখক জীবনের শুরুতে যাঁরা আমার লেখা প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন তাঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতাবোধ সমপরিমাণ। শিলচরের 'দৈনিক প্রান্তজ্যোতি' পত্রিকার কর্ণধার শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র দত্ত, শিলচরের অধুনালুপ্ত 'অতন্দ্র' কবিতা-পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠিত কবি শ্রী শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর সুযোগ দান আমাকে এগিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। ত্রিপুরা থেকে এই জিনিসটা আমি প্রথম পেয়েছি 'নান্দিমুখ' সম্পাদক কবি স্বপন সেনগুপ্তের কাছ থেকে।

আমার মাঝে মাঝে ভয় হয়, আমি কি কবিতার স্বর্গ থেকে খুব শীগ্‌গিরই বিচ্যুত হবো? যদি হই তবে আমাদের মহান শিক্ষাবিভাগকে এর জন্য দায়ী করবো। এমন এক পরিবেশে তাদের করুণায় আমি এসেছি যেখানে সাহিত্য-শিল্প নিয়ে চর্চা করা সাঁতরে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করার মতোই অবাস্তব ব্যাপার। অথবা অন্য একটি সন্দেহ মনের মধ্যে হতে চেষ্টা করে। কবি নয়, একজন সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই কি এই অন্যমনস্কতা, অনীহা অথবা আলস্য? তবু আশাবাদ আমার প্রচণ্ড। জীবনে সবকিছু ত্যাগ করতে পারি, কিন্তু কবিতাকে পারিনা। কোনো বিশেষ আইডিয়া কিংবা আদর্শবোধ কিংবা বিশেষ মতবাদ প্রকাশের জন্য আমি কবিতা লিখিনা। আমি যে ব্যক্তিমানুষ, তার সুখ-দুঃখের ব্যক্তিক অনুভূতি প্রকাশ করতেই আমি আগ্রহী। কোনো পাঠকের মনের সঙ্গে আমার বক্তব্য যদি মিলে যায় আপত্তি নেই। না মেলে যদি, দুঃখ নেই। শুধু এটুকু বিশ্বাস করি, যেহেতু দৈনন্দিন অভাবক্লিষ্ট নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একজন নিতান্ত সাধারণ মানুষ আমি, সেহেতু আমার দুঃখ, আমার সুখ পাঠকের মনকে স্পর্শ না করে পারবে না।

বিশ্বজিৎ চৌধুরী ০

এরপর এই কবির সম্পর্কে

এরপর এই কবি সম্পর্কে আর কিছু নয়

এরপর এই কবির আর কোনোদিন
ফুলের প্রয়োজন নেই—কেমন ফুলের মধ্যে মুখ
হাতের মুঠোর মধ্যে পৃথিবীর তাবৎ অসুখ নিয়ে
রৌদ্রের একান্ত সহচর

এরপর এই কবি সম্পর্কে আর কিছু নয়

বালিকার মতো দুরন্ত—দুরন্ত বাতাস
এই কবির চুলে এখন আঙ্গুল ছোঁয়াবে না—ছিন্ন বর্জিত
কবিতার শব্দমালা উড়িয়ে নেবে না—এখন শোকের সময়

কবি তার অন্তিম কবিতা নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলেন দীর্ঘকাল
—একটিমাত্র, কবিতা ছাপান
এখনও বাকি প্রুফরিডারের চোখ শারদীয় ঘুমে
ঢুলছে—বড় দ্রুত শেষ পৃষ্ঠার জন্য কবিতা লিখে দিতে হবে
বড় দ্রুত বেলা যায়

প্রেম—তুমি এসোনা এখানে বড় সর্বনাশ ঘটে গেছে
তোমার শেষ টেলিফোনের ঘণ্টাধ্বনি শুনে অন্ধকারে
বলা যায় তুমি বেশ সুখে আছো হে

তোমার বিরুদ্ধে এখন ঘৃণায় কবির নীল ঠোঁট চক্‌মকির
মত জ্বলে—অথচ অন্তিম কবিতাটি দেখ
নির্লজ্জের মতো তোমাকেই উৎসর্গ করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে
এরপর আর অদল-বদল ভাল দেখাবে না—ভাল দেখায় না

এরপর এই কবি সম্পর্কে আর কিছু নয়

পরম আলস্যে এই কবি চারজন বাহকের কাঁধে—মাথা ঝুলিয়ে
শুয়ে ঝিনুকের মতো চোখ স্থির চেয়ে থাকে
চমৎকার সূর্যের দিকে—

বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য ●

যেন কালই নষ্ট হয়ে যাবে সব

যেন কালই নষ্ট হয়ে যাবে সব, সর্বস্বান্ত হবে পৃথিবীও
এই শেষ গান গেয়ে কেউ নেমে যায় মাথার ভেতর থেকে
সমস্ত শরীরে
নষ্ট হয়েছ তাতে কিছু নয়, পরাভব নয়, এই তো তোমার ঘরবাড়ি
তাপ সংরক্ষণ চলে রৌদ্রের ভিতরে বসে, কেউ বলে আমার নিয়তি।

এই গাছ এখানেই আছে, ছায়ায় চড়ুইভাতি হয়, বহুদিন পরে এলে কিনা।
দীর্ঘদিন সূর্যাস্ত দেখেছ, তবু সূর্যাস্তের ভয়ে তাড়াহুড়ো
এই গান ভিখিরির গান তাই নেমে যায়, তার জানা আছে সব
পতন ও গহ্বর।

ধানকাটা হয়ে গেছে, প্যাশুলে ছেয়েছে মাঠ, এই রাত্রে
দেখাবে না সমর কৌশল!
পোষাক বদল কর, পট পাল্টানোই কথা, অনির্বচনীয়
বুঝি কালই নষ্ট হয়ে যাবে সব, সর্বস্বান্ত হবে পৃথিবীও।

দিলীপকুমার বসু ●

সৈন্যরা সংখ্যায় বাড়ছে

সৈন্যরা সংখ্যায় বাড়ছে।
বুড়ো দর্জি ছুঁচ নিয়ে, ছুঁচ তার উঠছে, পড়ছে
তৈরী হচ্ছে সৈন্যদল,
সংখ্যায় বাড়ছে।

বন্ধুগণ, আস্তে!—
শন্ শন্ শব্দ হচ্ছে কিসে?
আরে, আরে, সাবধান!—
গন্ গন্ ওটা কি জ্বলছে?
—অ্যাই, গুলির শব্দ না?

প্রচণ্ড গর্জন, ওকি
কামানের, জনতার?

দূরে ওটা কিসের পতাকা?
আমার চারপাশ দেখি ফাঁকা।
ফাঁকা।
মস্‌মস্
মস্‌মস্, মস্‌মস্
মস্‌মস্ মস্‌মস্ মস্‌মস্ মস্‌মস্,
'আঃ'।
ফাঁকা!
সমস্ত আকাশ দেখি লাল রঙে ঢাকা;
কালো পিঁপড়ের মতো

সৈন্যদল সংখ্যায় বাড়ছে
সৈন্যদল
সংখ্যায়—

ভাস্কর চক্রবর্তী ০

সে

সে, পেতে রেখেছিলো পুরোনো বিছানা—
নতুনভাবে, ঘুমোতে চেয়েছিলো কিছুক্ষণ-

বেড়াতে বেড়াতে ঘুরে এসেছিলো সে, এক রেলওয়ে কলোনি
ওইখানে, এক দার্শনিক বিড়াল, সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলো তাকে—
সে, বন্ধ করেছিলো চিঠি লেখা—খবরের কাগজ
ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো সে—

সে, খুশী হয়েছিলো কিছু—
সে, অনেক খুশী হয়েছিলো—শুধু, অনেকদিন পর
যখন আবার, যুদ্ধের কথা ঘুরে ঘুরে উঠেছিলো তার মাথায়
যখন আবার তার মনে পড়েছিলো
কামানের কথা

শক্ত হয়ে উঠেছিলো তার হাত—সে, সত্যিকারের কেঁদেছিলো

১৭/৫ বেনিয়াপাড়া লেন
বরানগর
কলকাতা-৩৬

কবিরুল ইসলাম ●

রক্তাক্ত গভীরে

রক্ত বেরিয়েছিল খুব। মাঝে মধ্যে রক্তাক্ত গভীরে
যেতে ইচ্ছা হয়। কান্না ভাঙে। তোলপাড় ক'রে
নদীতে জ্যোৎস্নার পাখি কলরবে জাগে। দুই পাড়
এপারে ওপারে জেগে রয়। কাঠবেড়ালির সাধ
যাবে সেতুবন্ধনে।

এই সাধ ছিল তোমার আমার।

মাঝে মধ্যে রক্তের ভূভাগে ঢেউ ওঠে, পাড়
ভাঙে, শব্দ জাগে এপারে ওপারে
দুজন বিনিদ্র শুধু নদীর আড়ালে

সেই অন্ধকার শান্ত হয়।

প্রথম বৃষ্টির মত প্রতীক্ষিত। মাঝে মধ্যে রক্তের নদীতে
স্নানার্থীর মত যেতে ইচ্ছা করে, যে রকম দূরে গেলে
ভালবাসা টের পাই, জ্যোৎস্না বাড়ে
ভাঙে পাড় দুরন্ত জোয়ারে।।

সামসুল হক ●

প্রবাহ

তুমি প্রত্যেকবারই ভাবো, এবার নিশ্চিতভাবে শুরু করবে,
তুমি প্রত্যেকবারই ভাবো, অনেকদিন উড়নচণ্ডী কবে কেটে গেলো—
পুঁইশাক কেনায়, সর্দি-কাশিতে অনর্থক দিন কেটে যাচ্ছে,
এবার নিশ্চিতভাবে শুরু করবে।
কিংবা তুমি প্রত্যেকবারই ভাবো, এবার নিশ্চিতভাবে শেষ করবে,
তুমি প্রত্যেকবারই ভাবো, অনেকদিন কাটা-ছেঁড়ায় কেটে গেলো—
পান্তা ফুরোবার আগে নুন আনতেই বিকেল এসে যাচ্ছে,
এবার নিশ্চিতভাবে শেষ করবে।

শুধু একটা বিষয় তোমার জানা নেই, কী শুরু করতে চাও,
শুধু একটা বিষয় তোমার জানা নেই, কোন্‌টা শেষ করতে চাও।
তুমি কিছুই শুরু করতে পারো না, সব আগেই শুরু হয়ে গেছে,
তুমি কিছুই শেষ করতে পারো না, 'শেষ' নিজেই তোমার বিরুদ্ধে;
ঐ দ্যাখো, রাণী আসছে, বেড়াবার সময় হয়েছে—
আমি বলি—রাণী, তুমি বলো—শুরু, তারা বলে—শেষ।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল ●

সমুদ্রের কাছে

এইভাবে একদিন সাগরের কাছে গেলে আমরা সহসা
হয়ে যাই বালি
কণায় স্বতন্ত্র, শক্ত, কিছুটা সোনার মত, কিন্তু ফাঁকা, খালি
হবো কি চোখের
অলৌকিক দীপ্তি নামে নেত্রহীন উর্দ্ধ ভূলোকের

ওইখানে বিষণ্ণ বাড়িতে, হবে গান
অস্পৃশ্য, সমাজ ছোঁবে না
ওইখানে, ওই রিক্ত মধুর সান্নিধ্যে, হবে গান
বুকে যে সমুদ্র আছে, তার সুখে
যে সাগর হলো কথা সরিৎসাগর, তার রূপকথার সম্মুখে
কিছুটা সোনার মত, শূন্যস্পর্শী সুকঠিন গান

একলা দাঁড়াবে তুমি, একলা দাঁড়াবো আমি, কিংবা সব
বিচূর্ণ সমাজ
অনাত্মীয় জলধির কাছে তারা শব্দহীন স্তবে
বলে যাবে, আমি ফুল, কেবল শীতে ও তাপে বৃন্ত ঝরো ঝরো
হে লাবণ্য সুনিশ্চিত করো

যে বসন্ত কল্পনা রয়েছে আমার, তার প্রতিঘাতে
পৃথিবী ফাল্গুনী হবে
তোমারই এ উপকূল ভরে যাবে শ্যামলের স্তরে
এ বায়ুমণ্ডল পাবে প্রিয় পারিজাতে
সুনিশ্চিত করো তুমি তবে
যে বসন্ত কল্পনা রয়েছে আমার এই দীর্ঘ গানে
তার প্রতিদানে
পৃথিবী ফাল্গুনী হবে

রন্‌জিৎ দেব ●

জেগে থাকে দুচোখ

পথের ধুলো উড়িয়ে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে
ভীড়ের মধ্যে সারাক্ষণ দুচোখ কোথায় জ্বলে
নীলশিখা
এস্কিমোর স্লেজগাড়ি চলে নির্জন
বরফের উপর জেগে উঠছে ক্রমশঃ
প্রচণ্ডতায়
ফেরবার ভয়ে হাঁটতে হাঁটতে পদোপিসির
টলটলে শরীর
দুচোখ
পথের ধুলো উড়িয়ে আসে
পাহাড়ী ঝর্ণার কাছে বসে থাকে
দীর্ঘদিন
সঙ্গীতের মতো নিভৃত আনন্দ এক
শীতের প্রচণ্ডতায় বরফে
এস্কিমোর স্লেজগাড়ি চলে
পথের ধুলোয় নিষ্ঠুর বোধ আশ্চর্য যন্ত্রণা
রৌদ্রদিনে কোথায় জ্বলে নীলশিখা
নাম ধরে ডাকতে ডাকতে কৃষ্ণচূড়া
জেগে থাকে দুচোখ।

হিমাদ্রি দেব

পান্নালাল রায়

স্বপন সেনগুপ্ত

বিজয় কুমার দেববর্মণ

পীযূষ রাউত

শীতাংশু পাল

দিলীপ কুমার বসু

রবীন সুর

অজিত বাইরী

অমরনাথ এসু

নৃপেন্দ্রলাল দাশ

কল্যাণ গুপ্ত

সময় সীমাবদ্ধ। ঘন্টায় লক্ষ কিলোমিটার গতিবেগ।
খুব দ্রুত বয়স বাড়ছে।
পড়ে আছে সংখ্যাতীত কাজ।
হে সময়, আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা করো।

সংকলন—১১

কবিতাকবিতাকবিতাকবিতাকবিতাকবিতাকবিতাকবিতাকবিতাকবিতাকবিতা

কবিতার অনিয়মিত কাগজ

আগষ্ট উনিশ শ' বাহাত্তর

সম্পাদক—পীযূষ রাউত / প্রকাশক—সৈকত রাউত
প্রকাশস্থান—জোনাকি ✽ পূর্ব গোবিন্দপুর ✽ কৈলাসহর ✽ উত্তর ত্রিপুরা
যোগাযোগ—কল্যাণপুর ✽ পশ্চিম ত্রিপুরা
মুদ্রক—রীণা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ ✽ আগরতলা ✽ পশ্চিম ত্রিপুরা

বাংলাদেশের কবি, কবিতা ও সাংকেতিকতা

নৃপেন্দ্রলাল দাশ

হানাদার বাহিনীর প্রথম শিকার আমাদের আত্মার আত্মীয় কবিবৃন্দের অনেকেই আজ নেই। অথচ তাঁরাই তো আমাদের সংগ্রামী চেতনার বাণীরূপ দিয়েছিলেন। এ ভয়ংকর সর্বনাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের কথা মনে পড়ে।

মুহূর্তের উত্তেজনায় নয়, প্রাকরণিক পরিণতির পরম সার্থকতায় বাংলাদেশের আধুনিক-কবিতা-প্রবাহ, উৎক্রান্তির বহুধা বলযে (সুৎরিয়ালিজম, ড্রিমিটিজম, ফবিজম, দাদাইজম, কিউবিজম, এক্সপ্রেসনিজম ইত্যাদি মতবাদিক), ভঙ্গীর বিভিন্নমার্গে বৈচিত্র্যভাবনার দীপান্বিতায় কখনো সে উত্তরণ করেছে জীবনানন্দীয় ধূসর পাণ্ডুলিপিতে, নিশ্চেতনা বা নির্জনের বিজন বিবরে, কখনো আদিমতার আপেলে আদমের পাপবোধকে ইভ্ করে তুলেছে উদীচীর কবিদের মতো। কখনো সাংঘাতিক অর্থনৈতিক মন্দায় একটা পলায়নপর জাগৃতির খরচৈতন্যে হয়ে উঠেছে উপাংশু। সাংকেতিকী সংবাগে দুর্বোধ্যতার অমল অন্ধকারে দুর্বার হয়ে উঠেছে কখনো বা।

আধুনিকতার ম্যাটাফিজিক্সে সাংকেতিকতা তাই আন্তরিক উষ্ণতায় হয়েছে ঘনিষ্ঠ, তপ্ত। উনিশ-বিশ শতকের লিরিক জ্যোৎস্নায় কবিতাকুমারীর কিশোরীদেহ এই ষাটদশকে এসে নারীর গন্তব্যে এসে পৌঁছেছে।

কবিতায় প্রতীকি পৃথিবীর ইশারা লেখে আলেকজাণ্ডার এক আর্ষবাক্য উচ্চারণ করেছেন : 'কবিদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার। সাপের মতো তারা কামড় বসাবে না সত্যি কিন্তু মৌমাছির মতো শুষে নেবে যা কিছু।' এই শুষে নেয়াটাই সৎ কবির পরম কৃত্য বলে সংহিতা রচিত হয়েছে—শৈল্পিক, আলংকারিক, এস্থেটিক প্রজ্ঞার বর্ণবিলাসে। এরই সমান্তরালে টলস্টয়ের বাণী : 'জীবন থেকে শিল্পের বিচ্যুতি ঈশ্বর থেকে পতনের মতোই।'

সাযুজ্যতা রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও সোচ্চার ঃ 'জীবনে জীবন যোগ করা/তা' না হলে ব্যর্থ হয়/কৃত্রিম পণ্যে গানের পশরা।' বাস্তবের সমান্তরালে যে ধূসর কাব্যিক জগত সেখানে সাংকেতিকতার পর্দা অনিবার্যভাবে শাপথিক ও প্রচণ্ডভাবে জীবনের বৈভবে বিত্তশালী—দীপ্র, দীপাংশু। যুগচিন্তার চূর্ণবিচূর্ণ মরুদ্যানে জীবনের তাৎক্ষণিক সৌন্দর্য-জিজ্ঞাসায় তথাকথিত বস্তুসাশ্রয়ী হয়েও প্রতীকী ভাবনা-বহুল আলোচ্য আধুনিক নামধেয় কবিতা (তথাকথিত অকবিতা বা গবিতা) তিরিশের ক্রান্তি বেয়ে ষাটদশকের অন্তিম লগ্নে এসে কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, গিয়ান্সবার্গ ও গিওম আপোল্যানেয়ার প্রমুখের উত্তরসূরী বাঙালী কবিকূল নগরযন্ত্রণার, ধনতান্ত্রিক অবক্ষয়ের, সংশয়ের, নিরাশার, পলায়নের, নির্জনের, নিষিদ্ধ এলাকার, পূর্বজের শ্রেয়বোধের বিপ্রতীপ সাংকেতিকতার সরণিতে মুক্তির পথ খোঁজেন যা স্বকালে, স্ববৈশিষ্ট্যে, ব্যক্তিতাবাদে দীপিত এবং স্পষ্টভাবেই ছায়াচ্ছন্ন।

সমকালের বিনষ্ট উত্তরাধিকারবিহীন এসব পংক্তিসর্বস্ব, স্তবকনির্ভর, বিশ্বসংবেদ্য অবহেলিত কবিতা প্রাকরণিক উৎকর্ষে বর্ণাঢ্য। যদিও সে জনপ্রিয়তা পায়নি। বস্তুত, জনপ্রিয়তা মৌলিক কবির পক্ষে শ্রেয়স্করও নয়।

আধুনিক কবিতার প্রতীকি বিশিষ্টতা স্পর্ধাভরে অসংশয়িত চিত্তে উদাহরণের অপেক্ষা রাখে। বাংলাদেশের কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

'তুমি দেখলে, ঘোড়ার পায়ে একটি ক্ষত
ধ্বক্ করে জ্বলে উঠলো বাল্‌বের মতো' *(শামসুর রহমান)*।

অনিকেত গতিবাদের প্রতিনিধিত্ব করছে 'ঘোড়া' অসম্ভবরকম সার্থক চিত্রকল্পে 'বালব্'-এর উপমা এসেছে।

'এমন রোদনধ্বনি কেন আজ বেজে উঠে, এইতো সেদিন
বোস্তামীর পুকুরের ঘোলা কালো জলের কাছিম
হওয়ার বাসনা ছিল।' *(আল্ মাহ্‌মুদ)*।

উন্মূল সমাজের নিঃসঙ্গতায় শাশ্বতীর বুকে 'কাছিম' হয়ে থাকার বাসনা সেই জীবনানন্দীয় ... ... 'আবার আসিব ফিরে ... এই কার্তিকের নবান্নের দেশে ... ...' ইত্যকার লাইন মনে করিয়ে দেয়।

মধ্যযুগী ঐশ্বরিক মাদকতার মঙ্গলকাব্য ভূমিনিঃস্বাদ মানবিকতা, নির্বিকল্প অনীহায় আজকের সমাজচৈতন্যের হতাশা দর্শনে, সাহিত্যে নিরালম্ব হয়ে উঠেছে; তাই আর্তি শুনি ধর্মগ্রন্থের আশ্রয়ের প্রতীকি উপকণ্ঠে—

'বাইবেলে মেটেনা ক্ষুধা, অরণ্যে নেই আদিমতা
অসংযত ইন্দ্রিয় আমার
দান্তের মৃত্যুশয্যা পাশে
র‍্যাভেনার রুদ্ধকক্ষে বসে
পান করি মধু তাই বিয়াত্রিচের মুখচন্দ্রিমার।' *(দীপেন্দ্র চক্রবর্তী)*।

ভোগায়ত জীবনের জতুগৃহ হচ্ছে হোটেল। একদিকে চরম দেহকানা ক্যাবারে উলঙ্গ, অন্যদিকে বিবিক্ত মৌসুমী খাবারে সে উদ্ভিন্ন। যুগের এই দ্বন্দ্বজটিল আত্মরতিতে একান্ত বাঞ্ছিতাকে আজকের যুগমানস 'হোটেল' ছাড়া আর কিইবা ভাবতে পারে? তাই ভাবানুষঙ্গের অঞ্জলিতে দেখি .

'বেত্রবতী, তুমি এক অভিজাত হোটেলের নাম
যেখানে উদ্দাম
ভোগায়ত জীবনের সকল বাসনা
মসজিদ, মন্দির কিংবা গির্জার নিরুদ্ধ প্রার্থনা।' *(নৃপেন্দ্রলাল দাশ)*।

আস্তিক্যবোধ অথবা নাস্তিকতায় আক্রান্ত এ দশকের কবিতা বিচিত্রগামী এবং স্বতন্ত্র উচ্চারিত একথা বিতর্কের বিভিন্ন উপসংহারে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠ।

তাদের গল্প

দিলীপ কুমার বসু

সারাদিন ধরে মহিষ চরিয়ে পীতাভ নদীতটে,
এক রাখাল বালক তার রূপসী অঞ্জনার কাছে ফিরে এল।

সেদিন যন্ত্রের মত বিহগ স্বর, কাঁথার উপর প্রদীপ উল্টে পড়েছে।
সেদিন সারারাত ধরে আগুনের খেলা দেখল বিমূঢ় গ্রামবাসী।
সেদিন ক্ষমায় আর কান্নায় অস্থির হয়ে গেল চৈত্রের সব ফুল;

দরজার পাশে একত্র হয়ে যারা অপেক্ষা করছিল।

একরাশ ফুল সেই মেয়েটিকেই তার চেনার কথা,
উরুতে জোনাক পোকার গয়না তার, তালরসের গন্ধ,

অথচ কাঁথায় পিলসুজ, তেল, আগুন,
রূপসী অঞ্জনার নাকছাবি, গোঠ।

সাদাবৃদ্ধ মোড়ল বললেন, 'পাপ';
সাদা গোরু, কাঁপতে লাগল এককোণে,
ফুলের ছায়া তার গায়ে পড়ল।

কেয়াখয়ের গালে নিয়ে
গ্রামবাসিনীরা পরদিন গল্পে বেরুল।
গতরাত্রের তিনটি মৃত্যুর গল্প গোল ফুটির মত তাদের একটা চাই।

অন্য দিকে

পান্নালাল রায়

এই দীর্ঘ মৃত্তিকা জুড়ে
কতকালের নির্মিত
 এইসব গাছপালা, ঘর বাড়ী ...
এখন ছায়ার ভেতরে
আত্মগোপনে ব্যস্ত।
 সূর্যাস্তের পূর্বেই
দিনের প্রচণ্ড আলোতে
সবাই চলে যাচ্ছে
 ছায়ার ভেতরে কৃত্রিম ছায়ায়!
এই দীর্ঘ সাঁকো পেরিয়ে
আমাদের যেতে হবে দূরে—বহুদূরে
এইসব ঘরবাড়ী ছেড়ে
বর্তমান পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে নয়:
ওসব ছায়ার ভেতরে।
বাইরে সজাগ উপচ্ছায়া
এড়িয়ে যেতে হবে আমাদের
 ব্যক্তিগত দিকে।

ফুটপাথের যীশু

অজিত বাইরী

কোলকাতার ফুটপাথ থেকে আমি আমার যীশুকে
তুলে এনেছিলুম,
কলতলার পাশে নর্দমার জলে
হাঁটু ডুবিয়ে বসেছিল
সেই শিশু যীশু।
তার দু'চোখ ছাপিয়ে
উপ্‌চে পড়ছিল একবুক কান্নার ঢেউ,
তার দু'ঠোঁটে লেপ্‌টে ছিল
হোসপাইপের
ঘোলাটে আবর্জনা। অথচ ... অথচ
একজনও ছিলনা
সেই উলঙ্গ নটরাজকে আমার
বুকে তুলে দেখাবে সমস্ত শহর,
মাটির সবুজ আর
আকাশের রোদ্দুর, অথচ এই শিশু
একা একা একা একা
কি সহজ বিশ্বাসে, কি সরল স্বপ্নে
দু'মুঠি শক্ত করে
প্রতিদিন প্রতিটি মুখের প'রে
ছড়িয়ে দিয়েছে ভালবাসার আগুন।

তোমারপ্রতীক্ষায়

বিজয় কুমার দেববর্মণ

নির্ধারিত সময়ে তুমি চলে আসার আগেই
এসে যায় বৃষ্টি।
সম্মুখের আয়ত পথে দৃষ্টির শেষ চিহ্ন এঁকে
আমি দাঁড়িয়ে থাকি
কখনো-বা পায়চারি করি নাতিদীর্ঘ নির্জন বারান্দায়
সময় সময় কার্নিশে ঝোলানো উদাস অর্কিডগুলোর কাছে গিয়ে
সিগারেটের সব ধোঁয়া উড়িয়ে দিই আকাশে
হিমেল-আর্দ্র উন্মাদ বাতাসে।
তোমার প্রতীক্ষায় অনেকদিন অনেক সময় আমার
মরে গেছে
মরে গেছে অনেক বিকেলের অনেক বৃষ্টি, আকাশ
এবং আমার প্রতিবেশী অনেক আর্দ্র-হিমেল বাতাস
অনেকবার
তোমার প্রতীক্ষায়।
অনেকবার তোমার প্রতীক্ষায়
অনেক দিনের অনেক ব্যর্থতা শেষে
আমি খুঁজে পাইনি নিজেকে কখনো
কোনোদিন
কোনো সভ্রান্ত বার কিংবা নাইট ক্লাব ক্যাবারে
অথবা স্বপ্নে সামুদ্রিক মৎস্যকন্যাদের ভীড়ে।

পেখম ছড়ানো মহিমা

রবীন সুর

এতদিনে অসংখ্য সূর্যাস্তের জঞ্জাল জমেছে
নিতান্তই মুহূর্তের ক্ষণ বিস্ফোরণ
দীর্ঘদিন ধরে সংবেদ্য চেতনায় আচ্ছন্নতা ছড়িয়ে রাখে
এবার পশ্চিম থেকে পুবে দৃষ্টিকে ফেরানোর সময়
কেননা সূর্যাস্তে শুধু রক্তমাখা মৃত্যু সমাচার
এবং পৃথিবীতে যতগুলি মৃত্যু
জন্মের সংখ্যাও তার সমপরিমাণ
সূর্যাস্তের শমিত আলোর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে
যদি কোনোদিন পুবে যাওয়া যায়
বিশাল ময়ূর তুমি দেখতে পাবে দিগন্ত রেখায়
সে তার বিশাল জ্যোতির্ময় পেখমছড়ানো মহিমায় অনন্য উদ্ধার।

জোছনায় চান করে আমি

হিমাদ্রি দেব

কৌতূহল ছিল, তাই তোমার বুকের ভিতর
অসংকোচে ডুব দিতে গোপনে সিঁদকাঠি
হাতে তুলেছিলাম, তুমিতো জানো না কিছু
কী করে খুলে গেল পথ, তুমিতো জানোনা কিছু
নোতুন পথের মোড়ে আমার কী রকম
বিষণ্ণ অবকাশ, এখনতো সবদিক স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর।
দ্রুতবেগে অনেককিছুকেই এড়াতে পারি,
ট্রাফিকে লালবাতি, সবুজ,
মেনে চলতে কক্ষনো ভুল হয় না; জোছনায়
চান করে আমি, সূর্যের মতো স্নিগ্ধ হয়ে গেছি।

সঙ্গ স্বপ্ন ছায়া ও অতৃপ্তি নিয়ে

শীতাংশু পাল

হৃদয়ের ছন্দের তালে তালে অপূর্ব ভঙ্গিমায়
উন্মাদনায় মনে হয় যৌবন কোন এক
অনিশ্চিত রাজকুমার
নিষিদ্ধ ইচ্ছারা
প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে
রঙীন দিনের স্মৃতি বারবার স্মৃতিপটে ভাসে
প্রেম
অশ্রুজল খুন বেদনা বিস্মৃতি ভাবনা
ছাড়া প্রেম নয়
তবুও নিষিদ্ধ ইচ্ছারা জেগে ওঠে
কাঠগড়ায় বন্দী জীবের মত অথবা কুকুরের মত
ঘনীভূত সঙ্গ, স্বপ্ন, ছায়া ও অতৃপ্তি নিয়ে।

আর কিছু নয়, কর্ম্মদোষে

স্বপন সেনগুপ্ত

এখানে একটু বসো দু'টো সুখদুঃখের
কথা বলি
প্রশ্ন তোমার কেন পরছি পোষাক আমি
গঙ্গাজলী?
একটু বসো, পকেট উজাড় হাতের কাছে
নেই দেশলাই
আর ক'টা দিন সবুর কর শেষ করেনি'
মদের চোলাই
ধানজমি বেশ কয়েক কানি
ঘাট বাঁধানো মিষ্টি পুকুর
চারামাছ সব রুয়ে গেছি
এই শরতে ঘরের ছানি ... ...
তারপর বেশ শ্বাস ফেলবো
লম্বা তিলক কেটে বসে
গদ্‌গদ্‌ ভাব, পাঠ শুনবো
এখন বলো সময় কোথায়—
গঙ্গাজলী?
চারদিকে সব পৌরসভার অফিস গলি,
ধরা অমন সহজ কোথায় বুকের নীচে
জমাট পলি। টালমাটাল এই শব্দকোষে
আর কিছু নয় কর্মদোষে
হাফ-গেরস্তের সখ করে ছাই পাল্কিচড়া।

এই ভালবাসার শরীর নিয়ে

অমরনাথ বসু

আমার এই ভালবাসার শরীর ভেসে যাক্ ডুবে যাক্
অতল জলের আহ্বানে
বরং বিশাল সমুদ্রের নীচে ঘুমিয়ে পড়বো
বছরের পর বছর
এক তলহীন সাম্রাজ্যের খেলাঘরে
বুকের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে যাক্
আদিম পৃথিবীর জীবজন্তুরা
আহা কি আনন্দ আমার!
আমার এই ভালবাসার শরীর ভেসে যাক্ ডুবে যাক্
শীতের মধ্যরাতে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে
গভীর উপলব্ধির সামনে কোনোদিন জেগে থাকবো
না আর
কি হবে এই ভালবাসার শরীর নিয়ে
জ্বলেপুড়ে বেঁচে থাকা
বরং এই ভালবাসার শরীর নিয়ে
বিশাল সমুদ্রের নীচে গরল আনন্দে ভেসে
বেড়াই ... ...

বরং আত্মসমর্পণ শ্রেয়

কল্যাণ গুপ্ত

সর্বজয়ী আকাঙ্ক্ষার প্রাপ্তি
শর্বরী। শর্বরী সামনে অনেক
মেঘ রোদ্দুর। অন্ধকার দ্বীপের যন্ত্রণা
অথচ প্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষার সমাপ্তি
এখন
শর্বরী।

লালপেড়ে শাড়ী জড়িয়ে
চলন্ত রেল অবলম্বন না করে
চাবিছড়া আঁচলে নিয়ে
এইমাত্র
শর্বরী।

বরং আত্মসমর্পণ শ্রেয়।

অথবা নিজের আয়নায়

পীযূষ রাউত

তোমার ব্যবহারে প্রচুর ভুলভ্রান্তি; জানিনা নিজস্ব ভুল কিনা এ ও;
প্রচুর পাগলামি তোমার স্বভাবে এক ক্ষ্যাপা ঘোড়ার পদশব্দ
তোলপাড় করছে আশ্রম,
আরাধ্য দেবতার বাসভূমি কেঁপে উঠছে মুহূর্মুহূ—
এ তুমি কেমনতরো মানুষ?
কেমনতরো বুনো?

না কি নিজেই আমি অমন
জানিনা।
কবিতার কাছাকাছি এক শব্দ থেকে আরেক শব্দের মধ্যে
তোমার তো দীর্ঘদিন গেল। তবে কি কবিতারও ক্ষমতা নেই
তোমাকে আরোগ্য করার? না কি রোগে শোকে আমি
নিজেই কাতর, প্রলাপ বকছি রোজ!
তুমি এক অর্বাচীন শিশু
না কি মূর্খ সন্ন্যাসী? তোমাকে আসলে ঠিক ঠিক
কোনোভাবেই
ব্যাখ্যা করা যায় না। অথবা
ভুল ব্যাখ্যায় নিজেই অবোধ্য হয়েছি নিজের আয়নায়!

কবিতাকবিতাকবিতাকবিতাকবিতা

কবিতার অনিয়মিত কাগজ

সময় সীমাবদ্ধ। ঘণ্টায় লক্ষ কিলোমিটার গতিবেগ।
খুব দ্রুত বয়স বাড়ছে।
পড়ে আছে সংখ্যাতীত কাজ।
হে সময়, আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা করো।

জোনাকি

জোনাকি

জোনাকি

জোনাকি

সময় সীমাবদ্ধ। ঘণ্টায় লক্ষ কিলোমিটার গতিবেগ।
খুব দ্রুত বয়স বাড়ছে।
পড়ে আছে সংখ্যাতীত কাজ।
হে সময়, আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা করো।

শরৎ পর্যায় অক্টোবর ১৯৭২

সংকলন

সম্পাদক—পীযূষ রাউত

কাব্যগ্রন্থ যেখানে প্রবাদ কাব্যগ্রন্থ
মৃণাল বসু চৌধুরী
বিশ্ববিজ্ঞান ● ৯/৩ টেমার লেন ● কলকাতা-৯
দাম—তিনটাকা

একটি আলোচনা

মৃণাল বসু চৌধুরীর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'যেখানে প্রবাদ'। প্রথম—'মগ্ন বেলাভূমি', দ্বিতীয়—'শহর কলকাতা' যথাক্রমে ১৯৬৫ এবং ১৯৭০-এ প্রকাশিত। আলোচ্য গ্রন্থ এই সেদিন, অক্টোবর, ১৯৭২-এ প্রকাশিত।

মৃণাল বসু চৌধুরী—বাংলা সমকালীন কাব্যে একটি পরিচিত নাম। বর্তমানে আলোচক বিচ্ছিন্নভাবে মৃণালের কবিতার সঙ্গে পরিচিত। প্রথম দু'টি কাব্যগ্রন্থ পাঠের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে 'যেখানে প্রবাদ'-এ কবির উত্তরণের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কবিতা এখন আর শুধুমাত্র শ্রুতিনির্ভর নয়। তার একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপও বর্তমান। কোন্‌টি প্রধান এই বিতর্কে না গিয়ে বলা যেতে পারে, 'শ্রুতি' কবিতাপত্রকে কেন্দ্র করে পরেশ মণ্ডল, মৃণাল বসু চৌধুরী, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন লাল ধর প্রমুখ কবিরা যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তারই পূর্ণ-প্রকাশ বর্তমান কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। এই আন্দোলনের মৌল উপাদান সম্ভবত ১) ছেদ চিহ্নের বিলোপ ঘটিয়ে প্রয়োজনমতো নিজস্ব উচ্চারণভিত্তিক পংক্তি বিন্যাস।

২) দৃষ্টিগ্রাহ্য অ-পূর্ব রূপের প্রবর্তনা (যদিচ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুরোধা কবি)। অর্থাৎ চিত্রশিল্প ও কবিতার একান্ত ঘনিষ্ঠতা।

৩) বিশেষ গুরুত্ব সহকারে প্রতিটি একক শব্দের সচেতন ব্যবহার।

এক কথায় ব্যবহারজীর্ণ আঙ্গিকের বিরুদ্ধে আন্তরিক বিদ্রোহ। ব্যাপারটা যোগবিয়োগের মত সহজ সরল না। সুতরাং অকবির হাতে পড়ে কাব্যনির্মাণ ব্যাপারটা প্রহসনে পর্যবসিত হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। তবে সামগ্রিক বিচারে এই নোতুন টেকনিক কি খুব বেশি সংখ্যক কবির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে?

'যেখানে প্রবাদ'-এ মোট ৬৩টি কবিতা সংকলিত। প্রত্যেকটি কবিতাই উপরিউল্লিখিত উপাদানে সার্থকভাবে সজ্জিত এবং কবির স্বকীয় মহিমায় দীপ্ত। টেকনিক যেমন উজ্জ্বল; বলা

যায়, কবিতা হিসাবেও বেশিরভাগ কবিতা তেমন্নি উজ্জ্বল। বক্তব্য বিষয়ে কবির দুঃখবাদ—মৃত্যু, অসুখ, ঘৃণা, শোক, দুর্ঘটনা, ষড়যন্ত্র, ক্রোধ, ব্যর্থতা ইত্যাদি শেষঅব্দি সার্বজনীনতায় পরিব্যাপ্ত। এই দুঃখবাদ তির্যক ভঙ্গিতে প্রতিটি ছত্রে মূর্ত।

ক। বিষয়বস্তুর আলোকে এই কবিতাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য—ঘুমন্ত গোড়ালি দেখে, মানুষ, মুক্তি সম্পর্কে, মৃত্যুদিন, বিনিময়, শেষ অভিযান, তবু।

খ। টেকনিকের ঔজ্জ্বল্যে—পরিবর্তে, প্রতিদিন, অথচ আমার, অন্তিম রেখায়, ভয়, স্বদেশ।

গ। বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের সুষম ব্যবহারে অসম্ভব রকমে উজ্জ্বল এই কবিতাগুলি সম্ভবত এই কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা—শীত, চোখ, ইতিহাস, মেলা, ঠিকানা, খেলা।

কবিতাবলীর কিছু কিছু অংশ কবির স্বতন্ত্র ও সার্থক কণ্ঠস্বরের পরিচয় বহন করবে বলে বিশ্বাস। এইগুলো :

১) হঠাৎ ঠোঁটের কাছে
শব্দ করে ভেঙে যায় হলুদ পেয়ালা
হাত
খড় নয়
রক্ত ও মাংসের শরীর
স্পষ্টত তখনই ঠিক ছায়া পড়ে
নাভিমূলে থেমে যায় লোভ *(ভাঙা আয়নায়)*

২) শরীরে জ্যোৎস্না মেখে জলস্রোতে একা একা
তুমি ভেসে গেলে *(আমাকেই অলিন্দ পেরিয়ে)*

৩) মৃত
মানুষের চোখ
বড়ো বেশী
কথা বলে *(চোখ)*

৪) গরাদে রেখেছো স্মৃতি
স্মৃতির দু'হাতে দুঃখ *(বৃষ্টি)*

৫) জেটির ওপার থেকে হাওয়া এলে না
হঠাৎ সমস্ত ঢেউ ভেঙে গেলে না *(অথচ না)*

পরিশেষে গৌতম রায়ের আঁকা অপূর্ব প্রচ্ছদের প্রশংসা করে বলতে হয়, কবিসত্তার খুব কাছাকাছি পৌছতে পেরেছেন বলেই সুন্দর একটি ছবি তিনি আমাদের উপহার দিতে পেরেছেন। শিল্পীকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

—পীযূষ রাউত

• পি. আর. ব্রাউন-এর দু'টি কবিতা

অনুবাদক : কার্ত্তিক লাহিড়ী

আফ্রিকা

আমার আফ্রিকা যাওয়া দরকার।
আমি বিড়-বিড় করে বলি :

'মা-বাবা, আমি আফ্রিকা যাবোই,'
কিন্তু তাঁরা আমার কথায় কান দেন না.

ছোট্ট কবিতা

আমি একটা কবিতা রচলাম
তারপর ছুঁড়ে দি' নদীর জলে
মাছ ভাবল এটা বুঝি রুটি
এবং তারা খেয়ে ফেলল।

• প্রিয়ধ্বনির জন্য কান্না

শম্ভু রক্ষিত

বিপুল ত্রিভুজ বর্গক্ষেত্র অঙ্কনবিদ্যার উপগ্রহ সংঘবদ্ধ
আর ব্যবহৃত আলোকচিত্র নিয়ে এই সরলতা বৃহৎ সততা
নির্মল গুরুতর অণু পৌছান সমেত অদৃশ্য প্রলেপভাষা
ব্যবস্থা মনন সূর্যচন্দ্র উচ্ছলতা ও সম্পূর্ণ ঢেউ
বিবর্তন ধোঁয়া পর্বতরূপ আর ফুল ফলের প্রীতিশূন্য নিয়ে একত্রিত হও
আধুনিক বিজ্ঞান স্মরণশক্তির নির্ণয় হয়ে প্রয়োজনীয়
অনুকরণ ভয়াবহ সর্বাধিক সংঘবদ্ধ, কী গভীর
ভারাক্রান্ত ও ওইরূপ যা সম্ভবতঃ কাছে
রক্তবহাতন্ত্র ফুসফুসের শব্দ হয়ে, ক্লান্তিময়, সেই চেষ্টা কর
নিমজ্জিত মসৃণ বাহু দৃষ্টান্তের মধ্যে মুঠোভরে
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বায়ুমণ্ডল সার্থকতাময়! পর্যায়ক্রমিক
জটিল অদ্ভুত স্ফুলিঙ্গ সংক্রমণ বারংবার
যাতে আমি অনিবার্য হয়ে যাই ও তড়িৎ পদার্থ ঘড়ি
ঋজু পরমাণু আবিষ্কার করে যায়, জানায় বেদনা
দীর্ঘ প্রচেষ্টা সে থাকে, অন্তরক ছেড়ে কিনারায় উঠে যায়
সে উন্মাদ ক্লান্ত স্বাধীন আগ্রহ নিয়ে
কোনো ক্রীতদাস যেন অন্যপাশে অদৃশ্য উজ্জ্বল
তোমার আর্দ্রতা আর গোপন বড় সমস্যা
প্রাকৃতিক বাষ্প, বিস্ময়ে ভরা সন্দেহ ঐতিহ্য সমুদ্র
স্মরণশক্তির পরীক্ষা—বাফন গহ্বর সবই
জ্যোতিস্মান অদ্ভুত স্বপ্নে অদ্ভুত পাখি চলেছে
সহানুভূতি ও সহস্পন্দন। অদৃশ্য অবস্থায়, পবিত্রতায় তুমি চলে যাও
গিরিমাটির মনোরঞ্জন আদৌ দেবে কি না, কুসুমিত প্রহেলিকা নিখাদ উপগ্রহ
আপাতত সৌভাগ্য খুঁড়ে অদৃশ্য ব্যাপ্ত। দীপ্ত আকৃতি
কিংবা সেই প্রহরের আলাপ আহরণ
নাকি অভিজাত নামে এই সোনার মুদ্রণ, শারদ সাগর সম্পদ তীর
প্রস্তর মৌলিক পূর্ণগ্রাস আর্দ্র আপন বধির নিয়ে উদরপূর্তি, কারুকার্য হয়ে যাওয়া

বিষয়বস্তু উদ্ভিদ নৈশ কক্ষে স্বর্গ মেঘে ঐ পরিবর্তন নিঃসন্দেহে তা
প্রকাশিত কল্যাণ হয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষিত সংরক্ষিত যেন
নিমজ্জিত তুষার শৈলের প্রয়াসের কাছে
দুরারোগ্য দেবমূর্তি অস্ত্রগুলির পরীক্ষা মন্দির
সুনির্দিষ্ট তুমি, সূর্যাস্ত বা রং হৃদযন্ত্র সক্রিয় হল কক্ষপথ চিরন্তন প্রায়
তোমার গতিবেগে,
ধর্মীয় জ্যোৎস্না নিয়ে বিস্মিত স্তম্ভিত অগ্নি তুমি এনে দাও।।

● নগর-রক্ষী

প্রদীপ দাশশর্মা

এখন চেয়ার ছেড়ে ওঠা যাবে না
অমিয়কান্তির সেতার ডাক দিলেও না।
কেউ আমাকে বাস্তবিক ডাকলে
মস্তিষ্কের সব স্যুইচ জ্বেলে দেব
কোনো কবিতা লেখা হচ্ছে কিনা কোথাও ... ...
'যা কিছু ব্যক্তিগত তাই পবিত্র'
—এইসব লাইনের প্রতি গার্ড অব অনার
পাঁচজনের কথা থাকলে অতঃপর ১৪৪-ধারা কবিতায়।

শুধু দূরে টেলিফোন-পোস্টের মত অসংখ্য পাইন-শীর্ষ
প্রবল বাতাসে
আমাকে পৃথিবীর ফোন নাম্বার ফিরিয়ে দিচ্ছে অনবরত
এবং জনতার ক্লিষ্ট মুখ।

● আজো কাঁদি কেন

অনিল কুমার চক্রবর্তী

আকাশ আগেরই মতো নীরন্ধ্র নির্বাক নীল
প্রত্যগ্র বিহঙ্গ ডানা মেলে
মহাশূন্যে উড়ে যায় হৃদয় বিবাগী
যায় নিত্য উড়ে যায়
বাতায়নে দেখি একি রহস্য বিথার!
আকাশের নীল আর দুরন্ত এ প্রাণ-চিল
আমরা তো উভয়েই চিরযাত্রী
চলেছি তো দিন রাত্রি জন্ম মৃত্যু বাঁধা সেতুপথে।
কর্ম্মসূত্র জয়পরাজয় লাভক্ষতি অভিশাপ সর্বনাশ
সবই জানি
অনেক অনেক দিন ধরে
পর্বত প্রমাণ সব ঋণ জমা হয়ে আছে পৃথিবীর কাছে
হাসিমুখে হাড়ে হাড়ে সব শোধ করে দিতে হবে সকলেব
প্রাণবন্ত জীবন্তের মৃত্যু পর্যটনে যেন।
এত প্রজ্ঞা সমুজ্জ্বল তবুও জানিনা
একাকী নির্জ্জনে বসে আজো কাঁদি কেন!

• এই পৃথিবী

অমিয় ভট্টাচার্য

১.

এ্যাই তোর হাতে কী?
মুখে
ঠোঁটে
চোখে
রক্ত! রক্ত! রক্ত!

এ্যাই কত আছে—
কত?
এক পুকুর?
এক সমুদ্দুর?
না আরও ... ?

আয়না?
সেয়ানায় সেয়ানায় হোক পাঞ্জা,
দেখি ... তোর
না আমার
না অন্য কারো
এই মাটি!
এই দেশ!
এই পৃথিবী!
—এ্যাই আয়না?

২.

দেওয়াল ঘড়ি বাজলেই
আমার ঘরে ভূমিকম্প হয়
চতুর্দিকে সাইরেনের শব্দ—ভীষণ বিপদ;
আত্মরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা ... একটি মুখ
অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তাকে খুঁজি
তার চুল ... তার চোখ
বুকের নরম মাংস ... মিষ্টি গন্ধ
... ... ভীষণ মিষ্টি।
ঘড়ি থামলেই ... সাইরেন স্তব্ধ।
ঘর্মাক্ত শরীরে গাঢ় অন্ধকারে
প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিই
... আমি একা ... একা।

• সেই দুর্লভ পথ-স্বগত সংলাপ

মানিক চক্রবর্তী

দুঃসহ শূন্যতার দেহ থেকে ভাবনাগুলো ঘাম হয়ে
ঝরে পড়ে ভেসে যায় আকাশ পাতাল মাঝে মাঝে
গলি পথে ছুটে আসে কয়েকটা দামাল ছেলে হয়তো বা
বলা যেতে পারে কয়েকটা মস্তান বোমা মেরে চারদিক
ভেঙেচুরে তছনছ কিংবা কোনো নির্দয় খুনীর কাছে
অসহায় আত্মসমর্পণ।

কানের ভেতর শুধু হাজার হাজার ঝিঁঝির সমবেত প্রার্থনা
অগর্ভা প্রান্তরে শুনি বিষণ্ণ বাতাস বাজায় অন্ধকারের
বাঁশী। কোথাও পালিয়ে গিয়েও রক্ষে নেই চেনা মহল
গুটিয়ে নেয় সুতো পিছুটান তাই বড়ো বেশী লাগে
দু'হাতে আঁকড়ে ধরে ভিখিরি জীবন।

অনেক ভাবনাই এখন ঘুরে ফিরে আসে বুকের ভেতর
বোমা পটকা কিংবা যুদ্ধবাজ রাজনীতি অথবা বলা
যেতে পারে শুধুই গুণ্ডামি—এ'সবে নাম লিখিয়ে
সক্রিয় জীবন না হয় নির্দয় খুনীর কাছে সমর্পিত
শুধুই ভালো মানুষ অথচ তা কিছুই হবার নয়—
বুকের গভীরে আঁকা হয়ে গেছে নিজস্ব প্রতিমার
মুখ আর তখনি গভীর নীলের বুকে বার বার
শিহরিত হয় শ্বেত পতাকা।

তোমাকে ফিরে পাওয়ার সেই দুর্লভ পথ স্বগত সংলাপ
আর ডুবন্ত নাবিকের হাত থেকে শেষ শক্তি নিয়ে
তোমার কাছেই ফিরে পাই যত কিছু সান্ত্বনা একান্ত
নির্জনে এখানেই নিহত হয়ে পড়ে নিজস্ব যন্ত্রণা।

দু'টি কবিতা

● আমার দুঃখগুলো

পূরবী রাউত

১.

আমার দুঃখগুলো ঠিক তেমনি
ঊনকোটির ঝর্ণার মত জাগ্রত, জীবন্ত,
অমানুষিক পদধ্বনি যেন।

আমার গল্পগুলো অনৈতিহাসিক।
উঁচু পাহাড়, উপত্যকার মত নির্জন;
অচল দু'আনি পয়সা যেন।

আসলে আমার কবিতাগুলো
অব্যক্ত অস্পষ্ট—সংখ্যায় বেড়ে
পুরনো যুগের মত
থেমে যাওয়া এক এক ঘটনা।

২.

বিস্তীর্ণ সুখ থেকে কিংবা
তথাকথিত পাপ আবার
কী জানি অদৃশ্য বস্তুর আকর্ষণে
টানছে।
আসলে কতকগুলো উত্তম আকাঙ্ক্ষা
সূর্য শুকিয়ে নিচ্ছে।
তাই বাতাসে শুঁকে পাচ্ছি
পাপের গন্ধ, সুখকে হারিয়ে ফেলেছি
সাগরে।

• আত্মার ভিতরে

নিতাই আচার্য

কোনো এক সূক্ষ্ম চেতনাবোধ
কাজ করে—
তোমার আত্মার গভীরে—
আসলে তুমি এখনও প্রাগৈতিহাসিক
অবোধ্য শিলালিপি
পাঠোদ্ধারের অপেক্ষায় অত্যন্ত
সযত্নে রক্ষিত—;
অথবা,
খণ্ডাংশ তোমার বোঝা গেছে
অক্লান্ত প্রচেষ্টায়—
আর কিছু, সময় ও সুযোগের
অপূর্ব মিশ্রণে।
এই রকমই বুঝি বা হয়
সময়ে সময়ে
কখনো রৌদ্র কখনো বা মেঘ—
এবং
গভীর মেঘের মধ্যে,
চিরন্তন রৌদ্রের অপেক্ষায়
তাইতো বসে আছি।

আত্মস্থ বিশ্বাসের জন্যে

হিমাদ্রি দেব

এই ভগ্ন প্রাসাদে বসে
মোমবাতি জ্বালাবে সম্রাজ্ঞী
স্মৃতির অতল থেকে
লাফ দেবে সাহসী যুবক?
এই ঘোর দুর্যোগের রাত কেটে গেলে
সুহাসিনী মহিলার মত চাঁদ
চন্দনের স্নিগ্ধ ঘ্রাণ, হৃদয়ে ছোঁয়াবে?
তবে এসো গোল হয়ে বসি ক'জনার
নোতুন ছায়ার জন্যে
চলো তবে মন্ত্র পাঠ করি,
ক্রমশই বেড়ে উঠুক
আত্মস্থ বিশ্বাসের জন্য কিছু দীর্ঘতর
রাত।

• উদ্‌যাপিত শোক

মনোতোষ চক্রবর্তী

বনের অন্তরে তীব্র হা-হা শব্দে ছুটে গেলে হাওয়া
একটি শব্দের পিঠে আরেকটি শব্দ গেঁথে আমি
পাশ ফিরি—
এমন আলস্য।
একটি শব্দকে আমি সান্ধ্য-প্রকৃতির
বিস্তৃত ভুবন থেকে
তুলে আনতে গেলে আজ হাতে ফোস্কা পড়ে
গভীর ছলনাময় হা-হা শব্দে
ছোটে খর হাওয়া
সদ্য ঋতুমতী বালিকার লজ্জা-ভাঙা অভিমানে
একটি শব্দের মুখ দেখতে চেয়েছি, যুগলমিলনে
সতীচ্ছদ-ছেঁড়া যন্ত্রণায় আশরীর কাঁপে শব্দ
—এই দৃশ্য এখনো অনুপস্থিত
তবু, আমার নিভৃতি ভেঙে
. 'লেখা চাই' ধ্বনি
শব্দ অভিমানী, সহজ-না মুখ দেখা তার
বনের অন্তরে আজ হা-হা শব্দ ভেসে যায় হাওয়া

● ম্লানমুখে তিনি বললেন

পীযূষ রাউত

ম্লানমুখে তিনি বললেন—ফিরে এসো।
ম্লানমুখে সমস্ত শব্দই ম্লান হয়ে যায়।
তিনি কাঁদলেন। কাঁদলে জোছনা নিভে যায়।
কাঁদলে অঝোর বৃষ্টি পড়ে।

আর, আর
আমার এই টিনের ঘরে কারা যেন ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে
অন্ধ করে
ভালোবাসার চোখ।
হে ভালোবাসা, তারা কেন তোমাকে অন্ধ করে?
কেন এই অন্তর্ঘাতী বিপ্লব তোমাকে নিয়ে?
হঠকারিতা অমন?

তিনি বলেছিলেন,—ফিরে এসো।
ফিরতে গিয়ে
হাতড়ে বেড়াই সেই দীর্ঘ, সেই দীর্ঘ দেয়াল,
যার দৈর্ঘ্য কম করেও একটা জীবনের মতো।
ওহে আমার চতুর্দিকে,
তোমরা কারা গোল হয়ে বসে আছো?
অন্ধজনে দয়া করো

কেউ আসে না।
হাহা হিহি হাহা হিহি হাসতে হাসতে বাতাস পাড়ি দ্যায়
দুরন্ত সমুদ্র, মাঠ, বনভূমি।
ফিরতে গেলে সেই একই দৃশ্য—
দাঁড়িয়ে থাকি একই স্টপেজে।

রাত্রি নেই
দিন নেই
সমস্ত কিছুই নষ্ট সময়। এক ছুটন্ত বিমানের শব্দ শুধু
অন্তরাত্মায় খেলা করে।
অন্তরাত্মায় খেলা করে এক লহমার মৃত্যু, এক লহমার
হাস্যকর প্রেম।
ম্লানমুখে তিনি বলেছিলেন—ফিরে এসো।

একগুচ্ছ
কবিতা লিখেছেন সমরজিৎ সিংহ
এবং
শংকর চক্রবর্তী
এই সংগে
একটি করে কবিতা লিখেছেন
মৃণাল বসুচৌধুরী
এবং
পীযূষ রাউত
শঙ্খ ঘোষ-এর কাব্যের উপর
একটি আলোচনা
লিখেছেন অনিল কুমার চক্রবর্তী
এই সংগে
একটি প্রবন্ধ লিখেছেন
অরবিন্দ ভট্টাচার্য

জোনাকি

শরৎপর্যায় অক্টোবর— ডিসেম্বর ১৯৭৩
সংকলন—১৩
সম্পাদক—পীযূষ রাউত

জোনাকি

.শরৎ পর্যায়—১৯৭৩

জোনাকি

সংকলন—১৩

সম্পাদক—পীযূষ রাউত

প্রকাশক—সৈকত রাউত

প্রকাশ স্থান—গোবিন্দপুর, কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা, ত্রিপুরা

মুদ্রণে—শ্রীপ্রেস। কৈলাসহর। ত্রিপুরা।

বক্তব্য—

ঠিক একবছর পর 'জোনাকি' বেরুলো।

* * *

'জোনাকি' হঠাৎ হঠাৎ বেরুবে। কিন্তু কোনোদিনই লক্ আউট ঘোষণা করবে না। কারণ, মুখ্যত, লিটিল ম্যাগাজিনের প্রতি ত্রিপুরা সরকারের আন্তরিক সহানুভূতি। গৌণত, বর্তমান সম্পাদকের যথেষ্ট পরিণত বয়স এবং বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে না থেকে একা কাগজ বার করার ইচ্ছা এবং প্রয়াস।

* * *

সমরজিৎ সিন্‌হার বয়স ১৭/১৮। কলেজে সদ্য ভর্তি হয়েছে। তেজি হাত। তবু ভয় হয়। কারণ, জনেশ চাক্‌মাও এই রকম ছিলো। জনেশ কোথায় আছে জানি না; কবিতা পাঠকের দুর্ভাগ্য জনেশের কবিতা তাদের পড়া হলো না। সুতরাং সমরজিৎকে নিয়েও ভয় হয়।

* * *

'সাহিত্য' ত্রিপুরা, কাছাড় ও মেঘালয় থেকে যুগ্মভাবে প্রকাশিত হলেও ত্রিপুরা সরকারের বিজ্ঞাপন পেল না। বলা বাহুল্য, আসাম এবং মেঘালয় সরকারও এ বিষয়ে বরাবরই অনুদার। শুধু দুঃখ হয়, একটা ভালো কাগজ (সম্পাদক : বিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য) সামান্য কিছু টাকার অভাবে অচিরেই একদিন হয়তো ইতিহাস হয়ে যাবে।

* * *

একটা দামী (গুণগত মানদণ্ডে) কাগজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদকের। সম্পাদকের রুচিবোধ পর্যাপ্ত না থাকলে এবং সম্পাদক একজন 'সৎ পাঠক' না হলে কখনোই দামী কাগজ বার করতে পারবেন না। এর ফলে আগাছার ভীড় বাড়বে। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবসায় ভালো হবে কিন্তু লিটিল ম্যাগাজিনের যে দৃপ্ত ভঙ্গিমা, যে উজ্জ্বল পৌরুষ তা কোনোদিনই লক্ষ্য করা যাবে না। আমার ধারণা, আমরা অনেকেই এই সত্য জানি না।

* * *

মফঃস্বলী লেখকেরা অল্পেই তুষ্ট। বর্ণবোধ শেষ না করতেই রামায়ণ-মহাভারত শেষ হয়ে যায়। এই কারণে, বিশেষ করে এই দিক্‌কার একজন কবি-সাহিত্যিকও জীবনের শ্রেষ্ঠতম রচনা লিখে যেতে পারলেন না। অথচ সময় ঠিকই ফুরিয়ে যায়। প্রচণ্ড গতিতে ছুটে আসে জরা এবং বার্ধক্য। যদিচ পারিপার্শ্বিকের ব্যারিকেড়, 'কৌনহ্যায়' বলে নিয়তই পথ আগলে দাঁড়ায়।

—সম্পাদক/অক্টোবর, ১৯৭৩।

একগুচ্ছ কবিতা •

সমরজিৎ সিংহ

১. অবশেষে সুমিতা, তোমাকে

কথা ছিলো,
চৈতন্যের নির্জন প্রকোষ্ঠে ফিরে যাবো।
যেখানে সুমিতা তার
সমস্ত অন্তর্বাস খুলে দেয়—
দাঁড়ায় শস্যহীন দগ্ধ প্রান্তরে।

কথা ছিলো,
কুয়াশার পাংশু পটে যে বালক
মিশে গেছে
তাকে আমার সমস্ত কুশল জানাবো।

কথা ছিলো,
নক্ষত্রের নিপুণ কারু সাজে
আমার ব্যাকুল যৌবন বাঁধা দেবো
সুমিতার কাছে।

অথচ সুমিতা,
যার শরীরে বারুদের প্রবল ঘ্রাণ—
তাকেও ভালোবাসা দেই নি।
এবং সন্ন্যাসীর মতো ফেলে আসি
সমস্ত জনপদ। আর,
যখন নিহত মানুষের পদধ্বনি বাজে
সমস্ত প্রান্তর জুড়ে;

তখন পুনর্বার বলে উঠি—
: আমার শুদ্ধতম ভালবাসায়
অবশেষে সুমিতা
তোমাকে জড়িয়েছি।।

২. স্মরণীয় দিনগুলি

মানবীয় মহিমায় ভীড় করে স্মরণীয় দিনগুলি
অবনত মুখে
চারপাশে, কবরের নির্জনতা নিয়ে
ফিরে আসে
আলোর প্রপাতে কিংবা
স্মরণীয় দিনগুলি রক্তের গভীরে
প্রতিধ্বনি হয়ে ফেটে পড়ে।
নির্জন দুপুরে আলস্যের মমতায়
মাখামাখি
সে পাখির স্মৃতি এবং
নদী ফুল প্রতিচ্ছবি নিয়ে
স্মরণীয় দিনগুলি,
নদীর ভিতরে অঙ্কিত মহিমা
নিজস্ব জীবন কিংবা
নিজস্ব সঞ্চয় হয়ে পোস্টাফিসে
স্মরণীয় দিন ...
মানবীয় মহিমায় স্মরণীয় দিনগুলি
চারপাশে,
অবনতমুখে, মাতৃহীন ... ... বড়ো অসহায়।

৩. বকুলের চোখে স্বপ্ন

সারারাত বকুলের চোখে স্বপ্ন,
শৈশবের স্মৃতি, স্মরণীয় দিন এবং মার ম্লান মুখ
রাতের নৈঃশব্দ ভেঙে বকুলের
বিকৃত প্রলাপ
: মা, মাগো—
সারারাত বকুলের কান্না।

পুকুরঘাটে চাবি হারিয়ে শৈশবে
বুকের উপর
দু'হাত রেখে
প্রার্থনা : ঈশ্বর! আমাকে তোমার
চেতনার ম্যাজিক শিখিয়ে দিও।
শৈশবে পাপ ছিল না। তাই
অলীক ঈশ্বর হয় যাদুকর। এবং ঈশ্বরের
মুখের আদলে মা'র মুখচ্ছবি
শৈশব
স্মরণীয় দিন
এবং এসব আজ পবিত্রতায় মুখর।
সারারাত বকুলের চোখের সামনে
স্বপ্নের কানামাছি
আশ্চর্য্য পবিত্রতায় ভরা।
স্বপ্নের কানামাছি খেলছে ফুলেদের কাছে।
ফুলের ভেতর প্রিয়জন এবং স্মৃতি।
প্রিয়জন এর কাছে
যেতে বড়ো ভয়।
তাই সারারাত বকুলের কান্না।
: মাগো, আমি তোমার অক্ষম্ ... ...
রিয়াং মেয়েদের গানের মতো রাতের নৈঃশব্দ
ভেঙে বকুলের বিকৃত প্রলাপ।
সারারাত বকুলের চোখে স্বপ্ন,
প্রিয়জন, মা'র ম্লান মুখ এবং স্মরণীয় দিন
স্মরণীয় দিন এবং শৈশবের ভেতর
বকুলের বিনিদ্র স্বপ্ন।

৪. শরিক

কে এসে যে হাত মিলাবে, শরিক হবে
এইজন্য
বুকের ভেতর সাত-গণ্ডা ইতস্ততঃ
উৎকণ্ঠা কিংবা দ্যাখো দু'চোখ জুড়ে বৃষ্টি।
পাহাড় থেকে নদীর খেলা

সাগরমুখী
শরিক তো নেই কেউ।
কে এসে যে হাত মিলাবে, শরিক হবে ...
এদিক ওদিক এন্নি কোরে
নাগর দোলায়
কিংবা দ্যাখো গাঁইতি শাবলে পাথর ভাঙার
ইচ্ছে নিয়ে
শরিক খুঁজেই আছি।
কে এসে যে হাত মিলাবে, শরিক হবে ...।

৫. এই সব ছায়াগুলি

এইসব ছায়াগুলি জড়ো হয়
অবনত মুখে
বিকেলের অবসন্ন মাঠে। তারপর
শোক সভা চারদিকে। হাসপাতালের
থমথমে
আবহাওয়া বেঁচে রয় আকাশে বাতাসে।
শীর্ণ ম্লান মুখগুলি নত হয়
শহীদ বেদীর কাছে।
এই সব ছায়াগুলি বারুদের মতো
চারদিকে ফেটে পড়ে এক সময় বিক্ষোভে।
তারপর, অন্ধকারে ডুবে গেলে মাঠ
স্ফুলিঙ্গ ছড়ায় তীব্র প্রতিবাদে।
এইসব ছায়াগুলি প্রিয় সব নেতাদের
জ্বলন্ত প্রতীক।
সহ্যের দেয়াল ভেঙে গেলে এরা জানে
প্রতিরোধ কি করে যে নিতে হয়।
এই সব ছায়াগুলি ... ...

একগুচ্ছ কবিতা •

শংকর চক্রবর্তী

১. একদিন, চিন্তিত মানুষেরা

একদিন সমস্ত সকাল বিছানায় শুয়ে থাকলো
চিন্তিত মানুষেরা
একদিন তুমি অর্থে সেই ব্যর্থ কবি
স্কচের বোতলে পরালে জংলী পোষাক
সাবান ব্রাশ-ক্রুশ দিয়ে সাফ্ করলে তাকে
সাফ্ করলে পোশাক
একদিন হঠাৎ ব্যস্ত সমস্ত হাতের পাঁশেই থেমে গেল
দ্যাখো
থেমে থাকে সারাজীবন মানুষেরই হাত
এইসব উল্টোপাল্টা ভুলটুল শিখে নিয়ে
কেমন মজার মজার সেলুন ঘুরে এলে তুমি
দাড়ি কামাবার ছলে লাফ্ দিলে সিঁড়ি
লাফ্ দিল চিন্তিত মানুষেরা
একদিন

২. সফেদ স্বপ্ন

তখন স্বপ্নে সব কথা মনে হয়েছিল
যেমন
রূপালী ময়ুর ডানা ঝেড়ে অরণ্য খোঁজে
ঘাসের গন্ধে জেগে থাকে তার আয়ু ও সকাল
তখন কুঁড়ির কাছেই সুখের উত্তাপ
অরণ্য খোঁজে উৎসুক বেদনায়
তখন শঙ্খ
বিষাদ ও সমুদ্র
তখন বিষণ্ণ কলম
চোখের পাশে চুলের পাশে নাভির পাশেই থেমে গিয়ে
সফেদ স্বপ্নের কথাই মনে করে

৩. দ্যাখা যায়, দ্যাখো অশরীরী মেষপালক

ঐ দ্যাখো গাছ এখনও নুয়ে পড়ে ফুলসমেত ফলমূল
ঐ দ্যাখো সাজানো মোমের ঘর আর অঙ্গীকার
দুদ্দাড় ঢুকে পড়ছে ক্যামেরাম্যানের আখড়ায়
কখনও দ্যাখা যায় লোভ ঢুকে যাচ্ছে প্রীতির ঘরে
লোভেরা যেমন ইচ্ছায় ওড়ায় ব্যাধি
প্রতিদিন ভিটামিন উড়ছে হাহা উড়ছে বাতাসে
সশব্দে আওয়াজ কাড়ছে বেমক্কা চাক্কু
বন্ধুরা কোথায় এখন কোথায় লুকোনো শিল্পকলাসংস্কৃতির পোঁদে
লেজুড় হয়ে ঝুলে আছে মোলায়েম সুর
আবার কখন এক নির্জন কিশোরীর বুক
ভুল করে দেখে ফ্যালে অশরীরী এক মেঝপালক

দ্যাখো, ঐ দ্যাখো, এখনও দ্যাখা যায়
মেষপালক
হাতের মুদ্রায় নিয়ে যায় সংখ্যাগুলো
যেমন তেমন গুণে দ্যাখা যায়
যেখানেই প্রবল জলোচ্ছ্বাস কিংবা
স্রোতহীন লবণাক্ত বাতাস

ছিলে প্রতিবাদে •

মৃণাল বসুচৌধুরী

ছিলে প্রতিবাদে
ছিলে নাম ভূমিকায়
সভ্যতায়
ভেঙেছে উঠোন
শ্রম ও সাধ্যের কাছে ক্রীতদাস
বিষণ্ণ গৌরব
তবু ভুল
তবুও স্বাধীন
অনুশোচনার আগে
নিস্তব্ধ রোদ্দুর জুড়ে প্রতিবাদ
হলুদ পাতার ফাঁকে উদাসীন
তোমার শরীর

সুখ সম্পর্কিত •

পীযুষ রাউত

১। পর্যাপ্ত সুখ নিয়ে ফিরে আসবে
হারানো জাহাজ।

২। দ্যাখো, সমুদ্রের কী ভীষণ বিস্তার
কী গভীর মহাশূন্য; আমার সম্পর্কে
জন্ম নেবে তীব্র আকর্ষণ মানুষের।

৩। আমাকে দিয়েছিল সেই কুমারী
একদিন
গোপন ভালোবাসা; কব্জিতে
অমন শক্তি ছিল না পথ আগলে দাঁড়াবার
সেই পুরুষের।
যে আমার আজন্ম প্রতিদ্বন্দ্বী।

৪। আজ জন্মদিন তার।

৫। শঙ্খ বাজে দুরান্বিত পল্লীগ্রামে—
কল্যাণীর বিবাহবাসর দারুণ উজ্জ্বল।
কথা ছিল আমার যাবার।
দুঃখ নেই; জানি সুখে থাকবে কল্যাণী।
যার বুকে ছিল দুঃখী শ্রাবণ, যার ছিল
একটিমাত্র শাড়ী আর
কাঁচনির্মিত চারগাছি চুড়ি।

৬। মধ্যবয়সে আজ আমি সুখে সুখে
পাগল হয়ে যাবো।

৭। আমার সংসার জুড়ে নীলকান্তমণি আলো জ্বালবে
কাল; পর্যাপ্ত সুখ নিয়ে
ফিরে আসবে হারানো জাহাজ।

আলোচনা

শঙ্খ ঘোষের কবিতা •

অনিলকুমার চক্রবর্তী

'সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার। কিন্তু জীবিকা-বশে শ্রেণীবশে এতই আমরা মিথ্যায় জড়িয়ে আছি দিনরাত যে একটি কবিতার জন্যেও কখনো কখনো অনেকদিন থেমে থাকতে হয়। উপরন্তু আমি যে আধুনিকার কথা ভাবি সেখানে মন্থর পুনরাবৃত্তির কোনো মানে নেই, অবাধ প্রগল্‌ভতার কোনো প্রশ্রয় নেই।'

বলেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ, 'ভারারি' প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকাতে। তাঁর এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা তাঁর কবিতা আলোচনায় অগ্রসর হব। বর্তমান লেখকের সমালোচক সুলভ বিচক্ষণতা সীমিত, তাই একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে শঙ্খ ঘোষের কবিতার একটি অপূর্ণাঙ্গ আলোচনায় অগ্রসর হতে হচ্ছে, 'জোনাকি' সম্পাদকের আগ্রহে।

শঙ্খ ঘোষের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা সম্ভবত পাঁচ—১) দিনগুলি ও রাতগুলি, ২) নিহিত পাতাল ছায়া, ৩) তুমি তো তেমন গৌরী নও, ৪) শিকড়ের ডানা এবং ৫) আদিম লতা জন্মময়। 'শিকড়ের ডানা' অনুবাদ কবিতার সংকলন বলে এ আলোচনায় সে রইল না।

'দিনগুলি ও রাতগুলি' শঙ্খ ঘোষের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। রচনাকাল—১৯৪৯-৫৪, প্রকাশ ১৯৫৬-তে। কাব্যগ্রন্থটির প্রাথমিক কবিতাগুলো তারিখ চিহ্নিত, নামহীন, কতকগুলি দিনের রাতের আর প্রভাতের কবিমানসের অনুভূতির অভিব্যক্তি। এখানেই এর আঙ্গিকের অভিনবত্ব। চিরাচরিত পদান্তিক মিলন পদ্ধতি উপেক্ষা করে অন্তঃসলিলা ফল্গু প্রবাহের কলধ্বনি সৃজন করেছেন কবি শব্দের সুসমঞ্জস ধ্বনি সাম্যময় প্রয়োগে। প্রতীক রূপকেও নতুন

পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তা সার্থকতায় উজ্জ্বল।

দিনের আলোকের চাইতে 'সুনিবিড় তমস্বিনী ঘনভার রাত্রি' কবির প্রিয়। রাত্রির এই গভীরেই জীবনের প্রকৃষ্ট চেতনা জাগ্রত হয়, নিজের হৃদয়ের অনুভূতির মুখোমুখি দাঁড়ানো চলে। কী আর প্রকট এই জীবনে? বেদনা, শুধুই বেদনা। অনুভূতির তীব্রতায় জীবনব্যাপী বেদনার মরুযন্ত্রণা। সেই বেদনাই ভাষা পায় কবিতার রূপাঙ্গিকে। কবি বলেন,

হে আমার তমস্বিনী মর্মরিত রাত্রিময় মালা,
মৃত্যু ফুলে বেদনার প্রাণদাত্রী ফুলে ফুলে হে আমার উদাসীন মালা,
আমার জীবন তুমি জর্জরিত করো এই দিনে রাত্রে দুপুরে বিকেলে
এবং আমাকে বলো, 'মাটির প্রবল বুকে মিশে যাও তৃণের মতন';
আমি হব তাই
তৃণময় শান্তি হব আমি।।

জীবনের বোধে আকাঙ্ক্ষার বেগ। সেই গতিই জীবনকে চালিয়ে নিয়ে চলে—পথ থেকে পথে, বৈচিত্র্য থেকে অধিকতর বৈচিত্র্যে। *'আকাঙ্ক্ষা উন্মত্ত হয়'*। কিন্তু *'অবকাশ হারা গূঢ় ব্যথিত আরক্ত চিত্ত, বারংবার ঘুরে ঘুরে একই বৃত্তে অবিরাম সে এনেছে একখানি শুধু যন্ত্রণার ডালা।'*

ব্যথায় ভরা এই মানব-অস্তিত্বের সান্ত্বনা নিয়ে আসে *'কবিতা কল্পলতা আকুলা চঞ্চলতা'*। আর এই কবিতার কবিবেদনা 'বাঁধে সে তমস্বিনী'। কিন্তু 'দিনগুলি ও রাতগুলি'র কবি জানেন, কবিপ্রাণের ক্রন্দন চিরন্তন। তাই তিনি বলেন, *'তবু কে কাঁদছে সুরে? কবি কি নিত্য কাঁদে? কবি সে নিত্য কাঁদে/আকাশে নিত্য বেদন।'*

তারিখ চিহ্নিত শেষ কবিতাটি গদ্যের সাধারণ রূপে চোখের সামনে ধরা দেয়। কিন্তু তারই মধ্যে শব্দ সৌসাম্যের নুপূর পায়ে পায়ে বাজে এবং শেষের চরণটির প্রতীক কল্পনা পাঠকচিত্তে কবিত্বের যথার্থ স্বাদ এনে দেয়—*'রজনী শাঙন-ঘন, জীবন ময়ূর, দুঃখ কাঁপে দুর্বল দারুণ। প্রেমের বিকীর্ণ শাখা ফুলে ফলে জ্বলে। * * * রাত্রির কলস ভেঙে প্রভাত গড়ায় দিকে দিকে।'*

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে এরপর রয়েছে নাম দিয়ে চিহ্নিত কতকগুলি কবিতা। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—বাউল, কবর, স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে, বলো তারে শান্তি শান্তি, যমুনাবতী, সূর্যমুখী, পথ, আড়ালে, কলহপর প্রভৃতি কবিতা।

কয়েকটি কবিতায় কবির ব্যক্তিজীবনের সুখ-দুঃখ স্বভাব প্রবণতা প্রভৃতি চিত্রিত রয়েছে। কবির স্বভাব ছোটো অবুঝ শিশুর মতো অবোধ—

যখন যা চাই তখুনি তা চাই,
তা যদি না হবে তা হলে বাঁচাই
মিথ্যে, আমার সকল আশায়
নিয়মেরা যদি নিয়ম শাসায়

দগ্ধ হাওয়ার কৃপণ আঙুলে—
তা-হলে শুকনো জীবনের মূলে
বিশ্বাস নেই, সে জীবনে ছাই! (আড়ালে)।

কবির আন্তরিক রুচি দেহ মানে না, সুস্থতা বোঝে না। কবির *'ঘরে থাকতে অল্প মতি, রোদে রোদে পথে ঘুরে ফেরা/ আকাশে বিচিত্র মেঘ নানা ছন্দে তোলে যে অপেরা/ তাতে লুপ্ত হতে হতে রুক্ষ চুলে বাড়ি ফিরে আসা/ * * * ক্ষিদেয় তৃষ্ণায় টলে কণ্ঠাবধি সমস্ত শরীর/ * * * তা সত্ত্বেও বিনা স্নানে ভালো লাগে মধ্যাহ্ন ভোজন।'* (কলহপর)।

পৃথিবীকে কবি ভালো বেসেছেন। তাই স্থূল দেহচেতনা বাহিরের পৃথিবীর রূপ সৌন্দর্যের সম্মোহের ডাকে কখন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ে। কবি তাই প্রিয়তমাকে বলতে পারেন—*'আমাকে ভুবন দাও আমি দেব সমস্ত অমিয়।'* (কলহপর)।

বিশাল অস্তিত্বের বিশ্বতোমুখ আকর্ষণই তো জিজ্ঞাসুকে পথে নামায়, পথে হাঁটায়—
ঘরে যাকে পেতে চাও সে পালায় পথে পথে ঘুরে।
স্ফটিকে নীলায় যাকে পাও, প্রাণ ভরণের দেনা
তাতেও মেটে না তাই ছুটে চলে আরো আরো দূরে। (পথ)।

কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'নিহিত পাতাল ছায়া'। এই কাব্যগ্রন্থের কবিমানস পৃথিবীর বাস্তব চাক্ষুষ রূপটি চোখ দিয়ে এবং হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করেছেন। সমস্যাসঙ্কুল এই পৃথিবীর জীবনপ্রয়াস উপলব্ধিতে আনে বেদনা, মনকে কাঁদায়, প্রাণকে করে নিঃশেষিত। সত্যদ্রষ্টা কবিচেতনা, কবিপ্রজ্ঞা, এর সত্য রূপটি তুলে ধরেন ভাষায় ভাষায়, তিনি কাঁদেন তাঁর ব্যক্তিচেতনার সমীক্ষায়, কাঁদান সহৃদয়কে। ক্রান্তদর্শন আর সত্যভাষণই যদি কবিচেতনার মৌলস্বরূপ তবে কি-ই বা আর পায় সে এই পৃথিবী থেকে, কি-ই বা কবির মনোধর্মের অভিব্যক্তিতে ধরা দেবে! তার প্রকাশ স্মৃতিচারণায়, তার প্রকাশ আত্ম-সমীক্ষায়, জীবনদর্শণের ব্যক্তিগত প্রকাশনায়, বর্তমানের যুগজীবনের সমীক্ষায়, পারিপার্শ্বিকের বাস্তব রূপের বাণীবদ্ধ রূপায়ণে। এই রকম ভাবনা ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত 'নিহিত পাতাল ছায়া'র বিভিন্ন কবিতায়।

'নিহিত পাতাল ছায়া'র কবিচেতনা সুপরিণত। কবির বিশিষ্ট জীবনদর্শন এবং যুগমানস সমীক্ষা এখানে সুস্পষ্ট, সুচিহ্নিত। উল্লেখযোগ্য কবিতা—মাতাল, পাগল, কিউ, বাস্তু, ভিড়, রাস্তা, চাবুক, সুন্দর, জন্মদিন, দেহ, ছুটি, সজ্ঞ, ফুলবাজার, পোকা, অন্তিম প্রভৃতি।

কলকাতার জনজীবন, ভদ্রতা, সম্ভ্রম, কেমন? কলকাতার বৃহত্তর সংমিশ্রিত জীবনধারা মানুষকে কতটুকু মূল্য দেয়? এ-সব সুন্দরভাবে প্রকাশিত 'নিহিত পাতাল ছায়া'র কয়েকটি কবিতায়। যেমন 'কিউ' কবিতা। সর্বত্র সব প্রয়োজনে আজ 'কিউ' দিতে হয়। 'কিউ' আজ বাস্তবের জনজীবনে জীবন সত্তা—

একটু এগোও একটু এগোও

তখন থেকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি একটু এগোও
হে সর্পিণী, পিচ্ছিলতা একটু নড়ুক চড়ুক।

'বাস্তু' কবিতায় কবি বলছেন, 'আজকাল বনে কোনো মানুষ থাকে না, কলকাতায় থাকে।' সুমার্জিত বেত্রাঘাত কলকাতার অমানুষদের উপর এসে পড়েছে 'বাস্তু'র এই দুটি চরনে। কলকাতার পথেঘাটে অফিসে-বাজারে যানবাহনে সর্বত্র ভিড়। কিন্তু সেই ভিড়ের সঙ্গে ভিড়ের মানুষের তর্জনের আঘাত লাগে এসে সচেতন কবি মনে—

'চোখ নেই? চোখে দেখতে পান না?
সরু হয়ে যান, ছোটো হয়ে যান ... ...' (ভিড়/নিহিত পাতাল ছায়া)।

কবি তখন বাস্তবের এই কষাঘাতে দার্শনিক হয়ে ওঠেন। বলেন—

আরো কতো ছোট হবো ঈশ্বর
ভিড়ের মধ্যে আড়ালে
আমি কি নিত্য আমারো সমান
সদরে, বাজারে, আড়ালে?

শহরে মানুষ ভদ্রতা রক্ষা করে চলে না। ভদ্রতা রক্ষা করে চলা যায়না জনবহুল শহরে। যানবাহনের উত্তরণ অবতরণ, পথ চলা, সবই গায়ের শক্তিতে, গাযে গা লাগিয়ে। তাই জনজীবনের গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে প্রবাহিত না করতে পারলে বিপদ—

রাস্তা কেউ দেবে না, রাস্তা করে নিন।
মশাই দেখি ভীষণ শৌখিন—। (রাস্তা/নিহিত...)।

'চাবুক' কবিতাতেও একই রকমের অভিব্যক্তি—

চাবুক চাবুক সমস্ত দিন চাবুক
যাত্রী উঠুক যাত্রী চলুক নাবুক
ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে চাবুক ... ..

সাম্প্রতিক যুগজীবনের আন্তর বেদনা প্রকাশিত হয়েছে 'নিহিত পাতাল ছায়া'র কয়েকটি বিশিষ্ট কবিতায়। 'মাতাল' কবিতাটিকে এই পর্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা বলা চলে। বর্তমানে যুগজীবন সবদিক থেকেই বিড়ম্বিত। বিড়ম্বিত বিক্ষুব্ধ যুবশক্তি পৃথিবীর সর্বত্র দেখছে অন্যায় অবিচার ব্যভিচার। ফলে সুস্থ সবল মানসিকতা নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তার পক্ষে কঠিন। আবার যুবশক্তি অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে যখন প্রত্যাঘাত করতে সচেষ্ট তখন পৃথিবীর পক্ষে সেই সুকঠোর আঘাত সহ্য করাও সুকঠিন। 'মাতাল' কবিতাটি এই সাম্প্রতিক সত্যকে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে—

আরো একটু মাতাল করে দাও।
নইলে এই বিশ্বসংসার সহজে ও যে সইতে পারবে না।
এখনো যে ও যুবক আছে প্রভু!
এবার তবে প্রৌঢ় করে দাও—

নইলে এই বিশ্বসংসার
সহজে ওকে বইতে পারবে না।

শঙ্খ ঘোষের 'নিহিত পাতাল ছায়া'এবং 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' এই দুটি কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাতেই কবির গভীর জীবনবোধ এবং কবির ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের প্রকাশ রয়েছে। কয়েকটি কবিতায় পূর্ববঙ্গের পূর্বস্মৃতি স্মরণ করেছেন কবি এবং কয়েকটি কবিতায় 'দিনগুলি ও রাতগুলি' কাব্যগ্রন্থের 'কলহপর' কবিতার মতো করে ব্যক্তিগত কথা ব্যক্ত হয়েছে। কবির সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত 'আদিম লতাগুল্মময়' কাব্যগ্রন্থটিতেও 'নিহিত পাতাল ছায়া'র বাস্তব সচেতন পারিপার্শ্বিকের সমীক্ষার ধারাটি অব্যাহত রয়েছে। এ থেকে স্বভাবতই সিদ্ধান্তে আসা চলে, কবি শঙ্খ ঘোষের কবিমানস জগৎ ছাড়া কোনো কল্পনাবিলাস বা আধ্যাত্মিক চেতনায় বিচরণের অবকাশ আজ পর্যন্তও পায় নি। অতি আধুনিক কবি-সম্প্রদায়ের সহজাত প্রবৃত্তি হল একান্ত বাস্তবের মানবজীবন সমীক্ষণ, সমালোচন এবং কাব্যে তারই সহজ দার্শনিক অভিব্যক্তি (নচিকেতা ভরদ্বাজ ও .কবিরুল ইসলাম কিঞ্চিৎ . ব্যতিক্রম)। শঙ্খ ঘোষও এর ব্যতিক্রম নন। তাঁর কবিতাতেও প্রকৃতি বা অলৌকিক অনুভূতির রোমান্টিকতা অনুপস্থিত। যা প্রত্যক্ষ, সদা সচেতন দেহচেতনার বেদনা তা-ই কাজের উপজীব্য। প্রকৃতির বর্ণনা কোথাও থাকলেও তা মানুষের দুঃখ-বেদনা প্রকাশের বাহন হিসাবে মাত্র স্থান পেয়েছে। কোনো স্থলে তা রূপক হিসাবেও ব্যবহার কবা হয়েছে। যেমন 'নিহিত পাতাল ছায়া'র 'ভুল বাজার' কবিতাটি।

স্বাভাবিক সহজাত পরিবেশে পদ্মের যে সৌন্দর্য শোভা, মৃণালবিহীন মূল্যায়নের বাজারে সেই পদ্মের রূপ ভিন্ন প্রকারের। মানুষ (নারী) ও তার স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে যদি উৎখাত হয়ে বাজারের ভোগ্যপণ্যে সামিল হয় তা-হলে সেও তার স্বাভাবিকতা হারায়, সন্দেহ নেই।

'নিহিত পাতাল ছায়া'র প্রথম কবিতা থেকেই কবি জীবনকে নিয়ে দর্শন সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীর অস্তিত্বের বোধ (জগৎসত্তা) কবিমনে দার্শনিক চেতনা জাগিয়েছে—

'আজ তুমি, যে তুমি অপমান আর বর্জনের নিত্য-পাওয়া নিয়ে তবুও মুঠোয় ধরেছ আমাকে, আমাকেই, আমাকে সেই তুমি আমার অন্ধ দুচোখ খুলে দাও, যেন সইতে পারি এই বিপুলা পৃথিবী, এই বিপুলা পৃথিবী, বিপুলা পৃথিবী ... ...' (বিপুলা পৃথিবী)।

'অন্তিম' কবিতায় এই জীবনদর্শনই ভিন্ন বেদনার বাহন—

সফল কীর্তি তো আঙুলে গোনা যায় :
বসতি নির্মাণ বংশ রক্ষা,
তা-ছাড়া ছিল বটে অন্ধকার ঘটে
সিঁদুর চিহ্নের মতন সখ্য!
কিন্তু সখাদের অস্থি ডাক দেয়
মত্ত সময়ের দাঁতের কৌটায়—
প্রবল বহমান দুধারে গর্জিত,

অন্ধ নির্বোধ টান দে বৈঠায়।

'পোকা' আর 'পিঁপড়ে' কবিতায় সামান্যকে অবলম্বনে বিশেষের দ্যোতনা জানিয়েছেন কবি। পোকা আর পিঁপড়ের মতো উপসর্গ বাস্তব জীবনে নিত্যই সব তছনছ করে দিচ্ছে। স্বাভাবিক জীবনের সহজ শান্তি আর নেই। কবি তাই পোকাকে বলেন—

'খা, খা/খুঁড়ে খুঁড়ে সবই অস্থায়ী/খেয়ে যা, খেয়ে যা, খা।' অথবা পিঁপড়েকে বলেন, *'পিঁপড়ে রে, তোর বাসা কোথায়? উড়িয়ে দিয়ে পাখা/সেইখানে যা, নয়/ঝাঁপ দে যমুনায়/নইলে মস্ত আগুন জ্বেলে চতুর্দিকে নাচ—/পাখা উঠুক পাখা উঠুক পাখা উঠুক পাখা উঠুক তোর/পিঁপড়ে রে আর সইতে পারি না।'*

কবি যখন বলেন, *'দিগন্তের ঘরে/আমাদের নাম মুছে যায় চুপচাপ'* (নাম : নিহিত ...) তখন এই বক্তব্যকে জীবন দর্শনই বলতে হয়। কবির এই জীবনদর্শনের প্রকাশ 'নিহিত পাতাল ছায়া'র বহু কবিতাতেই লক্ষ্য করা যাবে বিভিন্নভাবে। কয়েকটি উদাহরণ—

১) *কিছুই জানিনা ঠিক কতদূর যাওয়া যাবে অবসানে*
কত প্রতিহত পথ আমার নিজের আয়নায়। (নিজের আয়নায়)।

২) *স্বভাবই তো পথ হারানো, তাই পথ হারিয়ে ফেলেছি*

* * *

লোকে তো জানে না কিছু। জানুক না, টেনে নিক পাপ
ঝরে যায় নীল স্রোত, গাঢ় থাকে করুণার টান—
যদি বা নিজেরই ছায়া হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বলে :
'তুমি তো সুন্দর নও? বেঁচে আছ কেন পৃথিবীতে?' (সুন্দর/নিহিত ...)

৩) *আমার সুখের মাঠ জলভরা*
আমার দুঃখের ধান ভরে যায়!
এমন বৃষ্টির দিন মনে পড়ে
আমার জন্মের কোনো শেষ নেই। ('বৃষ্টি')।

৪) *এই তো রাত্রি এল। বলো, এখন তোমার কথা বলো। এই পৃথিবী না থাকলে থাকতো শুধু অন্ধকার। কিছুই থাকতো না এই সৌরলোক না থাকলে। কিন্তু কোথায় থাকতো সেই না থাকা, কোন্ পাত্রে? অন্তহীন এই নাস্তি যখন হা-হা করে এগিয়ে আসে চোখের ওপর দুলে উঠে রক্ত—তখন তুমি কথা বলো মহাশূন্যে ... ...*

'নিহিত পাতাল ছায়া'র 'ভাষা' নামক এই কবিতাটির শব্দ-বিন্যাস এবং সুরঝংকার আমাদের মনে করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' গ্রন্থটির কথা।

৫) তোমরা এসেছ, তোমাদের বলি
গৃহে গৃহে টানা আছে সময় বিহিন স্তব্ধ জাল

আমি চাই আরো কিছু নিজস্বতা অজ্ঞাত সময়। ('সময়' : নিহিত ... ...)

শঙ্খ ঘোষ 'কবিতার তুমি' শীর্ষক প্রবন্ধে ('নিঃশব্দের তর্জনী' দ্রষ্টব্য) বলেছেন, *'কবির অন্তর্গত সত্তা অনেকটা সাংখ্যের পুরুষের মতো নিষ্ক্রিয়, স্থির, সাম্যাবস্থায় স্থিত। পরিবর্তমান, চঞ্চল, ভ্রান্ত, ভ্রষ্ট প্রাত্যহিকের তুচ্ছতায় নির্জীবরূপে কাতর, আদর্শ অর্জনের ইচ্ছায় উৎক্ষিপ্ত রূপে ব্যাকুল তার প্রকৃতি চরিত্র মিলে যায় বহিরঙ্গী অস্তিত্বে। এই ভ্রষ্টতা প্রতিমুহূর্তে চলে আসতে চাইছে সঙ্গতির দিকে। কবিতায় আমরা তাই দেখে নিতে চাই, তুমির দিকেই কি কবি এগিয়ে যান অথবা তুমিকেই এগিয়ে যেতে হচ্ছে আমার দিকে, আর এরই থেকে অনেকটা আমরা ধরতে পারি কোন অস্তিত্ব তাঁর কবিতায় তুমি, কে বা তাঁর কবিতার প্রভু বা ঈশ্বর।'*

শঙ্খ ঘোষের 'নিহিত পাতাল ছায়া', 'তুমি তো তেমন গৌরী নও' এবং 'আদিম লতা গুল্মময়' কাব্যগ্রন্থে 'তুমি' রয়েছে, রয়েছে 'প্রভু' বা 'ঈশ্বর'। কবি 'ঈশ্বর' বা 'প্রভু'কে জানিয়েছেন সাম্প্রতিক জীবনযাত্রার বিশৃঙ্খল চিত্ত বেদনার আর্তি, কোথাও স্পষ্ট সোচ্চার ভাবে, কোথাও তির্যক ভঙ্গিতে। 'তুমি'কে কবি সাক্ষী করেছেন গভীর জীবনবোধ ও প্রেম-বেদনার অভিব্যক্তিতে।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন, 'এ সংকলনের সবচেয়ে প্রাচীন লেখা 'কবর' সবচেয়ে নতুন 'ভূমধ্যসাগর'।

'কবর' কবিতায় কবি ধরিত্রীর ধূলিতে লীন হতে চেয়েছেন। যা মানুষের দেহযাত্রার স্বাভাবিক পরিণতি, সেই পরিণতি অপরিণতকালে কবি কামনা করেছেন। কারণ, *'ক্ষীণায়ু এই জীবন আমার ছিল কেবল আগলে রাখা/তোমার কোনো কাজেই লাগেনি তা'— /'* কবির এই অসময়ের কামনার পশ্চাতে রয়েছে আধিভৌতিক বেদনা জনিত চিত্তবিক্ষেপ থেকে নিঃসৃত বেদনা-বাষ্পের আলোড়ন। কবির সেই নীরব বেদনা বাণীময় হয়ে ওঠে—

নিবেই যখন গেলাম আমি, নিবতে দিও হে পৃথিবী
আমার হাড়ে পাহাড় করো জমা—
মাটি আকাশ বাতাস যখন তুলবে দু'হাত,
আমার হাড়ে
অস্ত্র গড়ো, আমায় ক'রো ক্ষমা।

'ভূমধ্যসাগর' কবিতার 'তুমি' একটা সত্ত্বার বা অস্তিত্বের স্বচ্ছ বোধ মাত্র। পশ্চিমযাত্রী কবি ভূমধ্যসাগরে পৌছে পূর্ব পশ্চিমের আন্তর চেতনা, সংস্কৃতি প্রভৃতির সমীক্ষা করেছেন। পূর্বদেশ আজ পশ্চিম দেশের কাছে কোন্ রূপে দেখা দিয়েছে। পশ্চিম সুদীর্ঘ কাল ধরে পূর্বের যে ছবি এঁকেছে সেই ধ্যানের শ্রদ্ধার চিত্র আজ অন্য রূপে প্রতিভাত। তাই পশ্চিম পূর্বের এই রূপ দেখে বলে ওঠে—

তোমার দু'হাতে কেন কলঙ্করেখার উচ্ছলতা
দেখো কত দীন হয়ে গেছ
সমস্ত শরীর জুড়ে বিসর্পিণী অত্যাচার অপব্যয় ছন্নছাড়া ভয়

এ তো নয় যাকে আমি রচনা করেছি স্তব্ধ রাতে ... ...

কবি বলেন—*'পশ্চিম বিলাসী তুমি, আমি পূর্ব দুঃখের প্রহরী।'*

ভূমধ্যসাগরে এসে পূর্ব আর পশ্চিমের যে ভৌগোলিক মিলন তারই সান্নিধ্যে কবি-চেতনায় আরো একটি তৃতীয় জগৎকেও জেগে উঠতে দেখা যায়। এই তৃতীয় জগৎ, তৃতীয় জীবন চেতনাও দর্শন করা যায় এই ভূমধ্যসাগর থেকেই। সেই তৃতীয় জগৎ হল দক্ষিণ দেশ—অরণ্য হিংস্রতা সংকুল আফ্রিকা। পূর্ব পশ্চিমের সম্মিলিত চেতনা জানে এবং বলে—

ঠিক, সব জানি
আমরা অনেকদিন মুখোমুখি বসিনি সহজে

* * *

কিন্তু তবু
ছেড়ে দাও হাত, শুধু দেখো এই নীলাভ তর্জনী
ভূমধ্যসাগর
পূব বা পশ্চিম নয়, দেখো এই দক্ষিণ জগৎ
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জ্বলে ওঠে দূর বন্য অন্তরাল ভেঙে।

কবি ভূমধ্যসাগরে এসে পূর্ব পশ্চিমের যুগ্ম চেতনা নিয়ে দার্শনিকের মতো বলেন—

তুমি আমি কেউ নই, শুধু মুহূর্তের নির্বাপণ
আমাদের ফিরে যেতে হয় বারে বারে
দেশে দেশে ফিরে ফিরে ঘুরে যেতে হয়
পরস্পর অঞ্জলিতে রাখি যত উদ্যত প্রণয়
সে তো শুধু জলাঞ্জলি নয়, তারই বীজে
অসম্ভব তৃতীয় ভুবন এক জেগে ওঠে আমাদের ভেঙে
তাই এইখানে নেমে আমাদের দেখা হল
সমুদ্রের পর্যটক তটে।

কবির সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'আদিম লতা গুল্মময়'। উৎসর্গ করেছেন, 'বন্ধুকে, যে আর বন্ধু নেই'।

উৎসর্গপত্রের এই একটি ছত্রই আদিম লতা গুল্মময়ের কবির চিত্তদর্পণ হয়ে উঠেছে। একদিন যে বন্ধু ছিল সে আর আজ বন্ধু নেই। পৃথিবীতে পথ হারিয়ে পথ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত বন্ধু হারিয়ে তেমন বন্ধু আর পাওয়া যায় না সহজে। বন্ধুত্ব গড়ে উঠে আবার ভেঙে যায়, সেই ভাঙনের আয়োজনও কম নয়, সহজ নয় এবং তারই ফলে সেই ভাঙনের বেদনাও তাই চিরজীবনের বেদনা। এই অন্তর্বেদনার প্রেক্ষাপটেই 'আদিম লতা গুল্মময়' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা বিরচিত।

সমগ্র কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে কবি 'পাথর', 'দল' এবং 'চিতা' এই তিনটি পর্যায়ে ভাগ

করেছেন। তিনটি বিশেষ পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করছে পর্যায়গুলির নাম চিহ্নিত তিনটি বিশেষ কবিতা।

পূর্বেই বলা হয়েছে, 'অতি আধুনিক কবি সম্প্রদায়ের সহজাত কবি প্রবৃত্তি হল একান্ত বাস্তবের মানব জীবন সমীক্ষণ। সমালোচনা এবং কাব্যে তারই সহজ বা দার্শনিক অভিব্যক্তি। শঙ্খ ঘোষও এর ব্যতিক্রম নন।' আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের কবিমানস সম্পর্কেও এই একই কথা।

'আদিম লতা গুল্মময়'-এর প্রথম অর্থাৎ 'পাথর' পর্যায়ে সবচাইতে কম সংখ্যক কবিতা—দশটি মাত্র কবিতা। কবি কবির হৃদয় নিয়ে বোধি নিয়ে দৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীকে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখানেই জীবনের পরম বেদনার চরমতার প্রারম্ভ। বিবেকানন্দ তাঁর 'সখার প্রতি' কবিতায় অন্যভাবে বলেছিলেন, *'হও জড় প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু অন্তরে গরল, সত্যহীন স্বার্থপরায়ণ তবে পাবে এ সংসারে স্থান/যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয়/লৌহ পিণ্ড সহে যে আঘাত মর্মর মূরতি তাকি সয়!'*

কবির হৃদয় মর্মর শুভ্র স্পর্শকাতর। তাই যতই প্রজ্ঞা দৃষ্টির উন্মেষ ঘটে ততই বেদনার পাথর বুকের ওপর চেপে বসে। সেই বেদনার বার্তাই আমরা পেলাম এই 'পাথর' পর্যায়ের কবিতাগুলিতে। এই বেদনার বোধকে আমরা আমাদের পরিশীলিত মানসে নিজেরাই জাগিয়ে তুলি। কবি তাই বলেন—*'পাথর নিজেই আমি দিনে দিনে তুলেছি এ বুকে/আজ আর নামাতে পারি না।'* (পাথর)। এ পথে যে বেদনা, মানসলোককে পরিশীলিত করলে, হৃদয় দিয়ে হৃদয় অনুভব করলে যে বেদনা, তা আমাদের সবারই জানা। কবি তাই বলেন—

> *পথে এসে মনে পড়ে বন্ধু বলেছিল এই সবই।*
> *বলেছিল, যা, কিন্তু সমস্ত লাবণ্য তোর হেলায় হারাবি।*
> *দুপুরের বিষ লেগে নষ্ট হয়ে যাবে দুই চোখ*
> *বিকেলের মতো খুব নিরাশ্বাস হয়ে যাবে মাথা*
> *গায়ের কলঙ্ক যেন নিশীথের হাজার তারায়*
> *দাহ নিয়ে জ্বলে যায়, আর*
> *নিজেই নিজেকে খুঁড়ে দিন দিন পাবি অন্তহীন*
> *অবিমৃষ্য বালি*— (অবিমৃষ্য বালি)।

সাম্প্রতিকের প্রবল ঝঞ্ঝা আমাদের সর্বাঙ্গ বিষাক্ত করে দিয়েছে। এক অঙ্গ বিষাক্ত হলে সেই অঙ্গকে বাদ দিয়ে নির্বিষ হওয়া চলে। কিন্তু আজ আমাদের সর্বাঙ্গ জুড়ে বিষের ধারা বয়ে চলেছে। এ-কথাই কবি বলেন 'বিষ' কবিতায়। বর্তমানের আবর্ত কাউকে তার নিজের শান্ত পরিবেষ্টনীতে নিভৃত শান্তি সুখ ভোগ করতে দেয় না। পুতুলনাচের পুতুল করে সবাইকে বা প্রত্যেককে একটি নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে অভিনয়ের পাত্রপাত্রী করে তোলাই তার একান্ত অভিসন্ধি। 'পুতুলনাচ' কবিতায় কবি এ-কথাই শোনালেন আমাদের—

> *এই কি তবে ঠিক হল যে দশ আঙুলের সুতোয় তুমি*
> *ঝুলিয়ে নেবে আমায়*

আর আমাকে গাইতে হবে হুকুম মতো গান?

* * *

আমার চলা ছিল আমার নিজস্ব, তাই কেউ কখনো
নেয়নি আমায় চিনে
এমন সময় তুমি আবিল হাত বাড়িয়ে যা পাও
স্বাধীনতায় দিচ্ছ গোপন টান—
এই কি তবে ঠিক হল যে আমার মুখেও জানিয়ে দেবে
আদিমতার নগ্ন প্রতিমান?

'দল' পর্যায়ের সবগুলি কবিতাতেই সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক দলাদলির সমুদ্রমন্থনের শেষ পর্যায়ের বিষের জ্বালার প্রকাশ। কেমন করে দলের স্বার্থ রক্ষা পাবে তাই সব রাজনৈতিক দলের পরমার্থ চিন্তা। জনগণ সেখানে, 'রক্তকরবী'র যক্ষরাজের, নাম পরিচয়হীন যন্ত্র মাত্র। তাদের জন্ম জীবন বেদনা মৃত্যু দলের স্বার্থের কাছে কিছু নয়। সবার উপরে দলই সত্য। তাই কবি 'দল' নামক কবিতাটিতে লিখেছেন—

এই খোলা দুপুরে তোমার মুখে ধরেছি বিষের ভাড় তুমি খেয়ে নাও
আমার চোখের সামনে তোমার পতন হোক আদিম লতা গুল্মময়
আমার চারদিকে দল মাথার ভিতরে বা ধমনিতে বিঁধে যায় ... ...

দলের অনুশাসন নির্মমভাবে জানায়—

এখন আমার তুমি নষ্ট হও তুমি ধ্বংস হও তুমি বিষ খাও
আমি যা বলি আজ হও তাই

* * *

ধ্বংস হও তুমি চেতনাহীন হও আমার হাতে তোলা বিষ খাও

'রাজনীতি' কবিতায় রাজনীতির স্বরূপ মনে করিয়ে দেন কবি। সে স্বরূপ নির্মম স্বার্থান্বেষী, স্বার্থসিদ্ধির মূঢ় প্রবেগে সে অন্ধ—'দিনের রাতের সহচর' যে তারও মুখে সে বিষ তুলে ধরে, জানিয়ে দেয়, তার চারপাশে চর। আবার চারপাশের মানুষকে সেই সহচরেরই বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে এবং একসময় সেই রাজনীতির চাতুরী পরিতৃপ্তি পায়, যখন দেখে—

ভাঙা বাড়ি লক্কড় রাবিশ—
তারই মাঝখানে পড়ে আছে
বিষ দিয়ে তুলে নেওয়া বিষ!

'ক্রমাগত' কবিতার বক্তব্য আরো স্পষ্ট, আধুনির রাজনীতির রূপ ও স্বরূপ স্পষ্ট কথায় পরিব্যক্ত—

এইভাবে হতে থাকে ক্রমাগত/কেউ মারে কেউ মার খায়/ভিতরে সবাই খুব স্বাভাবিক

কথা বলে/জ্ঞান দান করে/এই দিকে ওই দিকে তিন চার পাঁচ দিকে/টেনে নেয় গোপন আখড়ায়/কিছু বা গলির কোণে কিছু অ্যাসফল্ট রাজপথে/সোনার ছেলেরা ছারখার/ অল্প দু চারজন বাকি থাকে যারা/তেল দেয় নিজের চরকায়/মাঝে মাঝে খড়খড়ি তুলে দেখে নেয়/বিপ্লব এসেছে কতো দূর।

আজকালকার যুক্তি তর্ক ব্যবহার সবই আসুরিক, গায়ের জোরই বড়ো জোর। 'যুক্তি' কবিতায় সহজ একটি কাহিনীর আমেজে সে কথা বলা হয়েছে।

আজকালকার শ্লোগান, 'মারের জবাব মার'। এই যে শব্দের ঝংকার দিয়ে শ্লোগান রচিত হয় তার পরিণতির কথা রাজনীতি ভাবে না। মানুষের জীবন নিয়ে নিষ্ঠুর খেলাই রাজনীতি। রাজনীতির অর্থই যেন কোনো নীতি না-মানা বর্বর পদযাত্রা। কবি 'শ্লোগান' কবিতায় এমনি এক ভাব মূর্ত করে তুলেছেন—*বুকের ভিতর অন্ধকারে চমকে উঠে হাড়/মারের জবাব মার/বাপের চোখে ঘুম ছিল না ঘুম ছিল না মা'র/মারের জবাব মার।*

'নিহিত পাতাল ছায়া'-র কয়েকটি কবিতায় যেমন কলকাতার জনজীবনের মতিগতি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রকাশ করেছেন 'আদিম লতাগুল্মময়'-এর 'কলকাতা', 'ছাতা' প্রভৃতি কবিতায়। 'কলকাতা' কবিতায় কবি সরাসরি পূর্ববঙ্গীয় কথ্যরীতির ভাষাকে কবিতার বাহন করেছেন—বাপজান হে/কইলকাত্তায় গিয়া দেখি সক্কলেই সব জানে/আমিই কিছু জানি না/আমারে কেউ পুছত না/কইলকাতার পথে ঘাটে অন্য সবাই দুষ্ট বটে/নিজে তো কেউ দুষ্ট না।

আজকের দিনে 'বোকা' কে? যে কোনো না কোনো দলে যোগ দেয়নি, নিজে নিরপেক্ষ এবং অপরকেও নিরপেক্ষ থাকতে বলে। এ-মতবাদ আজ অচল। এমন মানুষের এরকম মতবাদ '*শুনে ওরা বলে, 'এটা কেরে/তলে তলে চর হয়ে ফেরে?'/এমনকি সেদিনের খোকা/আঙুল নাচিয়ে বলে বোকা!'* (বোকা : আদিম ...)।

'দুই বাঙ্গলা', 'একা' এবং 'দেশহীন' কবিতায় কবি পূর্ববঙ্গের স্মৃতিচারণ করেছেন এবং সমকালীন রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কবিমানসের প্রতিক্রিয়াও কবিতাগুলির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

'আদিম লতাগুল্মময়'-এর শেষ পর্যায় 'চিতা'। যখন জীবন অমৃতের, হৃদয়হীনতার এবং সব রকমের হীনমন্যতার গ্লানি পারিপার্শ্বিকের পরিমণ্ডলী থেকে ধীরে ধীরে জমা হয় এসে, তখন যে দহন জ্বালায় জ্বলল তা চিতার দাহন জ্বালার সামিল। তাই এই পর্যায়ের প্রতিনিধি কবিতা 'চিতা'র প্রথম ক'টি চরনেই এরকম প্রকাশ—

> *আজ সকাল থেকে কেউ আমাকে সত্যি কথা বলে নি*
> *কেউ না*
> *চিতা, জ্বলে ওঠো।*

বর্তমান সভ্যতা মানুষের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। মানুষের স্বাধীন চিন্তা স্বকীয় গতিধর্মিতা

অবরুদ্ধ করে প্রয়োজনের পথে চালাতে শক্তি প্রয়োগ করেছে। এটাই 'মূল ভাষা' কবিতার বেদনা—

যে যেভাবে আছে/সে সেভাবে নেই/থাকার মানেই যেন চুপিসাড়ে থাকা/সাদা চাদরে ঢাকা শব।/ * * আছে বটে দ্রুত বহু যান/আমি যদি ক্রোশ ক্রোশ হেঁটে যাই, বেশ—/তুমি কেন কেড়ে নিতে চাও/যখন যেভাবে আছি সে ভাবে থাকার/আমার নিজস্ব অধিকার?*

'চিতা' পর্যায়ের ভাবনা 'অঞ্জলি' এবং 'রেড রোড' কবিতায় দার্শনিক চিন্তা বিকাশের সুযোগ পেয়েছে। একদিন একা হতে হয়, প্রজ্ঞা দৃষ্টিতে ধরা পড়ে বাইরের সব সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী, আসলে মানুষ একা একাকী। আর তার এই নিঃসঙ্গ সত্তাটাকেই একদিন অঞ্জলি করে উৎসর্গ করে দিতে হবে—

আর, তুমি একা/এতো ছোট দুটি হাত স্তব্ধ করে ধরেছ করোটি/মহাশ্মশানের শূন্য তলে—/জানো না কখন দেবে কাকে দেবে কতো দূরে দেবে!

'রেড রোড' শেষ কবিতা। এ-কবিতার বেদনা আমাদের চিরদিনের অহৈতুকী বেদনা। পৃথিবীর এই জন্ম জীবন ভাবনা চিন্তা আঘাত প্রতিঘাত আনন্দ শোক সব মিলিয়ে জীবন সমুদ্রের যে মন্থন সেই মন্থনেই ওঠে অশ্রুত উৎস। আমাদের বেদনা কেন, অশ্রু কেন? আমরা ক্ষণে ক্ষণে উদাসী হয়ে যাই কেন? এ-সব প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। সেই কালিদাসের কথাই মনে পড়ে, 'তৎ চেতসা স্মরতি নুনম্ অবোধপূর্বং ভাবস্থিরানি জননান্তর সৌহৃদানি।' 'খোলা আকাশের নীচে' ময়দানে শায়িত দেহ কবি বিষাদের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠেন—

আমাকে ভুল বুঝো না বলে দু'হাত ছড়িয়ে দিতে টের পাই
চোখের ঢালু বেয়ে নম্র ঘামের মতো ক্ষীণজলরেখা

* * *

কপালে হালকা পালক ছুঁয়ে বলে যায় রাত্রি;
এই মাটি তোমার শরীর, একে স্পর্শ করো, জানো—
আর অমনি দশ দিগন্ত ভেসে যায় উপচে পড়ে দুচোখ
স্ফুরিত আনন্দে নাকি দিশাহীন জলে ... ...

শঙ্খ ঘোষের কবিতা পাঠ করলে, কাব্যগ্রন্থগুলো একবার পরিক্রমা করলে, নিজের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে এবং মনে হয় কত কঠিন বেদনায় কাব্য-সত্যের প্রকাশ। পাঠকও কবির সঙ্গে সহজে বলে উঠতে পারেন—

'দশ দিগন্ত ভেসে যায় উপচে পড়ে দুচোখ
স্ফুরিত আনন্দে নাকি দিশাহীন জলে ... ...'

প্রবন্ধ

বাংলা কবিতায় স্থানিক চিত্র •

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

কবিতার অণুতেই সাহিত্যের প্রথম বীজোৎপাদন। শুধু বাংলা সাহিত্যের কেন, ভারতীয় সাহিত্যেরই প্রাণস্ফূর্তি বাল্মীকির কাব্যিক অনুভূতি থেকে। বাংলা সাহিত্যে বোধহয় এমন কোনো লেখক নেই যিনি কোনো না কোনো সময় কবিতা লেখেন নি। তাই হাজার হাজার কাব্যলহরীতে এখন বাংলা সাহিত্য মুখরিত হয়ে আছে। অথচ আশ্চর্য সৃষ্টির আদিতে যার জন্ম আজ শত শত বছর পেরিয়েও যে 'আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ি' সেজে বসে নেই। বরং চিরযৌবনা উর্বশী মেনকার মতো তার রঙের বাহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। এখানেই কবিতার অমরতা, প্রাণের সার্থকতা। উদ্দেশ্য সেই একই, স্রষ্টা সৃষ্টি করে আনন্দ পান আর ভোক্তা রসাস্বাদন করেন হৃদয়ের কানায় কানায়। স্রষ্টার সৃষ্টি ভোক্তার মনে আলোড়ন তুললেই অনুভূতিমণ্ডল সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। তাই তিল তিল সৌন্দর্য দিয়ে উর্বশীর সৃষ্টির মতো কবির দৃষ্টিও ছড়িয়ে থাকে অবিরাম বিশ্ব প্রবাহের মাঝে। বিশ্বপ্রবাহ আবর্তিত হয় তার সৃষ্টির মাধ্যমে। জীবজগত থেকে অসীম আকাশের অগণিত নক্ষত্রপুঞ্জ পর্যন্তই তার এই সৃষ্টিধারা যার সঙ্গে মানুষেরও একটা প্রাণগত আত্মীয়তা রয়েছে। (কারণ বৃহত্তর অর্থে মানুষও এই সৃষ্টিধারারই একটি বিন্দু)। মানুষের সৃষ্টিতেও তাই তার আত্মার আত্মীয়তা জায়গা নিয়ে এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে অমর করে রাখে যেমন দর্পণের কাছে সূর্যদেব চিরদিনের জন্য বাধা থাকেন।

কবিতার উদ্দেশ্য অপ্রয়োজনীয় আনন্দ সৃষ্টি, ব্যষ্টির হৃদয়ানুভূতি সমষ্টিতে স্থানান্তরণ। কাজটা যেন আধুনিক টেলিভিশন যন্ত্রের মত। দুস্তর মানস-ব্যবধান অতিক্রম করে একজনের মনের সংবাদে আরেকজনের মনে চিত্রপট জাগিয়ে তোলা। তাই বৈজ্ঞানিক নিরাশক্তি আর কাব্যিক কোমলতা নিয়ে আধুনিক কবিতার অগ্রগতি। আবেগের আতিশয্যে রোমান্টিকতা, বিপ্লবী ঘোষকতা অথবা নীতিকথার বিশুদ্ধতা বাদ দিয়ে কবিতা এখন রকেটের গতিতে এগিয়ে চলছে যার গতিপথের সর্বত্রই আবিষ্কারের বিস্ময়। কবির হৃদয় আর পাঠকের হৃদয়ের মাঝখানে যে ব্যবধান এখানেই অংশগ্রহণ করে শব্দ, চিত্র, সাংকেতিকতা। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এরাই কবির হৃদয়ের বার্তা পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দেয় এবং অনুভূতির উদ্বোধনে সার্বিক সহায়তা করে। সুতরাং ভাবপ্রবাহে চিত্রের একটা নির্দিষ্ট আবেদন আছে একথা বলতেই হয়। কখনও কখনও স্থানিক বৈশিষ্ট্য কবির মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করে রাখে যে তার

সৃষ্টির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো বার বার ভাসতে ভাসতে একটা স্থানীয় প্রেক্ষাপটের মাধ্যমে ভাবের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখে। এস্থলে ভাবাতিরিক্ত স্থানীয় চিত্রটি পাঠকের উপরি পাওনা। মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলী অথবা মঙ্গলকাব্যের উদ্ধৃতি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' নামক কবিতার কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে—

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা ধান-কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরসা—
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

দার্শনিক চিন্তা প্রবাহে এই স্থানিক চিত্র একদিনে যেমন ভাব-প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রেখেছে অন্যদিকে তেমনি বর্ষণমুখর নদী-ভরা পল্লী-জীবনের একটা প্রতিমূর্তি পাঠকের মানসপটে উজ্জীবিত করে রেখেছে। অতি সাম্প্রতিক উদ্ধৃতি থেকে বক্তব্য অনুরূপভাবে পরিস্ফুট করা যায়—

পাহাড়ের উঁচু চূড়া থেকে
দু-দিকে নেমেছে ঢালু পথ।
গড়িয়ে গড়িয়ে দূরে
একটি মিশেছে গিয়ে
লোকালয়ে উৎসব মুখর,[১]
অন্যটি অতল শূন্যতায়। (দুঃস্বপ্ন : অরুণ কুমার সরকার · শারদীয় দেশ ১৩৮০ সাল)।

অথবা

অন্ধকার শীতের রাত
কপি-পাতায় শিশির
আকাশে নক্ষত্র;
মা রামায়ণ পড়ছেন, তুষ মুড়ি দিয়ে
—পুরানো খোয়াব।[২]

প্রথমটিতে ছোট্ট একটি পাহাড়ী দৃশ্য, দ্বিতীয়টিতে নিঝুম শীতের রাতের একটুকরো চিহ্ন পাঠকের মানসপটে জ্বল জ্বল করে উঠেছে।

মানুষকে যেমন তার পরিবেশ ছাড়া ভাবা যায় না তার সৃষ্টিতেও তেমনি পরিবেশ বিরহিত হয় না। এ পরিবেশ আবার কতটা প্রকৃতিগত কতটা মনুষ্যসৃষ্ট সমাজগত। আদি মুহূর্ত থেকে ব্যক্তি ও পরিবেশের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায়ই মানুষের মানসলীলা সংঘটিত হয়। তাই প্রকৃতির কোনো বিশেষ বিশেষ অবস্থা অথবা সমাজের কোনো বিশেষ বিশেষ ঘটনা নিজের অজান্তেই

১। দুঃস্বপ্ন—অরুণ কুমার সরকার—শারদীয় দেশ ১৩৮০ সাল
২। শিশুকের জন্যে : হরপ্রসাদ মিত্র : শারদীয় দেশ ১৩৮০ সাল

ব্যক্তিমানসে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে। উক্ত অবস্থা অথবা ঘটনার উপস্থাপনে অনুষঙ্গী অনুভূতিগুলোও সুপ্ত মৃগশিশুর শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় উন্মুখ হয়ে ওঠে। বিমূর্ত জিনিসের মূর্তকরণে কবিরা তাই ভাবানুষঙ্গী প্রাকৃতিক অবস্থা সামাজিক ঘটনার সুযোগ নিয়ে থাকেন। শরৎকালীন শেফালি ফুলের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের যে কোমল অনুভূতির সংযোগ আছে অথবা নিশীথকালীন পেঁচকের চিৎকারে হৃদয়ের যে ভয়ঙ্করতা জাগে এটাকে কাব্যে ব্যবহার করে সহজেই অনুভূতির সংক্রমণ করা যেতে পারে। কবির মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ স্থান, কাল, পাত্র, তার সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িয়ে থাকে তাই তার সৃষ্টির মধ্যেও এরাই বার বার উদ্ভাসিত হয়ে অনুরূপ একটা স্থান-কাল-পাত্রের অবিচ্ছিন্ন চিত্র পাঠকমনেও উপস্থাপিত করে। পল্লী কবি জসীমউদ্দিন যখন বলেন—

শরতের শেষে কাঁচা ধানছড়া
ঢলিয়া এ ওর গলে
ফিস ফিস করে কত কথা যেন
কহিছে বায়ুর দোলে।
হেমন্ত তার সোনার ঝাঁপির
ঢাকনা খুলিয়া কবে,
মুঠি মুঠি আজ হলুদের গুঁড়া
ছড়ায় মাঠের পরে।[৩]

তখন পাঠক-চিত্তও সোনার কার্পেট বিছানো হেমন্তকালীন পল্লী বাংলার মাঠে মাঠে ঘুরতে থাকে।

যেহেতু কবির মনোগত গঠন বিভিন্ন প্রকৃতির তাই সৃষ্টি রহস্যের প্রতি তার ব্যক্তিক আত্মীয়তাও বিভিন্নধর্মী। এ আত্মীয়তা কখনও প্রকৃতি-কেন্দ্রিক, কখনও সমাজকেন্দ্রিক আবার কখনও বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এই অর্থেই কবিদের ভেতর কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ—পল্লী-কবি, বিপ্লবী কবি, নাগরিক-কবি প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, পল্লী-কবির ভেতর পল্লীর স্থানিক-চিত্র যতটুকু পাওয়া যায়, বিপ্লবী সমাজদরদী কবির ভেতর সে পরিমাণেই বিপ্লব ও সমাজ চিত্রের অনুলেখ থাকে। বাংলার জনপ্রিয় কবি সুকান্তের 'রাণার' কবিতার কথাই ধরা যাক : *রাণার রাণার/কত জানা অজানার বোঝা আজ তার কাঁধে/রাণার চলেছে খবরের বোঝা হাতে।* ভাবের কথা বাদ দিয়েও আমাদের অতি পরিচিত রাণারের মূর্তিটি কি এখানে জীবন্ত হয়ে ওঠে না? সমাজ-সচেতন কবির দৃষ্টিভঙ্গী সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আবর্তিত হয় তাই সাম্প্রতিক সৃষ্টির মধ্যে আমরা সম্প্রতিক সমস্যা, যেমন, বেকারী, মানসিক ক্ষয়িষ্ণুতা, নগরজীবনের ব্যর্থতা প্রভৃতির নিখুঁত চিত্র পেয়ে থাকি। শিল্পী যেমন মূর্তির পেছনে চালি দিয়ে তার মূর্তিকে অধিকতর পরিস্ফুট করেন কবিও তেমনি অনেক সময় সচেতনভাবেই ভাবমূর্তির

৩। হেমন্ত : জসীম উদ্দিন। ৪।

পেছনে চিত্রচালির সংযোগে বক্তব্য গভীরতর করেন। তবে কোনো কোনো সময় স্থান-কাল-পাত্রের মাধুর্য্য ব্যতিরেকে কবিতার অন্য কোনো উদ্দিষ্টার্থ থাকে না অর্থাৎ এরাই কেন্দ্রিক আত্ম-বিন্দু হয়ে উপস্থাপিত হয়। বাংলার ঋতু, পাহাড়-নদ-নদী নিয়ে এরূপ অসংখ্য সৃষ্টি এখনও সাহিত্যে সঞ্জীবিত আছে। আবার কবির অজান্তেও তার প্রিয় বস্তুগুলো ভাবের চারিদিকে ভীড় করে একটা ভাসা ভাসা স্থানিক চিত্রের সৃষ্টি করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে কোনো নিরবচ্ছিন্ন নিখুঁত চিত্র ফুটে না উঠলেও অনেকটা রেখা চিত্রের মত স্থানিক আভাস আনে।

আধুনিক কবিতার গতি হচ্ছে প্রতীকধর্মী সাংকেতিকতার দিকে। পুরোপুরি একটা স্থানিক চিত্র প্রতীকার্থে ব্যবহৃত হলে উদ্দিষ্টার্থ সহজগম্য হয় কারণ পরিচিত পরিবেশ সহজেই ভাবানুষঙ্গ সৃষ্টি করে। সুরারসিক মাত্রেই সুরাপানে আনন্দ পান, বিশেষ করে এ সুরা যদি নিজেরই পাত্রে উপভোগ করা যায়। পরিচিত গাছপালা, বাড়িঘর, চলমান জীবনের পরিচিত ঘটনার মাধ্যমেই যদি কাব্যিক রসাস্বাদন অনুভব করা যায় তবে তার চেয়ে আনন্দের আর কি হইতে পারে। তাই সৃষ্টিশীল কবি সাহিত্যিকরা যুগান্তকারী পরিচিত ঘটনার সুযোগ নিয়ে থাকেন। এরূপ ঘটনা চিত্র বৃহত্তর জনমানসকে সহজেই দ্রবীভূত করতে পারে। কিন্তু আধুনিক সংক্ষিপ্ততার যুগে বিস্তৃত স্থানিক চিত্রের প্রতীকতার পরিবর্তে সাংকেতিক শব্দ দিয়ে ভাবকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়। ছোট শব্দ দিয়ে যেখানে অভীষ্টার্থের আনাগোনা সাবলীল হয় না শুধুমাত্র সেখানেই টুকরো টুকরো চিত্রের অবতারণা। এই শব্দগুলো আণ্ডার-লাইনের মত ভাবের বিশেষ বিশেষ অংশে পরিস্ফুট থেকে অনুভূতির কেন্দ্রিকরণে সহায়তা করে যেমন মূর্তির পশ্চাদপট রচনা না করে মূর্তির গায়েই ছাপ ছাপ স্থানিক রং লাগিয়ে দেয়া যায়। উপরোক্ত ১ নং এবং ২ নং উদ্ধৃতি থেকে আমরা অনুরূপ দুটি চিত্রেরই আভাস পেয়েছি। আধুনিক কবিতার মাঝেও অনুরূপভাবে কলিকাতার অসংখ্য টুকরো টুকরো চিত্র, তার জনজীবনের সমস্যা, অন্তরের অসহায়তা প্রভৃতির পরিচয় জড়িয়ে আছে। অবশ্য কবি যেখানে নিঃসঙ্গ বিজনবিহারী তার কথা আলাদা।

বৈজ্ঞানিক ক্রমোন্নতির যুগে মানুষ আজ *'হতাশ হয়ে যেদিকে চাহি/কোথাও কোনো উপায় নাহি/মানুষরূপে দাঁড়ায় বিভীষিকা।'*[৪] ব্যক্তিস্বার্থ তাকে *'লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মত।'* তার সামনে আজ একদিকে গ্রহ-গ্রহান্তরের বিস্ময় অন্যদিকে ধ্রুবতারাহীন অন্ধকার। চোখের সামনে রণদেবের দামামা, ক্রন্দসী কাঁদছে বোমার ধোঁয়ায় আর ট্যাঙ্কের গর্জনে, সভ্যতা পরশুরামের মত মাতৃহত্যায় নিমগ্ন। তাই মানসলোকে অহরহ প্রশ্ন—*'এ জীবন না মৃত্যু?'* অস্তিত্বের সংগ্রামে উন্মুক্ত প্রান্তর এখন মরু। কাব্যিক মানসলোকের ব্যাপ্তিও তাই এখন সৌন্দর্যের পাদস্পর্শ থেকে প্রবৃত্তির দাবদাহ পর্যন্ত বিস্তৃত। কবি মানসের এই জটিল গতি সার্বিক মানব সংকটের সঙ্গে এমন একাকার হয়ে গেছে যে তার হুবহু পশ্চানুসরণ প্রায় অসম্ভব।

৪। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য : অনিল বিশ্বাস

জোনাকি

বিশেষ পুজো সংখ্যা ১৯৭৪

জোনাকি

কবিতা সংকলন—১৪

সম্পাদক—পীযূষ রাউত

প্রকাশক—সৈকত রাউত

ঠিকানা—প্রযত্নে/গুপ্ত ব্রাদার্স/সিনেমাহল রোড,
কৈলাসহর। উত্তর ত্রিপুরা।

প্রকাশ স্থান—গোবিন্দপুর, কৈলাসহর, উত্তর ত্রিপুরা।

মুদ্রণে—ত্রিপুর প্রিণ্টার্স, কৈলাসহর।

মূল্য—এক টাকা।

সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত কথা

অক্টোবরের ১৪ই, সন্ধ্যা অবধি ঠিক ছিল না 'জোনাকি' শরৎপর্যায় বেরুবে কি না। তারপর হঠাৎই শিল্প দপ্তরের বিজ্ঞাপন, সন্ধ্যার পর, দু'হাত ছুঁয়ে সম্পাদকের হাতে এলে সম্পাদক স্থির নিশ্চিত হলেন—জোনাকি বেরুবে। সংগ্রহে লেখালেখি আগে থেকেই ছিল। ফলে অসুবিধা কিছুই হলো না।

তবে বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে সরকারের উত্তরোত্তর বেড়ে চলা কার্পণ্যে, কৈলাসহর কোনো উল্লেখ্য ব্যবসায়ক্ষেত্র না হওয়াতে এবং কাগজের মূল্য লিটল ম্যাগাজিনের প্রকাশকের ক্ষমতা বহির্ভূত হয়ে যাওয়াতে অদূর ভবিষ্যতে 'জোনাকি' আর বেরুবে কি না এই মুহূর্তে মোটেই বলা যাচ্ছে না। একজন সম্পাদক হিসেবে চাই না, এ সংখ্যাই শেষ সংখ্যা হোক্, যদি হয়ে যায় আমার এবং কিছু সু-সংস্কৃত পাঠকের দুঃখের অবধি থাকবে না। একজন নিম্নবিত্ত স্কুল-টিচারের স্বল্প আয়ে গাঁটের পয়সা খর্চ করে কাগজ বার করা কোনোক্রমেই সম্ভব না এবং যে জিনিসটা আসল মূলধন সেই বেপরোয়া বয়সতো কবেই অতিক্রান্ত। সুতরাং ভবিষ্যৎ জোনাকি প্রকাশ বিষয়ে আশা—উৎসাহের কিছুটা স্বপ্ন এবং সম্ভাব্য না পারার দুঃখ নিয়ে বক্তব্য শেষ করছি—পুজোর ছুটিতে প্রচুর কবিতা পড়ুন, একজন পাঠককে একমাত্র কবিতাই দিতে পারে সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং নিষ্পাপ আনন্দ।

শুভম্ ইতি—

১৫ই অক্টোবর, ১৯৭৪ইং।

—কৃতজ্ঞতা-স্বীকার—

সর্বশ্রী নিরঞ্জন গুপ্ত, অঞ্জন পাল, শংকর দেব, বিমল দেব, প্রান্তিক রাউত, স্থানীয় বিজ্ঞাপনদাতা এবং ত্রিপুরা সরকারের শিল্প দপ্তর।

প্রদীপ বিকাশ রায়। একটি চিঠি

প্রিয় পীযূষ,

জোনাকির জন্য কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতে বলেছিস আমাকে! আমি কবিতার কতটুকু জানি ? জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মে, এমনকি আমরা যখন পৃথিবীর যাবতীয় ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের সঙ্গে জড়ির রাশিয়া আর আমেরিকা, যাঁদের একহাতে মারণাস্ত্র, আরেক হাতে শান্তির বুলি ... ... শুধুমাত্র রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কালক্ষয়ী প্রবাহে এই পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক যুদ্ধ করে, প্রাণ দিচ্ছে ... ... সেই সব খবর শুনে যাঁদের প্রাণ কাঁদে, যাঁদের বুকের ভেতর বেজে ওঠে করুণ বেহালা, তাঁদের মুখ দেখতে চাই কবিতায় এবং দিগদিগন্তে। মানুষের করুণ পরিণতির আভাস পেয়ে যাঁরা নিজের ভেতর আঁৎকে উঠে শুনতে পান মানুষের দুঃখ দুর্দশার কাহিনী কবিতা লেখার অধিকার শুধু তাঁদেরই কিন্তু সেরকম কবি ক'জন আছেন?

আসলে পীযূষ, আমি কবিতায় খুব বেশী গভীরভাবে ডুবতে পারি না কিংবা বেশীক্ষণ ডুবে থাকতে পারি না। কবিতার উপর কোনো মোহ আমার মধ্যে গড়ে উঠতে পারছে না। কবিতাকে আমি আমার কাজে লাগাই মাত্র। কবিতার মাধ্যমে মানুষের সেবা করাই কবিদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ... ... একথা আমি যেমন বিশ্বাস করি মণিভূষণ ভট্টাচার্যেরও এই একই উদ্দেশ্য বলে আমাকে জানিয়েছেন। আমাদের শুধু জানতে হবে কি করে মানুষের সেবা করতে হয় কবিতায়। শুধুমাত্র মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও হতাশার ফিরিস্তি দিয়ে কবিতা লিখলে মানুষের অন্তর কতটুকু ভরে আমি জানি না। অসংখ্য লেখা হচ্ছে পৃথিবীর কাগজে, লিখতে লিখতে পৃথিবীর কাগজ কমে যায়। পত্রিকাওয়ালাদের চীৎকার শোনা যায়, 'কাগজ দাও, আরও কাগজ দাও'। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বিভীষিকাময় যুদ্ধের ফিরিস্তি, আন্তর্জাতিক শান্তিচুক্তি, গরীবী হটাও বুলি। আর পরিকল্পনার ফিরিস্তি লেখতে লেখতে কাগজের টান পড়ে পত্রিকার অফিসে, সমস্যার আগুন দিন দিন বাড়ে। দুঃখ আর অভাবে মানুষের পেট

জ্বলে বুক জ্বলে, এক একটা বুলি ছেড়ে সেই আগুন দ্বিগুণ করে দেশের দরদী নেতারা।

আসলে মানুষ চায় আনন্দ। কিন্তু আমরা সেই আনন্দের গোপন সিঁড়ির ঠিকানা না জেনে উল্টোপাল্টা পথে ঘুরে বেঘোরে মরছি। তাই শুধু দুঃখের প্রলেপে কবিতাকে সাজালেই মানুষের দুঃখ ঘোচে না, মানুষকে দিতে পারে না প্রার্থিত আনন্দ। কিন্তু আজকে যাঁরা কবিতা লিখছেন তাদের মধ্যে ক'জন আনন্দের সন্ধান জেনেছেন?

একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠে আজকের কবিরা কবিতা লেখেন কেন? তোকেই যদি আমি প্রশ্ন করি, 'পীযূষ, তুই কবিতা লিখিস্ কেন?' তোর উত্তর কি হবে আমি জানি না, তবে আমার উত্তর এই রকম : কবিতায় আমি প্রকৃত শান্তির অন্বেষণ করি কিংবা কবিতাকে আমি দেখি আমার অন্বেষণের যথার্থ সাক্ষী স্বরূপ। কবিতা শুধু আমাকে অন্বেষণ করার প্রেরণা দেয় আমার নিভৃত চেতনায়।

আসলে কবিতার নরম আলোয় আমরা দেখতে চাই নিজেদের বিচিত্র মুখ। কবিতায় আমাদের কেবলই মুখ চাওয়া-চাওয়ি। যেন পরস্পরকে জিজ্ঞেস করা, 'কোন দিকে পথ?' তখন কুম্ভমেলা আর কবিতা একাকার হয়ে যায়। কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ কুম্ভমেলায় ভিড় করে, সমুদ্র সৈকতে কেন মানুষ ঝিনুক খোঁজে, কেন যুদ্ধ করে মরে লক্ষ লক্ষ মানুষ, সর্বহারা মানুষের দল কেন পথে পথে ঘোরে, কেন ... ...। এইসব প্রশ্নের উত্তর যে দিতে পারে তাকেই আমি খুঁজে বেড়াই পাগল হয়ে।

আমাদে জীবন-ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছেই, পথের যেন আর শেষ নেই, রূপের যেন আর শেষ নেই এই পৃথিবীর। আমরা এক জীবনে কতটুকু পথ যেতে পারি? কে-ই বা বলতে পারে আমাদের সহজ পথের ঠিকানা?

পীযূষ, তোকে আমার অনেক জরুরী কথা আছে বলার। আমার মধ্যে আমি একটা দারুণ পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। মনে আমি বিশ্বাস পেয়েছি ফিরে, যেন সন্ধান পেয়েছি প্রকৃত সত্যের। দারুণ একটা মুডের মধ্য দিয়ে আমার সময় দ্রুতগতিতে কেটে যাচ্ছে। তাই কবিতা বিষয়ে এখনো কোনো প্রবন্ধ লেখার ফুরসৎ পাইনি। প্রবন্ধ লেখা সম্ভব না হলে একটা কবিতাই পাঠাব এই সংখ্যার জন্য।

বুকের ভেতর থেকে জ্বলন্ত ধূপকাঠির গন্ধ না পেলে কবিতা লিখতে পারি না আজকাল। শেষ পর্যন্ত কবিতা পাঠাতে না পারলে এই চিঠিটাই ছাপিয়ে দিতে পারিস্। (অবশ্য তুই যদি ভাল মনে করিস্)। আমি কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠিকে সার্বজনীন করে প্রকাশ করার পক্ষপাতী। অবশ্য যে চিঠিতে জীবনের সৌরভ পাওয়া যায়।

বিজিতের 'সাহিত্য' পেয়েছি। ভালো হয়েছে। উত্তর দিস্।

বিশালগড়
১-১১-৭৩

তোদের—
প্রদীপ বিকাশ

দু'টি কবিতা : সমরজিৎ সিংহ : ভালোবাসার তুকতাক

আজ ভোরবেলা কী বিষম দুঃখ এসে
আমাকে ভালোবাসার মন্ত্র বলে দিলো, আমি জানি না ভালোবাসার
তুকতাক হিম যুগ আগে এরকম ছিলো কি না
অনেক বছর আগে কোনো এক সুনীল গাঙ্গুলী
কবিতার পিঠে ছুরি মেরে বলেছিলো,
'ভালোবাসা ছিলো ভালোবাসবার আগে'
আমি জানি না চিঠির ভাষা কী রকম হলে সেই কিশোরীর
ভালোবাসা পার্কের ছায়ায় এক যুগ শব্দহীন বেঁচে থাকে।
আমি জানি না কেন যে
শরীরের উপমা মন্দির হয়!
আমি জানি না, ভালোবাসার কী রকম তুকতাকে মধ্যরাতে
চুরি হয় কুমারী মেয়ের
সূর্য্যমুখী প্রেম।

আজ কী বিষম দুঃখ এসে
আমাকে শিখিয়ে দিলো, 'বিলি বিলি খাণ্ডা গুলু
বুদ্ চাক ডবাং ডুলু
হুড়মুড় তা খিন না উসুখুসু সাকিনা খিনা'
আমি জানি না, ভালোবাসার তুকতাক
হিমযুগ আগে এরকম ছিলো কি না।

তোমাদের লাল ঘরবাড়ী

(শিখা পালচৌধুরী, তার পিসীমা ও অন্যান্যদের)

তোমাদের লাল ঘরবাড়ী সূর্য্যোদয়ের ছবির মতো
স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্য থেকে ভেসে ওঠে
তোমাদের লাল ঘরবাড়ী
নদীর শরীর থেকে আরো গভীর শরীরে বসে থাকো তুমি
উদাসীন দুইচোখ তুলে
তোমার ঠাকুমা ছানিপড়া চোখে সংসার দেখেন
মাঝে মধ্যে অবসর যাপনের মতো
কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ে থাকে
তোমার সুদৃশ্য তাকে উঁকি মারে বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ
তোমাদের লাল ঘরবাড়ী
দ্রিমিদ্রাম দ্রিমিদ্রাম দ্রিমিদ্রিমি দ্রিমি দ্রুত লয় বেজে ওঠে
তোমাদের ঠাকুর ঘরের মধ্যে
সদালাপী তোমার বাবার মুখ
আমগাছের ছায়ায় তোমাদের বিরাট পুকুর, লালপাড় শাড়ীর ভেতর
তোমার মা, পুকুরের কাক-জলে মা'র প্রতিচ্ছবি
একদিন কোথাও না কোথাও তোমার সঙ্গে দেখা হয়
তোমাদের লাল ঘরবাড়ীর ঠিকানা দিয়ে তুমি
বলে ওঠো : সূর্য্যোদয়ের ছবির মতো আমাদের ঘরবাড়ী
গেটের সামনে বসে থাকে
আমাদের দয়াহীন রোমশ কুকুর বাঘা।
উদাসীন দুই চোখ তুলে বারান্দায় বসে থাকো তুমি
স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্য থেকে ভেসে ওঠে
তোমাদের লাল ঘরবাড়ী।

সিরাজুদ্দীন আমেদ ।। পিকনিক

পিকলু বলল, অনেকেই পিকনিকে যাচ্ছে, যাবে?
আমি কখনো পিকনিকে যাইনি, পিকনিকে যাই না।
অথচ চারদিকেই পিকনিক।
সবুজ পিকনিক দেখলুম, লাল পিকনিক দেখেছি,
যোজনা পিকনিক চলছে, গরীবী হঠাও পিকনিক মারা গেছে,
দুর্ভিক্ষে প্রেমের পিকনিক হয় না। কোনো পিকনিকেই বিশ্বাসী নই।
পিকলু বলল, উত্তর দিচ্ছ না যে?
বললুম, শরীর ভালো নেই।
শরীর খারাপ হলে আমার খুব ভালো লাগে।
শুয়ে শুয়ে ঘুড়ি ওড়াই, অথবা জলে ডুব দিই,
কুয়াশার পতন-শব্দ শুনি,
আমার প্রিয় নামগুলি ওড়ে অথবা সাঁতার কাটে।
নীলা বলেছিল, শরীরে তোমার কিসের অসুখ?
ডাক্তার বলেনি আমার অসুখ।
অথচ অসুখ আমার অস্থিমজ্জায়, সমস্ত শরীরে।
অসুখ করলে আমি ভ্রূণের স্বপ্ন দেখি।
ভ্রূণটাকে বাঁচাতেই হবে।
রাণা বলেছিল, কাকু, ভ্রূণ মানে কি?
অপার শূন্যতার মাঝে সভ্যতার ভ্রূণ, জীবনের ভ্রূণ।
কবিতারও ভ্রূণ হয়।
বললুম, ভ্রূণ কাকে বলে জানি না রাণা।
পিকলু বলল, দার্জিলিং-এ আবার ধস্, জানো?

চারদিকেই ধস্। অসংখ্য মানুষ ধসের কবলে।
কেউ নিখোঁজ, কেউ বা মৃত।
আবার ধ্বসের আগে ইস্টিশানে আত্মারা জিরিয়ে নিচ্ছে।
বললুম, খবরের কাগজ আমি পড়ি না।
নীলা বলেছিল, তুমি বুঝি খুব পড়তে ভালোবাসো?
হ্যাঁ, সেটাই আমার অসুখ। পড়েও কিছু বুঝি না।
বুঝলে মনে হয় সবই পুরোনো।
সব কিছুর মধ্যেই পুলিশের গন্ধ, কিংবা আফিমের।
ঘুড়ির লাটাইয়ে তাদের গুটিয়ে ফেলতে চাই।
রাণা বলেছিল, কাকু, ঘুড়ি কিনে দেবে?
ঘুড়িরা সব বর্ণচোরা, বহুরূপী, কেবলই রঙ বদলায়।
এক লক্ষ মোহর দিলেও আমি ঘুড়ি কিনতে পারব না।
অথচ ঘুড়ি ওড়াতে কী ভীষণ ভালোবাসি!
পিকলু বলল, যাবে না কেন; ভীড়ের ভয়?
আমি অসংখ্য মৃতযানে চড়ে ভীড় ঠেলে এগিয়ে যেতে পারি।
আমি অসংখ্য সখের ফিতে কেটে নেতা হতে পারি।
আমি অসংখ্য স্তব্ধতা ছুঁয়ে উদাসীন হয়ে যেতে পারি।
পিকলু বলল, দেখি আর কাকে বলা যায়।
এমনই হয়। সঙ্গী বদলাতে বদলাতে ক্লান্তি আসে
বিপ্লব বিপ্লব শব্দের খেলায় ক্লান্তি আসে
সবুজ কিংবা লাল কিংবা যোজনা কোনোটাই হয় না।
কেবল অসুখ হয়, ধস্ নামে, ঘুড়ি ওড়ে,
ভ্রূণের বীজ আর থামে না।

তিনটি কবিতা ।। তপোধীর ভট্টাচার্য ।। গরীয়সী

গরীয়সী মৃত্যু এসে এলোমেলো করে দেয়
এই সব সমৃদ্ধ সংসার
ধুলোয় লুণ্ঠিত হয় নালন্দা ও বুদ্ধগয়া, এই ভাবে
নষ্ট হয় আয়ুষ্কাল,
শিশু ও বালিকার শরীরে ঘনায় বয়স্ক ছায়া,
এবং একদিন
সহজ কৌতুকে প্রেম
নিয়তির মত হেসে বলে যায় :
ভূমৈব সুখম্‌
বনরাজিনীলা থেকে উঁকি দেয়
মেঘ ও অসুখ
মৃত্যু প্রেমিকের বেশে
তুচ্ছ করে জীবনের সমুদ্র বিলাস।।

এখন সূর্যাস্ত হবার সময়

এখন খেলা ভাঙার সময়, এখন সূর্যাস্ত হবার সময়
এখন পাহাড়ের গায়ে খেলা করছে
এক পশলা মেঘের মত ছায়া
চিরহরিৎ গাছের শরীর হালকা হয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ
থেকে-থেকে ঝরে পড়ছে হলদে পাতা, পাকাপোক্ত ডাল,

ফোঁটা-ফোঁটা জলের মত ঘাম
নিবিড় বৃষ্টিপাত ঘষে ঘষে পাহাড় থেকে তুলে দিচ্ছে
জমাট বরফের মত আস্তরণ
এখন স্বপ্নের মধ্যে
ভেঙে যাচ্ছে পুরোনো হাট, উল্টোপথে নিজস্ব আবাসে
ফিরে যাচ্ছে লোকজন,
এখন বিষণ্ন বাতাসে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে
নাবাল ভূমির উত্তরাধিকার
এখন লোকালয় জুড়ে সন্ধ্যা নামার সময়
এখন সমস্ত খেলা ভাঙার সময়
বারান্দার ক্যাম্পখাটে শুয়ে আছে মৃত শরীর, অনুভূতি থেকে
ঝরে পড়ছে রূপোলি সুতোর মত স্মৃতি
এখন কেবল
জ্যোৎস্নারাতে দ্বিধাহীন সাঁকো পেরোবার অপেক্ষা
এখন সূর্যাস্ত হবার সময়।।

আজ বৃষ্টি

আজ বৃষ্টি, আকাশের নিচুতলায় ঘোরাফেরা করছে মেঘ,
কালো ও ধূসর
রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সোঁদা মাটির গন্ধ পাচ্ছে
প্রেমিক যুবকের দল
আজ বৃষ্টি, কাল রাতে মনোদুঃখে ভীষণ কান্নাকাটি করেছিলাম
আমার নিজের মুখ অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল নোনা জলে
বাটনহোল থেকে সদ্যফোটা গোলাপ
ছিনিয়ে নিয়েছিল একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ,
আমার শরীর থেকে খসে পড়েছিল
চুল-দাড়ি দাঁত কান ও নখ
ভীষণ ভয়ে
আমার আত্মা উড়ে গিয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক চাঁদের দিকে
কাল মেঘ ছিল না
আজ বৃষ্টি, প্রগাঢ় তুফান ও জলধারা নেমে এসেছে
একসঙ্গে, কাল কেউ
আমাকে স্বাগতার ঠিকানা বলে দেয় নি, কেউ বলে নি

ওদের তেতলা বাড়ীটা ঠিক কোথায় ও কত উঁচু, আমি
আন্দাজে এদিক-ওদিক খুঁজে দেখেছি, আমার
কিছুই ভাল লাগে না, নিঃশ্বাস
নেবার মত ভদ্রগোছের জায়গা পাইনি খুঁজে, কাল সারাদিন
কাঠফাটা রোদ্দুরে সাগরের রাস্তা খুঁজেছি
আমাকে কেউ কিছু বলে দেয় নি, সবাই ফিরিয়ে দিয়েছে
ফিরিয়ে দিয়েছে উৎসব-মণ্ডপ থেকে, ভোজবাজির মত
আমার শরীর থেকে ছায়া চুরি গেছে কাল
আজ বৃষ্টি, আজ সারাদিনই ঘোরাফেরা করছে
কালো ও ধূসর মেঘ।।

মনোতোষ চক্রবর্তী । ঋণ

আমৃত্যু তোমার কাছে ঋণ থেকে যাবে,—এই অনিবার্য ভয়
এখন আমাকে সারাদিন তাড়া করে
অসংখ্য কাজের মধ্যে সকাল, দুপুরে
হঠাৎ তোমার মুখ অবাক সুষমা হয়ে আমাকেও আনন্দিত করে।
অথচ তোমার স্বপ্ন-দেখা সুখী জীবনের মধ্যে আমি সামঞ্জস্যহীন
তোমাকে পীড়িত করে আমার স্বভাব
তদুপরি বজ্র আঁটুনির মতো ক্ষিপ্র সামাজিক চোখ
দেখা হয়, অনিবার্য দেখা হয়ে যায়।
সুখ-দুঃখ-অভিমান এইসব প্রেমিকের—প্রেমিক, যে দূরে থাকে
আমি বাহুলগ্ন প্রাণ, এবং তোমার
প্রেম ও শরীর থেকে দূরে
তবু কেন দেখা হয়? কেন ঋণ থেকে যায়?

পূরবী রাউত । স্বপ্নটা আসলে হেঁয়ালি নয়

সম্রাট আকবর নির্দিষ্ট পাশবালিশে তখন নিদ্রা যাবেন;
মাঝে মাঝে ধাঁধায় বিরক্ত করছেন—হে বুদ্ধিমন্তা বলতে পারো
প্রজাদের অসুস্থতার কারণ ইত্যাদি ইত্যাদি। উত্তরে
পুরস্কার পেতো প্রখ্যাত বীরবল। আহারে, অতর্কিতে এখন যদি
সম্রাট প্রশ্ন করেন—বলতে পারো তোমাদের খাবার কিসে তৈরী?
তোমরা কী পোষাকে সজ্জিত আছো যুবক-যুবতী?
দেখতে দেখতে কাঁচের ফ্রেম বৃষ্টিতে ঝাপসা হয়, ঝাপসা হয়
পৃথিবী, নির্বাক হয় জনসভা।
স্পষ্টভাবে বলে দিতে পারে তারা, নৈমিত্তিক ধাঁধায় ঘোরপাক খায়;
যেমন তাজমহলের আগন্তুক পথভ্রষ্ট হয়।
চেয়ে দ্যাখো সম্রাট পর্দায় হাসছেন—হাতের মুঠোয় দণ্ডায়মান
তৃষ্ণার্ত নর-নারী। মন্ত্রপূত কংকাল নাচতে থাকে, ভয়ংকর শব্দে
ঘুম ভেঙে যায় তখন।

দিলীপ কুমার বসু । অন্ধ যৌবনের আগে

একটা শালুক ফুল, একটা শালিক।
অভিমানী হাতের গয়নার মত নলখাগড়া সব বেঁকে রয়েছে।
জলের মধ্যে এক ফোঁটা কুঙ্কুম, রাঙা মেয়ের গা-ধোয়া সৌরভ;
গলায় ছিপের দাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো তিৎপুঁটি
তরতর করে সাঁতরিয়ে বেড়ায়, খসেপড়া মুকুটের ফুলে
ঝগড়ার শব্দ।
রৌদ্রের দরজা বন্ধ করে দেওয়া সন্ধ্যার ঠোঁট কাঁপছে,
ম্লান কান্নার শব্দের মত বেরিয়ে এল তারা একটি,
তারপর হু হু করে অনেক জড়ো হলো।
স্থূল চঞ্চলা সন্ধ্যা চন্দ্রপ্রেমে কুঙ্কুম মেছো যুবতী যখন,
তিৎপুঁটি মুকুটের পাশে নলখাগড়ার নীচে চমকে
ঠোকর মেরে ডুব দিল রূপকথার মণিটুকু নিয়ে,
তার হৃদয়, তার বিস্ময়, তার প্রেম।
ঋষির মত রৌদ্র তখন মহাবেদনাকে তার
অন্য দেশে নিয়ে গেছে।

প্রদীপ বিকাশ রায় / সংকেত

তুমিতো সর্বত্রই ছড়িয়ে আছ, বিশ্ব ও বিন্দুতে তোমার
সমান বিস্তার
আমরাই শুধু দুঃস্বপ্নের বাস্তব বিলাসে অহংকারের প্রাচীর তুলি
মাথার উপর
পদবীর পুচ্ছ নাড়ি, বাক্যের বহরে বাড়ে ব্যর্থ পদাবলী
প্রাচীরে প্রাচীরে প্রজাপতি প্রার্থীদের প্রতিশ্রুতি প্রলাপ।

অথচ সময়ের দূত আসে শব্দহীন শরতের কুয়াশার মতো
সুগন্ধ আভাস
তেমনি, সময় হলে চড়ুই পাখির ঠোঁট মাটি থেকে তুলে নেয়
স্বপ্ন সবুজ আঁশ।
শুভ্র আকাশের দিকে এক শুভ্ররঙ পাখি একাকী উড়ে গেলে
বুকের পাঁজরে ওস্তাদ তবলচির আঙ্গুল যেন চাবুকের
প্রত্যুত্তরে দ্রুত অশ্বখুর
এই রকম চলমান দৃশ্যের দিকে চোখ ফেরালে চোখ চলে যায়
আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব খড়িমাটির দাগের মতো মুছে যায়
আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব খড়িমাটির দাগের মতো মুছে যায়
সে সময় মনে হয়, আমি তো বুদ্বুদের মতো তোমারই অভিপ্রায়।
ভিখারীর ভঙ্গিমা আর নর্তকীর মুদ্রার আঙ্গিকে সমস্ত শরীরে মেখে
আকাশের নীল
সময়ের সঙ্গমে যাব যখন তোমারই পদশব্দে কবিতার ছন্দে আসে
সাবলীল মিল।

হিমাদ্রি দেব / ১৯৭৪ এর কবিতা

আজকাল
কেউ যদি দয়া করে
অল্প-স্বল্প রুটি ও ছোলা ছিটিয়ে দেয়,
আমি তখন
তার বিগলিত করুণায় মুগ্ধ হয়ে বলি—স্যার,
আমার গায়ের চামড়া দিয়ে জুতো তৈরির অর্ডার দিতে পারেন।
তখন নাকের উপরে তিলক পরে
বুকের পাঁজরে শতনাম লিখা হয়ে যায়।
ক্লাবে ক্লাবে ভক্তরা জড়ো হয় ... ... হরি হরি
হরে রাম
কল ও কলকারখানায় ... ... হরি হরি
হরে রাম
শরীরে শরীরে ... ... হরি হরি
হরে রাম
তখন সময়ের নীলচোখে তীব্র জ্বালা, মেঘের ভিতর থেকে
বর্শা ছুটে আসে।
তখন উপোসী মায়ের লাশ জ্বলে ওঠে সময়ের শেষতম
আলো ও হাওয়ায়।

শংকর বসু । এই তো প্রশস্ত সময়

এই তো প্রশস্ত সময়
যখন পিতামহের স্মৃতি অবহেলায়
হারিয়ে যায় মুছে যায় পুরোনো ভালোবাসা
জলের মতন
এই তো প্রশস্ত সময়
যখন অবলীলায় হেঁটে যাওয়া যায় শ্মশানে
নিজের শবদেহ জ্যোৎস্নার মত নির্ভার লাগে
এখনই টান টান পড়ে থাকা পথ ধরে
ক্রমশই চলে যেতে হয়

অনেক দিন তো গত হল
দিন মাস বছর পেরিয়ে পেরিয়ে পেরিয়ে
কোথায় দাঁড়াবে আজ
পিছনে তাকিয়ে দেখ
যত জল জমেছিল বুকে সব সরে গেছে
যত বাড়ী গড়ে তুলেছিলে
ভেঙে ভেঙে আজ তারা স্মৃতি হয়ে গেছে
কররেখাও হাতের মুঠিতে নেই আজ
কোথাও জানালা খুলে রাখেনি কেউ
অথবা পর্দা তুলে ডাকে না কোনও মুখ
পরিচিত
চোখের ওপর জলছবির মতন যে স্বপ্নেরা
শুয়েছিল তারা কেউ নেই আজ

আসলে কেউই অপেক্ষা করে না
সকলেই কথা দেয় সকলেই রঙীন
বেলুন ওড়ায়
সকলেই জল দেবে বলে
পর্দায় এঁকে রাখে উদ্যত বন্ধুতা
অথচ সময় বয়ে গেলে সবাই মিলিয়ে যায়
ভুলে যায় প্রতিশ্রুতি ব্যবহৃত শব্দাবলী রঙীন
বেলুন
অনেক দিনের গড়ে তোলা স্বর্গ
বুকের ভেতর নিরন্তর ঝরে পড়ে
সব কিছু ছিনতাই হয় মাঝ রাস্তায়
ওলট পালট হয়ে যায় সব স্মৃতি শহর গেরস্থালী

অনেক দিন ত হল
দিন মাস বছর পেরিয়ে পেরিয়ে পেরিয়ে

এই ত প্রশস্ত সময়
যখন ... ...

দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য । ছুঁয়ে থাকে বাতাবি শরীর

ছুঁয়ে থাকে বাতাবি শরীর
গোলাপ কাঁটার মতো শুদ্ধ উপহারে
শরীরী গন্ধ নিয়ে ছুটে আসে বাতাবি শরীর
দৌড়ে যায় প্রাত্যহিকতার দিকে
ট্রেনে-বাসে, তাসের আড্ডা আর বস্তু-চেতনায়—
উর্ধ্বচাপ বুকে বাজে।
এভাবেই মুক্ত হয়, সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা থেকে
ক্রমশ ছড়িয়ে যায় টুকরো টুকরো ছবি;
তাবৎ জলজ শব্দ নিংড়ে নিয়ে শিল্পময় বেদনার স্রোত
আক্রান্ত স্বপ্নের দিকে আমাকে তাড়িয়ে চলে
অনেক অনেক দিন ধরে।

একেকবার মহানুভবের মতো উদারতা নিয়ে
জন্মান্তর হয়, আয়নায় তাকিয়ে আর চিনতে পারি না
যেন সম্রাট, মনে হয়
দু'দিকেই ছুঁয়ে আছি দুঃখ ও সাম্রাজ্য।
এ ভাবে মনের মধ্যে ধানবীজ অংকুরিত হলে
যা কিছু সহ কিংবা সরলতা বোধ
অক্লেশে হারিয়ে যায ছুঁয়ে থাকে বাতাবি শরীর।

পীযূষ রাউত। বহুযোজন দূর

সাধের কথা
আহ্লাদের কথা বহুযোজন দূর।
কার্পাসতুলো কোথায় জন্মে, বিস্তর জন্মে;
ক্লাস নাইনের ছেলেও ভালো জানে। আমি শুধু জানিনা
সুখের পাখির ঠিকানা কোন্ গাঁয়ে; প্রযত্নে কার নাম
ব্যক্তিগত না পিতার।
ছড়িয়ে পড়ে ভোর ভোর বেলা
উঠোনময় শরতের ফুল, কেঁদে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে

চার বছরের জেদী শিশু, বায়না—হাতে চাঁদ এনে দাও।
এসব আমার কিচ্ছু নেই; শখ আছে
ন্যু-ইয়র্ক কিংবা আনারকলি থেকে
টুইডের একটা কোট বানাবার,
জেদ আছে নতি স্বীকার করানোর
যে আমার আজন্ম শত্রু যার সঙ্গে প্রভুত্ব খাটানোর লড়াই
মুহূর্মুহু বাধে।
মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনী আমাকে যদি গৃহবন্দী করে
আমার জানানো হবে না
যথার্থ শত্রুকে ঘায়েল করার অভিসন্ধি
খুঁটিনাটি গ্রামার।
আমার সারা শরীরে দমকলের ঘণ্টা বাজে—আগুন লেগেছে,

আগুন, পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে
আমার পিতৃপুরুষের দলিল,
আমার আইডেনটিটি কার্ড।
আমি শহর থেকে ছুটি নিয়েছি, চাকুরি থেকে ইস্তফা,
বউ এর থেকে তালাক।
আমি এখন যাবো কোথায়?
বিনা কারণে সমুদ্রে (ভর শীতে) ঝড় ওঠে, জাহাজডুবি হয়,
বৈরী মিজো তুলে ফেলে পাহাড় কন্দরে
রেলওয়ে লাইন—স্লিপার;
ট্রেন দুর্ঘটনা পলকেই ঘটে যায়।
আমি মৃত্যু চাইনা কিংবা হাফ গেরস্থের মতো বেঁচে থাকা।
তবু শামুকের মতো গুটিয়ে যায়
আমার মধ্যবযসের শরীর।
আমি গন্ধ চাই বেলফুলের;
আমি বর্ণ চাই গোলাপের। কিন্তু
হুড়মুড় শব্দে ছুটে আসে ভগ্নদূত;
পোস্ট-আপিসের লালরং সাইকেল আমার গেটের সামনে
দাঁড়ায়—আপনার টেলী ...।
'টেলী' এই শব্দটা শুনলেই বুকের ভিতর
শির শির করে ওঠে অর্থহীন ভয়।
সুখবরও তো হতে পারে; লটারীর লাখ টাকা, কাম্য
ট্রান্সফার, প্রমোশন কিংবা আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব
কারো না কারো ওয়েডিং গ্রিটিংস।
কিন্তু আমি যে বিদেশ যাবো;
করতলে লেখা আছে যৌবনে সমুদ্র-ভ্রমণ।
আপনি কি জানেন, জাহাজ-কোম্পানীতে
কিভাবে খালাসী নেয়?
আপনি কি জানেন, কোন্ ঠিকানায়, কার নামে
দরখাস্ত পাঠাবো?

□ আমাকে চেয়ে দ্যাখো/আমি ফিরে এসেছি □

জো না কি

□ জোনাকি : কবিতা এবং কবিতা বিষয়ক সাময়িক পত্রিকা। সংখ্যা পনেরো।
পুনর্জন্ম সংখ্যা। শরৎ পর্যায় . ১৯৭৮। সম্পাদনা : পীযূষ রাউত, দীপক চক্রবর্তী।
প্রচ্ছদ চিত্র এবং অঙ্গসজ্জা . অসীম চক্রবর্তী। □

'জোনাকি'র পুনর্জন্ম

জোনাকির পুনর্জন্ম হল।

বারবার নাম ও চরিত্র বদলের পর আবার ফিরে যাওয়া শুদ্ধ কবিতার কাছে। কবিতা-বিষয়ক পত্র 'জোনাকি'র কাছে। ত্রিপুরার এই আদি কবিতার কাগজ ষাটের দশকে ত্রিপুরা ও ত্রিপুরার বাইরে যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল, তাকে অস্বীকার করে, তার প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করে আজ আমি অনুতপ্ত।

তবে 'জোনাকি'র এই পুনর্জন্ম আদৌ সম্ভব হতনা, যদি অনুজপ্রতিম ভ্রাতৃদ্বয় দীপক-অসীম চক্রবর্তীর আক্রমণ ও প্রয়াস আন্তরিক ও জোরদার না হত। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, বস্তুত 'জোনাকি'র এই দ্বিতীয় জন্মের দায় দায়িত্ব পুরোপুরি ওদের দুজনেরই। আর আমার? আমার ব্যক্তিগত আগ্রহহীনতার কারণ ত্রিবিধ—১) বয়সোচিত আলস্য, ২) এই শহরে কবিতার নামে কিছু অকালপক্ক অকবির অদ্ভুত সব ক্রিয়াকাণ্ড, ৩) পারিপার্শ্বিকে সৎ কবিতা-পাঠকের অস্বাভাবিক অভাব।

দীপক চক্রবর্তী, দ্বিতীয় পর্যায় থেকে, যে অন্যতম সম্পাদক, খুব শীগগিরই এখানে, ধর্মনগরে বদলি নিয়ে চলে আসছেন। এবং এরপর থেকেই 'জোনাকি' তার অতীত ঐতিহ্যের অহংকারকে যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে প্রতিমাসে প্রকাশিত হতে থাকবে। —*পীযূষ রাউত*।

পাহারা

বিজয় কুমার ভট্টাচার্য

আমাদের শহরে তো পাখি নেই
আদিম উর্বরতার শেষে খনিজ লবন
পিতৃপুরুষের ঋণ
শুধু ঋণ
কালরাত আমাদের উঠানেই
বৃষ্টি ঝরেছিলো
এসেছিলো পিতৃপুরুষ
তাই সারারাত আমরা পাহারা দিয়েছি
জেগে
পাহারা দিয়েছি কালরাত—শার্টের কলারে
এখনো ঘামের গন্ধ রুমালের কারুকার্য্য
ডেকে আনে সুন্দরের প্রথম শৈশব শৈশব,
পাহারায় কেটে গেছে কাল।
আমাদের শহরে তো পাখি নেই
সযত্ন পকেটের নীচে ঋণ—শুধু ঋণ
ঋণ—শুধু ঋণ—পাথরের মতো পকেটের খুব নীচে
শব্দ করে
শব্দ করে
ক্রমাগত শব্দ করে ঋণ ... ...

লোহারবন্দ ফরেস্ট ডাকবাংলো সন্নিহিত

পীযূষ রাউত

লোহারবন্দ ফরেস্ট ডাকবাংলোর টিলা ঘুরে যেন ময়ালসাপ, সেই রহস্যময় পথ কিছু দূর গিয়েই গভীর অরণ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। দূর অতীতের এক সুখী কিশোর ভালোভাবেই জানে এই পথ দূর আইজল গেছে। এই পথে চুয়ান্নর জওহরলাল এবং রূপসী ইন্দিরা হাত উড়াতে উড়াতে আইজল গেছলেন। অবাক কিশোর এক নির্জন দুপুরে একা একা হেঁটে যায় কিছু দূর। তার গা ছম্‌ছম্ করে। সে স্বগতোক্তি করে—এইখানে বাঘ থাকে? ভুত? লোকে বলে—থাকে। মত্ত হাতিও থাকে। দলবল পরিবৃত ওরা এই পথ পার হয়ে আরও বিশাল বনে, গুপ্ত ঝর্ণাস্রোতের দিকে নির্ভয় হেঁটে যায় তারা।
সেই ভীত ও বিস্মিত কিশোর আজ অর্ধ পরমায়ু পার হয়ে গেছে। আজ তার হঠাৎই মনে পড়ে—বহুদিন যায়নি সে আইজলের সেই পরিত্যক্ত পথে। যেখানে একা একা নির্জন দুপুরে একদা গিয়েছিল অবাক কিশোর। সেই অরণ্যে মুখোমুখি থমকে দাঁড়িয়ে পড়া সেই ফরেস্ট ডাকবাংলো বহুদিন দেখেওনি সে। সারসত্য জানে সে, ইতিমধ্যে বদলে গেছে পৃথিবীর বহুল পোষাক। যেহেতু পথ, পরিত্যক্ত পথ, হতে পারে অরণ্য এগিয়ে এসে এতদিনে তাকে গ্রাস করে গেছে। আইজল আজ অন্যপথে গেছে। লোহারবন্দের সাপ্তাহিক হাট কবেই স্মৃতি হয়ে গেছে। সদর শহরের দিকে চলে গেছে আঞ্চলিক মহাজন সব।
না, সেই অরণ্যের দিকে, ডাকবাংলোর দিকে আজ আর যাবে না বয়স্ক পুরুষ। ভাললাগা বোধ তার আজ, এখন অন্য খাতে বহে।

উদাস কুসুম বনে

শঙ্করজ্যোতি দেব

ঐশ্বরিক প্রতিশব্দের পালক একদিন নেমে এসো
আমাদের আদিম তরুগুল্মলতাময় উদাস কুসুম বনে
প্রিয় শব্দ নিষ্ফল দুপুরে তুমি আর
অকালফুলের মাটিতে ঝরে যেয়ো না
মানুষেরা মাটির মানুষেরা অকালফুলের মুখোমুখি
মাটির স্বপ্ন ভুলে যেতে যেতে
ভুলে যায় বিশাল গুল্মের হৃদ্‌গাথা
হে স্বপ্ন, মেরুহীন মানুষের অস্তিত্বের প্রদাহ
তোমাকে রুগ্ন করে তোলে
ব্যর্থ জীবাত্মার প্রশ্রয় অশ্রু, অথৈ জলের শীতল আবাহন
অঘ্রানের কবিতার মসৃণ মাঠ
স্মৃতির কুয়াশা ভরা কাজল চোখ
কিছুই ভোলেনা ঈশ্বরহীন পরমাত্মার ক্ষোভ, অহংকার লোভ
হে শব্দ, হে আমার নৈঃশব্দের করুণ প্রবাহ
ঐশ্বরিক মৃত্যুর পদশব্দ, আহত তর্জনীর শেষ প্রহর গুণে গুণে
একদিন একলা নেমে এসো
অভিলাষহীন অস্তিত্বের তরু গুল্মলতাময় উদাস কুসুম বনে
শ্বেতশুভ্র পাখির পালকের নিঃশঙ্ক স্পর্শে খুলে যাবে
আমাদের কৃপণ সৃষ্টির জন্মফুলের অন্ধকার
নির আকাশের অশ্রুর আড়াল
হৃদয়তন্ত্রের রাঙারেণুর অন্তরে অন্তরে
স্তবকের মৃন্ময় তৃপ্তশ্বাস—
ঐশ্বরিক প্রতিশব্দের পালক একদিন নেমে এসো
আমাদের আদিম তরু গুল্মলতাময় উদাস কুসুম বনে

বৃদ্ধ

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নাবাল জমির কাছে তার ঘর
চালিটার পাশ ফিরে ফিকে মেঘ উঁকি মারে
জয়ন্তীর প্রান্তদেশে, ভারিশূন্যে ভেসে ভেসে ছোট্ট দুয়ারে
করে করাঘাত
কবে যেন ডুংরীর ফুল ছিলো বাগানের পাশে
কালিঝোড়া রায়ডাকে ছায়া ছিলো চায়ের বাগানে
দুপুর আসার আগে ডিং ডাং শব্দ তুলে ফিরে যায়
হল্লাভাঙা রমণী পুরুষ
সবুজ পাটায় বসে সে, অবসন্ন নিজস্ব ভূমিতে
নিশ্চিত জেনে নেয় সুরক্ষিত লোভ নেই, লালসা নেই
আছে শুধু নাবাল জমিতে তার ঘর
হাড় জাগা কণ্ঠা শুধু, নিজ দীর্ঘশ্বাস।

নষ্ট বিজুলী পুড়ে

দীপক চক্রবর্তী

কবিতার প্রগাঢ় যন্ত্রণা কেড়েছিলে, পরিত্রাণ খেঁজো না তুমি—
তোমার দর্পিত মুখ এই বুকে জ্বেলে দেব,
জ্বেলে দেব সামাজিক মূর্খতায় বৈকালিক প্রেম ও কীর্তন—
তোমার দর্পিত মুখ পথে পথে এঁকে দেব
গাছ ও গাছের গভীরে—বন ও বনের গভীরে
লতায় পাতায়
প্রাসাদে—মাঠে মাঠে—বারবণিতার ঠোঁটেবুকে
পুলিশফাঁড়িতে—ভিখিরির ছেঁড়া ইজেরে
তোমার দর্পিত মুখ এঁকে দেব।
আজন্মের পাপ পুণ্যের ফল তুমি
তোমার পরিত্রাণ নেই—
তুমি ভেঙে দিলে এলোমেলো সময়ের ঘোর,
জ্যোৎস্নায় যে যুবক অন্যমনে পেচ্ছাব করেছে—
কবিতার ধুলোমুঠি ছড়ায় ছিটোয়,
যেন ধান—যেন ধানের প্রস্তুত জমি
জলে ও কাদায়—বৃষ্টিতে ভিজেছে খুব
যেন বুক পুড়ে যায় চৈত্রের চিতায়
গান গায়, ভৈরো থেকে আহিরিঠোলায়
খোঁজে প্রেম—যৌনতা জড়ায়,
তাকে ডেকেছিলে ঘরে।
খেলাচ্ছলে যে নুড়ি তুলেছ হাতে, সে নুড়ি ফেলেছ ছুঁড়ে
যেখানে বাতাস নেই,—নষ্ট বিজুলী পুড়ে—পুড়ে প্রেম—
তুমিও জানিও তাহা
আহা,
ঐ দর্পিত মুখে পুড়ে যাবে,
যেভাবে পুড়ে পথ গাছ ও সংসার।
কবিতার প্রগাঢ় যন্ত্রণা কেড়েছিলে, পরিত্রাণ খোঁজো না তুমি।

শিল্পের ভূমিকা

দীপংকর নাথ

ইঁদুরের কোলাহলে ভেসে যায় মানুষের অদ্ভুত খামার
একদিন, ডাক আসে—আঙ্গিনায় জড়ো হয় লুণ্ঠিত দিন
সন্তাপের, ইতিউতি ওড়ে ধুলো নশ্বর বাতাসে বীজ উড়ে যায়
হায়, ইঁদুর জেনেছে এই ইচ্ছামৃত্যু মানুষের অজানা, এখনো

মানুষের অশ্রুক্ষেপে পোড়ে দিন দহন জমেনা জলে, তার
নিষ্পন্ন অহংকার থেকে প্রিয় আত্মীয়েরা আসে, ভেসে যায়
দেশ মহাদেশ কাছে দূরে—চিহ্ন পড়ে থাকে না কোথাও,
তবু, মানুষ জানেনা তার ইচ্ছামৃত্যু ইঁদুর জেনেছে, কার কাছে?

কার গূঢ় সমাচার ঘরবাড়ী প্রিয় পরিজন দৈব আশীর্বাদে
ভরে দেয়, মধ্যরাতে, লাফ দিয়ে ওঠে চাঁদ কোণাকুণি হাসে
পুড়ে যায় দীর্ঘ মোম দেহরোম উৎসারিত গুহার ভিতরে
বুঝি ইঁদুর জেনেছে এই ইচ্ছামৃত্যু মানুষের এখনো অজানা!

উত্থানের আগে ও পরে

তপোধীর ভট্টাচার্য

একবার, মাত্র একবার তাকে দেখা গেলো সাঁকোর ওপারে
একবার, মাত্র একবার তার চোখে ঝল্‌সে উঠলো
শেষ বিকেলের রোদ
ঐ অভিনব উত্থানের শোক
তাকে বিমূঢ়চেতন করে রেখে দেয়
কিছুকাল, কিছুকাল
দ্রুত স্রোতে ভেসে গেলো বনজ কুসুম, শুধু
জেগে থাকলো
ঐ রতিলীলাভূমি নিয়তিতাড়িত স্রোতে, কুঙ্কুমে, নখরাঘাতে
তাকে জেগে থাকতে হলো কুটিল-একাকী
একবার, মাত্র একবার তাকে দেখা গেল সাঁকোর ওপারে
একবার, মাত্র একবার তার উত্তোলিত হাতে
ঝল্‌সে উঠলো শৃঙ্খলের চূর্ণ অবয়ব

দেখা গেলো চোখের গভীর তাকে
বিমূঢ়চেতন, আর
মৃত্যুর চেয়ে গাঢ় জাগরণ শেষবার
এনে দিলো প্রপাতের শোক, ঐ
দ্রুততম জলস্রোতে জেগে থাকলো অভিনব উত্থানের দিন।।

অলৌকিক অভিমান

শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

ছেলেবেলায় আমরা কুপিল্যাম্পের আলোর চারপাশে গোল হয়ে বসে পড়াশোনা করতাম। আমি ও আমার জেঠতুতো ভাইবোনেরা তখন, আদর্শ ভূগোলের নোট—মৌলবী শাহ্ ইম্‌জিয়াজ আলী বি.এ, বিটি, পাঠশালা সাহিত্য, মৌলবী আশ্‌হর আলী বিএবিটি, নীতিকণা কিংবা জ্ঞানোদয় এই সব বই-এর কয়েকটি পাতা বিশেষ এক ধরণের ঘুম লাগানো সুরে পড়তে পড়তে হঠাৎ টুপ করে ঘুমিয়ে পড়তাম। যখন ঘুম ভাঙতো, দেখতাম, মা অথবা জেঠিমা ভাতের থালা সামনে ধরে অনবরত পর্যায়ক্রমে ধমক ও আদর দিয়ে ছোট ছোট অন্নপিণ্ড মুখে ঠেসবার চেষ্টা করছেন। আমার বোজা চোখের হাঁ-মুখে একটি ছোট্ট ভাতের ডেলা পুরে দিয়ে মা বলতেন, 'এই বাবা হাঁসের ডিম, কে খেল কে খেল'—এইভাবে হাঁসের ডিম, চড়ুয়ের ডিম, কাকের ডিম সব গলাধঃকরণ করতাম। তারপর টানা ঘুমে রাত কাটত।

কারণে-অকারণে আমি মাঝে মাঝেই খুব রাগ করতাম। ঠিক রাগ নয়—অভিমান। সঞ্জীব চন্দ্র বলেছেন, বাঙালীর যত রাগ সব ভাতের উপর। এই হিসাবে আমি সেন্ট পারসেন্ট বাঙালী ছিলাম। আমার যত রাগ, সব ছিল ভাতের উপর। রাগ হলেই, থালা ভাঙতাম, গ্লাস ছুঁড়তাম, তারপরেও রাগ কমত না। শরীরের তুলনায়, আমার মাথাটা বড় ছিল। আর আমি মাথামোটা মানুষ বলেই হয়ত, নিজের মাথা নির্মম ভাবে মাটিতে ঠুকতাম।

আমার আ-জন্ম বন্ধু আমার বাবা। রাত্রে মায়ের কাছে কদাচিৎ শুয়েছি। বাবার কাছে না শুলে আমার ভয় করত। আর একটা কারণেও আমি বাবার কাছে শুতাম। বাবা আমাকে শুয়ে শুয়ে অঙ্ক শেখাতেন। অঙ্কটা আমার কাছে খেলার মতো ছিল। আমি কোনো কারণে রাগটাগ করলে, বাবা আমাকে ডেকে নিয়ে একটা রীতিমতো কঠিন অঙ্কের ধাঁধা দিয়ে বসিয়ে রাখতেন। আমি মুহূর্তে সব রাগ-অভিমান ভুলে গিয়ে, অঙ্কটা কষে দিতাম। এই অঙ্ক-অঙ্ক খেলা নিয়েই বাবার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গভীর হতে থাকে। প্রতাপ চন্দ্র ভট্টাচার্যের পাটীগণিতে খুব মজার মজার অঙ্ক ছিল। পদ্যের অঙ্ক। কয়েকটা এখনো মনে আছে। তার একটা যেমন,

একদিন চারি বুড়ি আহারে বসিয়া,/বয়স গণনা করে হাসিয়া হাসিয়া,/প্রথম বুড়িটি বলে

আমি স্বামী হতে,/দ্বাদশ বছর কম হই বয়সেতে।/শুনিয়া দ্বিতীয়া বলে শুনেছি শ্রবণে,/যবে তোর তিনি হন,/হয়েছি সেদিনে/উভয়ের বয়ঃক্রম দু-ভাগ করিলে/পাইবে বয়স মোর তৃতীয়টি বলে।/বয়সে দ্বিতীয় চেয়ে হই বড় কুড়ি,/শেষ জনা বলে আমি সকলের বুড়ি।/বিচারিয়া বল কত বয়স কাহার/দুশত পঞ্চাশ হয় মোট সবাকার।

অ্যালজেবরার সমীকরণ শিখেছি অনেক পরে। কিন্তু দ্বিতীয়মানে পড়ার সময় আমি এই অঙ্কটি কষেছিলাম।

এই সময়েই একদিন একটা উদ্ভট কাণ্ড করলাম। কবিতা লিখলাম। কবিতা নয়, পদ্যছন্দ মিলে নিটোল পদ্য।

'যদি মোর থাকে এ ভুবন মাঝে/শত্রু আমার পরম।/লাগিলে যুদ্ধ হইব ক্রুদ্ধ/মন হবে গরম।'

এখন এই রচনাটির অকিঞ্চিৎকরতা নিয়ে যারা হাসাহাসি করবেন, আমিও তাদের হাসিতে যোগ দেবো। কিন্তু সেদিন মনে হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও আমার মধ্যে পার্থক্য শুধু এই, ওঁর লম্বা পাকা দাড়ি আছে, আমার নেই।

আমি পাড়াগাঁয়ের মানুষ। একেবারে অজ পাড়া গাঁ। আমাদের বাজার ও পোস্টাপিস ছিল তিন মাইল দূরে। হেমন্তে হাঁটাপথে, বর্ষায় নৌকাযোগে ডাক পিওন সপ্তাহে একদিন চিঠি বিলি করতে আসত। আমার কাছে তখন কেউ চিঠি লিখত না; কিন্তু বাড়ীতে কোনো চিঠি এলে আনন্দে নাচতাম।

এ সব কথা আমি কেন লিখছি জানি না। আমার স্বভাবের মধ্যে পদ্য-প্রীতির উপাদান খুঁজতে আমার ভাল লাগে। আমার ধারণা, আমি যথাসম্ভব সংস্কারহীন মানুষ। দেবতায় ভক্তি ও উপদেবতায় ভয় আমার ছেলেবেলা থেকেই নেই। ধর্ম সম্পর্কেও ঐরূপ। আমার পদ্যাদির মধ্যে আমার স্বভাবের এই দিকটা কোনো না কোনোভাবে নিশ্চয়ই ফুটে ওঠে। কিন্তু সে তো অন্য বিষয়, ভিন্ন আলোচনা।

আমার বাবা বুড়ো হয়ে গেছেন। বাবার প্রশস্ত বুকের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে এক নির্ভয়তার মধ্যে আমার শৈশব কেটেছে। সময় এখন আমাদেরে অনেকটা আলাদা করে দিয়েছে। এখন এক-একটা রাতে আমার একেবারে ঘুম আসে না। ইন্‌সম্‌নিয়া? কিন্তু এই নির্ঘুম রাত্রে বাবার চওড়া বুককে আমার বালিশ করার জন্য, আমি অসহায়ের মতো বিছানা হাতড়াতে থাকি।

জোনাকি

'জোনাকি' কবিতা এবং কবিতা-বিষয়ক পত্রিকা

২৫ বৈশাখ সংখ্যা, সংখ্যা : ১৬, বর্ষ : ১৬।।

.

।।সম্পাদনা—দীপক চক্রবর্তী,

প্রচ্ছদ-চিত্র এবং অঙ্গসজ্জা—অসীম চক্রবর্তী।।

কিছু অন্যমনস্ক সময় : বিজয় কুমার ভট্টাচার্য

বড়ো দেরী করে এলে—অপরূপ,
ভিখিরির দুই চোখে ভালোবাসা
অথবা অন্যমনস্ক কিছু সময় কাটিয়ে গেলো
নাগরিক হাত ধরো। এই পথে গেছে অপরূপ,
মৃদঙ্গ
ভোলাতে পারেনি গানে, বিকেলের ঘরে ফেরা
তাকে নিয়ে গেছে বহুদূর, অপরূপ
অন্যমনস্ক কিছু সময় কাটিয়ে গেলো
বড়ো দেরী করে এলে
হাজার পাখির ঝাঁকে কোনো এক শালিকের ডানা
শৈশবের
ভুল বর্ণমালা এবং অন্তর্বাসে আমাদের ভীরুহাত
দিয়েছে বিদায় তাকে
বড়ো দেরী করে এলে—অপরূপ
অন্যমনস্ক কিছু সময় কাটিয়ে গেলে।

ভালোবাসা হ্যাংলা কুকুর : দীপঙ্কর নাথ

ভালোবাসা নিয়ে এতো হুলুস্থুল করো না হে
আর, জেনো সে এভাবেই খুব অসংযমী হয়ে উঠছে,
তাকে একটু দূরেই রাখো মাংস টাংস খুলে বসো—
জিভ দিয়ে তার জল গড়াবে—দেখো কেমন মজা হবে।
ভালোবাসা নড়তে জানেনা পড়তে জানেনা ব্যথা
কী লাভ তবে? দূরেই থেকো—ভালোবাসা হ্যাংলা কুকুর
পুকুর ঘোলা করতে জানে, মিথ্যে সোনার নূপুর পরাও
তাহার পায়ে, গতরখেগো—তার শরীলে ছেঁকা লাগাও।
ভালোবাসা নিয়ে এতো হুলুস্থুল করো না হে
আর, জেনো, সে কাট-বাঙাল জন্ম কাঙ্গাল চিবিয়ে খাবে
মুণ্ডশুদ্ধু, তাকে তোমার ঘরের ভেতর ঠাঁই দিও না
উঠোনে সে লেজ দোলাবে—ভাবো। কেমন মজা হবে।

দুটি কবিতা : শঙ্কর জ্যোতি দেব

শোক ।।

আমাকে দুটো শব্দ ধার দাও
আমি যে কতোকাল এই প্রেমহীন সময় মেনে নিয়েছি
যদি কাল মুচকুন্দ পাতা চুঁইয়ে পড়ে
সৌররশ্মির শোক, তবে
বনহরিতের পা' খসে যাক্ আদিম আত্মার করুণা

প্রদাহ ।।

রূপছড়া বাগানের কিশোরী রাবেয়া প্রতিদিন
সবুজমাঠ পেরিয়ে যেতে যেতে ভুল করে ফেলে যায়
'আকাশ' লেখা চিঠির বোঝা
এ কি সৃষ্টি শব্দের অভিলাষ অথবা
কৃত্রিম সঙ্গম লোভের অনুরণন
রতিপাথরের প্রদাহ
বয়স দোষের কবিতার মনে রেখে যায় গাঢ় হাহাকার

অনন্য বাঁক : মানবেন্দ্র চক্রবর্তী

কেবল আকাঙ্ক্ষার ঘ্রাণ পিতৃপুরুষের
বিবর্ণ শবের ধূলি থেকে ভেসে আসে
প্রথম বর্ষায় ভেজা মাটির সোঁদেলা গন্ধের মতো—
নিয়ে যায়—নিয়ে যেতে চায়—বাঁক পেরিয়ে বাঁক
—বাঁকের শেষে—যেখানে সমস্ত উপমা লুকানো
ঝিনুকের গোপন বুকের ভেতর—ঝলমলে
মুক্তোয় জারিত লালার আস্বাদ, দীর্ঘ করে
সময়ের পারাপারহীন যন্ত্রণার প্রচ্ছদ।
তবু যেন কাকে বলি—মনে হয় কাকে যেন
আলতো হাতের ছোঁয়া দিয়ে বলি—নিয়ে যাবে না-কি
অনন্য বাঁকের কাছাকাছি—নিটোল মুক্তোর
গভীর থেকে—গভীর, গোপন জন্মজ উপমায়!

পলাতক : করুণা কান্তি দাশ

বড়ো অবহেলা তোর
দীর্ঘকেশী সন্ন্যাসী আমার
তোর অরণ্যচারীর মতো কাপালিক ক্রোধ ও সাহস ছাড়া
কিছুই স্মৃতিতে নেই আপাতত;
বৈশাখের তপ্ত মধ্যদিনে মায়ার খেলার মতো
আবছা কুয়াশাময় মনে পড়ে
—তোরও স্বভাবে কিছু ভালোবাসা ছিলো
ছিলো কিছু শিল্পীত জৌলুস
যা তোকেই দিয়েছিলো সন্ন্যাসীর বিবিক্ত মহিমা।
তোর দীর্ঘকেশ, বিলাসী দুঃখের খেলা, আমরা জানি
সাবলীল ছুঁয়েছিলো আকাঙ্ক্ষার প্রিয় বেলাভূমি;
কিন্তু শুধুমাত্র একটি প্রমাদ ছিলো তোর
বলেছিলি 'সংসারেই সন্ন্যাসীর সুখ'।
ভুল বলেছিলি;
'সংসারেই সন্ন্যাসীর সুখ' যদি
তোর জন্মদিনে মানুষের যাবতীয় সুখ
তবে কেন 'দুখ জাগানিয়া'?
'যেতে নাহি দিব' বলে নিজেই কখন চলে গেলি,
হায়, জেনেও গেলি না,
—জন্মদিনের কাছে কতো ঋণ জমেছিল তোর!

বাইশ বছরের জবানবন্দী : শক্তিপদ ব্রহ্মচারী

গাঁয়ের সবুজ হেন আমারও আত্মাব ছিল রঙ
প্রকৃতি উপুড় করা স্নেহ
বাইশটি বিফল ঋতু মাটি ছেনে ধাতু
বানাবাব লোভে বন্দী করে বেখেছিল
নগর দাক্ষিণ্য দিয়ে
পালিয়েছে ফচ্‌কে ছোঁড়া যেন বা হরিণ
তবে সে সোনার নয়, একান্তই পটের, ছবির
সেও খেতে জানে সেই কচিপাতা শাকসেদ্ধ আর
সবুজের শেকড় অবধি
এখন শরীর নয় লেগে আছে কটূগন্ধ
শ্মশানের ধোঁয়া
মাটি ও জলের জন্য হাহাকার
ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি খিলানে গম্বুজে।

ফিরে যাওয়া : পীযূষ রাউত

যেন স্বপ্নে কিংবা অর্ধজাগরণে
নীলচিল
সবুজ রেলগাড়ী, অস্পষ্ট ধোঁয়ার মধ্যে কাঁপতে কাঁপতে
দূরান্তিক রেলব্রীজ, কুশিয়ারা নদী, নদী জলে
ইলিশের দেহ থেকে রূপালী বিদ্যুৎ
জ্বলে উঠে জেলেদের জালে।
এই ভাবে ফিরে যাওয়া;
অন্তর্গত দুঃখ নয়, দ্বন্দ্ব নয়, দাহ নয় কোনো। শুধু
এইভাবে ফিরে যাওয়া
নৌকো থেকে চোখে পড়া বিস্মৃত ভূমির সেই
প্রাচীন মন্দির, জিলিপির স্বাদ
এখনো মনে পড়ে অম্লান।
শাহ্‌জালালের দরগায়
অজস্র কবুতর; সেখানে কি পালিত নির্ভয়
মাছেদের দীঘি ছিল কোনো!
স্বপ্ন না কি অর্ধজাগরণে
এইভাবে ফিরে যাওয়া,
এইভাবে বেঁচে ওঠা ভুল থেকে, মৃত্যু থেকে
তখন প্রচণ্ড কল্লোলে
ছুটে যায় নামহীন নদী
বহুদূর সমুদ্রের দিকে।

প্রত্যেকেই জানে : তপোধীর ভট্টাচার্য

আমার সকল খেলা তুমি জানো, প্রত্যেকেই জানে
প্রতিদিন লঘু হয়ে উঠি
পেছনে খোলস পড়ে থাকে, ঠাণ্ডা হিম ভব্যতায়
প্রত্যেকেই গাঢ় হয়ে আসি
খেলার নিয়মে তুমি সরে যাও স্বাভাবিক, এতে ব্যতিক্রম
নেই, চেয়ে দ্যাখো
ক্রীড়াভূমি জুড়ে নিসর্গের একান্ত ক্রন্দন জেগে আছে
কবেই থেমেছে খেলা
শুধু তার পেছনের ছায়া দুলছে নামছে ক্রমাগত
প্রতিদিন লঘু হয়ে উঠি
আমার সকল খেলা তুমি জানো, প্রত্যেকেই জানে।

একেক দিন মধ্যরাতে : দীপক চক্রবর্তী

একেক দিন মধ্যরাতে বাড়ীফেরার সময়
শিলচর শহরটাকে বড় একা মনে হয়—
বরাকের মৃদু শব্দ কানে আসে
সব ঘরে বাতি নিভে গেছে—
সব ঘর কেমন ছাউনি মনে হয়, মনে হয়
লোকজন, ব্যস্ত ট্র্যাফিক, বাস-রিক্‌শা, লোকটানা গাড়ী
আপদকালীন ঘুমে ডুবে আছে
সিগ্‌ন্যাল পেলেই চলে যাবে সব।
একেকদিন মধ্যরাতে বাড়ী ফেরার সময়
শিলচর শহরটাকে কবিতা শোনাতে শোনাতে আসি
শব্দের শাসন দিতে দিতে কিছুটা রতিসুখহীন পৌরুষ দেখাই।
ভালোবাসার পল্লী থেকে ফিরে আসতে আসতে
একেকদিন মধ্যরাতে পথের উপর-ই শুয়ে পড়ি, প্রচণ্ড বিদ্রূপে—
তবু টের পাই কেউ জেগে ওঠে না
শুধু ময়দানের পাশে সিগন্যাল সভ্যতার উঁচু লালবাতি
নির্বিকার জ্বলে।
গূঢ় অভিমানে উঠে এসে পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলি, ক্রোধ হয় বড়
একেকদিন মধ্যরাতে
চোখের অতল থেকে হাহাকার চুঁইয়ে পড়ে ধীরে।

সুখের চেয়েও একা-একা : শংকর চক্রবর্তী

তোমার কেশর নেই, সাদা রোম কুয়াশায় উড়ছে খুব ... যখন গাড়িটি
উদাসীন বায়ু ছিঁড়ে ছুটে এলো দ্রুত, তুমি, দীন বারাঙ্গনা
তোমাকে দেখেছি, ভাঙা সিঁড়ি ও শৈবাল ছুঁয়ে কুকুরের মতো
হাঁটু ভেঙে কপালের অংশ ধুয়ে নিতে। বিরক্ত করোনা তাকে,
সেখানে নোঙর
রেখে ভেসে উঠবে আত্মা, তার রহস্যের কালো বাক্স ও নাকছাবি—
বস্তুত, নারীটি কিছু জানেনা, কিভাবে ত্রস্ত খোঁপা ঝরে পড়ে, কিংবা
তার
ঘরবাড়ী ছেড়ে-যাওয়া দৃশ্যটি ধূসর হয় ... বনবাসে, আঠা দিয়ে
দু'মুঠো স্মৃতির
জুড়ে-জাড়ে-রাখা, উর্দ্ধবাহু, দেখেছো কি আমি ও সন্তান
শুধু মৌন হাত নেড়ে দিন যায়, শুভক্ষণে ঘন ধোঁয়ার কলাপাতায়
ফেনভোগ সাজিয়েছি? সে জানে না শিমলতা দিনগুলি পোড়ে,
পুড়ে যায় সুখের চেয়েও অগভীর একা-একা চলে-যাওয়া মুক্তিবোধ।

সময় : দুষ্মন্ত রায়

নিরঞ্জন! নিরঞ্জন!

কে যেন কাকে ডাকে।
সন্ত্রস্ত পশুর মত ভৌতিক স্বর—
নিরঞ্জন! নিরঞ্জন!

যদি ঐ স্বজনের মুখ এভাবেই ফেরাতে হয়
ডেকে-ডেকে, জানু পেতে, দু'হাত অঞ্জলি করে—
তবে এখানেই শেষ হোক মানুষের ইতিহাস!
এরপর মানুষের নামে
যেন কেউ না-ডাকে
যেন কেউ না-লেখে—
'একবার এসো,
বহুদিন দেখি না তোমায়।'

মধ্যবিত্ত জীবনে টাইম টেবিল ভেস্তে যায়। যদিও কথা ছিল 'জোনাকি' নিয়মিত বেরুবে তবু তা' আর হয়ে উঠেছে কই? এইটুকু শুধু বলা যায় আপাতত ফিকির খুঁজলেও নিয়মিতের জন্য আমাদের চেষ্টা থেকেই যাচ্ছে। ২৫ বৈশাখের এই সংখ্যাকে তবু শুধুমাত্র ফিকির বলতে রাজি নই, কারণ রবীন্দ্রনাথ আমাদের দায় নন, দায়িত্ব।

ষাটের দশকের এই অঞ্চলের তথা বাংলা কাব্যের প্রথম শ্রেণীর কবিতা-পত্রিকা 'জোনাকি'র সম্পাদক কবি পীযূষ রাউত এমন এক সময়ে আমার হাতে সম্পাদনার ভার তুলে দিয়েছেন যখন এই অঞ্চলের কাব্যচর্চায় চলছে এক সংকটময় অবস্থা। সংকট কবিতার মানের জন্য ততটুকু নয়, যতটুকু সংগঠনের জন্য।

গোষ্ঠী বহির্ভূত অনুজদের প্রতি অগ্রজদের তাচ্ছিল্যকে উপেক্ষা করে এমন কিছু নোতুন প্রতিশ্রুতি আজ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যারা সংগঠিত হলে কম করে অন্তত চেকপোস্ট পেরুনোর অধিকার আদায় করে নিতে পারবে। 'জোনাকি' এই দায়িত্ব পালন করবে এটা নিশ্চয় বলব না, কারণ একক প্রচেষ্টায় তা হবার নয় বলে বিশ্বাস করি। শুধু এইটুকু বলতে পারি, 'জোনাকি' তার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে যতটুকু পারে সাহায্য করতে চেষ্টা করবে। আরো একটা কথা এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, 'ভালো লেখাই লেখা ছাপানোর একমাত্র শর্ত'—সম্পাদক পীযূষ রাউতের এই নীতি 'জোনাকি' সম্পাদনার পেছনে থেকেই যাচ্ছে।—**দীপক চক্রবর্তী : ২৫ বৈশাখ, ১৩৮৬।**

প্রকাশক : সৈকত রাউত, 'সৈকত-আবাস', থানারোড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা। পিন : ৭৯৯২৫০।
মুদ্রণে : শ্রীমা প্রেস, বিদ্যামন্দির রোড, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা।
লিনোকাট্ : নক্ষত্র সেন। মূল্য : পঁচিশ পয়সা।